জ্যোতির্গময়

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

২১৬৮

জ্যোতি-প্রকাশালয়

২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
ভারত বুক এজেন্সি
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য—চারি টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঙর
উমাশঙ্কর প্রেস
১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥

মানব-জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত এবং মানবাত্মার অ-মৃতলোক প্রাপ্তির উদার বাণী আর্য্যঋষিগণের অলোক-সামান্য যোগদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছিল ভারতের কোন্ স্মরণাতীত দিনের গৌরবোজ্জ্বল মহামহেন্দ্র-ক্ষণে। দুর্ভাগ্য বংশধর আমরা সেই দিব্য দৃষ্টির ... ক্ষান্ত দিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ঔপচারিক ঔজ্জ্ব... মোহগ্রস্থই নয়, পথভ্রান্ত হইয়াছি। এই বেদনাবোধ... বৎসর হইতে আমার অন্তরকে পীড়িত করিয়াছে... প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত আমার "চিতা-ব... ... লিখিবার পরিক... কথা উল্লেখ ... ছিলাম—"মানব-... ... পদে চলিয়াছে সেই অনন্ত-পথ-যাত্রা নির্ভয়ে ... অন্তরদীপ খানি জ্বালাইয়া; অভিসারিকা সেই আত্মা... পরমাত্মার প্রেমাভিসারে অনলস..... "

আর্য্য ঋষির তপোসাধনার সেই পবিত্র বাণী আজ বস্তু-জগতের বিক্ষুব্ধ জনারণ্যে হারাইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক সাহিত্যের আপাতমধুর ভোগাশ্লিষ্ট অন্তর-রহস্যের অনুসন্ধানেই ঋষিবংশধরের সাহিত্য-তপস্যা আজ পরিক্রমিত। সে-সাহিত্য জাগতিক. তাই একান্তভাবে বস্তুগত এবং সে-বস্তু অসৎ বস্তু। এই আত্মবোধকে তীব্রভাবে জাগ্রত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম।

কিন্তু আধুনিক যুগের ক্ষুদ্রজীবন, ক্ষীণবুদ্ধি, অর্ব্বাচীন আমি বারম্বার ভাবিয়াছি, ইহা আমার পক্ষে শুধু দুশ্চেষ্টা নয়, হয়তোবা অপচেষ্টা হইবে। কয়েকজন বন্ধুর সহিত এবিষয়ে আলোচনাও করিয়াছিলাম কিন্তু কিছু লিখিতে সাহসী হই নাই। বর্ত্তমানের কামনা-কলঙ্কিত সাহিত্যের আসরে ইহা হয়তো উপেক্ষিত-অবমানিত হইবে, এই আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অন্তরের অন্তরে যেন প্রেরণার কশা অনুভব করিয়াছি: কে যেন বলিতেছিল,—"ভারত আজিও ঋষিপুত্রগণের জন্মভূমি। আপন পৈত্রিক সম্পদকে কেহই উপেক্ষা করে না—" এই আশ্বাসবাণী আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।

কাগজ এবং মুদ্রাযন্ত্রের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য পুস্তক-খানিতে বহু ত্রুটি রহিয়া গেল। প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ এই পুস্তকের শুধু আঙ্গিক রূপদাতা নহেন, ইহার আভ্যন্তরিন বিষয়টিকে তিনি সক্রিয় [illegible] করিয়াছেন। গ্রন্থাগারের [illegible] গভীর রাত্রির নিঃসঙ্গ [illegible] নিষ্করুণ ভ্রুকুটি তাঁহার [illegible] আনন্দ [illegible]। গ্রন্থখানি বাংলার পাঠক [illegible] পরিজ্ঞাত হইলে কৃতার্থম্মন্য হইব।

১১ই, আর্ম্মেনি লেন

কলিকাতা।

জন্মাষ্টমী, ১৩৫২।

...য়ের কথা কেউ ভোলে নাই।

বাংলা তেরশ' পঞ্চাশ সাল—ইউরোপে এশিয়ায় যুদ্ধ চলছে ভীষণ, আর এদিকে বাংলাদেশে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব। মানুষগুলো যেখানে সেখানে পড়ে মরলো। এই মৃত্যুর তাণ্ডবের মধ্যে পার্থিব জগতে কত লোকের কত যে সুবিধা হয়ে গেল কত রকমে, তার আর নিরাকরণ নাই, কিন্তু পৃথিবীর ওপরের জগতেও আলোড়ন কিছু কম হয় নাই। পাপে পুণ্যে ভরা পৃথিবীতে পাপ অনেক বেশী হয়ে উঠেছিল "কচ্চিৎ ভিন্না কচ্চিৎ ভিন্না যদা সুর-তরঙ্গিনী·····তদৈব প্রবলা কলি"—অবস্থা দেখলেই বোঝা যেত, কলি খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল!

বাংলাদেশের একটি ছোট গ্রাম থেকেই আরম্ভ করি; গ্রামখানি নাম চণ্ডীপুর। শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতা এ গাঁয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মা দেড়শ' বছর আগে এই গাঁয়ে মা-চণ্ডীর পূজো শুধু চণ্ডীমন্দিরেই হোত না প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাড়ীতেই চণ্ডীপাঠ হোত; অন্য জাতের বাড়ীতে ব্রাহ্মণকে দিয়ে চণ্ডীপাঠ করানো হোত, তা'ছাড়া হরিনাম সংকীর্ত্তন, দোল, দুর্গোৎসব ইত্যাদি কিছু না-হওয়া ছিলনা এগাঁয়ে। আশ-পাশের বিশ-পাঁচিশখানা গ্রাম এই গ্রামটাকে বিশেষ সমীহের চোখে দেখতো, শ্রদ্ধা করতো এ-গাঁয়ের লোকদের। ধর্ম্মের দিক দিয়ে এ-গ্রাম যেমন উঁচু ছিল, কর্ম্মের দিক দিয়েও ছিল তেমনি। তেজারতী, মহাজনী, কৃষিকার্য্য হোত বেশ ভালই, তাছাড়া ছুতোর, কামার, মালী, মালাকার, কবি-গানের ওস্তাদ, কলা-শিল্পী থেকে উচ্চস্তরের টোলের পণ্ডিত এবং উচ্চশ্রেণীর গায়ক-বাদক ছিল এ-গাঁয়ে—খুব সুখেই ছিল তারা।

...তেরশ' পঞ্চাশ সালের বছর কয়েক আগের ঘটনা, এই গাঁয়ের

প্রতাপশালী জমিদার ধর্ম্মদাস বাবু সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলেন, বয়স তখ তাঁর মাত্র ছাপ্পান্ন। তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়ে রইল তাঁর জ অশ্রুত্যাগ করতে। গৃহিণী আগেই গিয়েছিলেন। সবাই বলাবলি করে ধর্ম্মদাসবাবুকে যখন অন্তর্জ্জলীর জন্য তুলসীতলায় নামানো হয়েছিল তখ নাকি তাঁর পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী তাঁর মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নার আলোতে তাঁকে বহু লোকই নাকি দেখতে পেয়েছিল ! কিন্তু সে কাহিনী ভৌতিক, তাই অবিশ্বাস্য।

দুই ছেলে প্রবাল আর শৈবাল তখন যথাক্রমে পঁচিশ আর কুি বছরের, মেয়ের বয়স সতের আঠার - নাম উজ্জ্বলা। তখনকার তুলনা অতখানি আধুনিক নাম রাখার কৃতিত্ব কিন্তু ধর্ম্মদাসবাবুর বা তাঁর পত্নী নয় ; এই কৃতিত্ব হচ্ছে ধর্ম্মদাসবাবুর কলকাতাবাসী জনৈক বন্ধুর। তিনি শুধু কলকাতা বাসীই ছিলেন না, কলকাতার সবরকম বিসর্গ আর উপসং ছিল তাঁর মধ্যে। ছিলেন উকীল, মিথ্যা কথা বিক্রী করে হয়কে ন করতেন এবং উপার্জনের অর্থ ইতরপথে ব্যয় করতেন। ধর্ম্মদাসবাবুর মত ধার্ম্মিক লোকের কেন যে তিনি বন্ধু হয়েছিলেন সেটা এক রহস্যময় ব্যাপার তবে ঐ উকীল ভদ্রলোকটি একখানা অশ্লীল বই লিখে ধর্ম্মদাসবাবুর অর্থে বটতলায় ছাপিয়ে কিছু নাম আর অর্থ কিনেছিলেন—তাতে ধর্ম্মদাসবাবু চরিত্রের কিছু কিছু তিনি লিখে গেছেন। সেই বই থেকেই জানা যায়— একবার নাকি ধর্ম্মদাসবাবু কলকাতায় এসে বড় মন খারাপ হওয়ার জ মুষড়ে পড়েন আর ঐ উকীলবাবু তাঁকে একটি গানের আসরে, মানে কোন বাইজীর বাড়ীতে নিয়ে যান। বাইজীর সঙ্গে আলাপ হবার প ধর্ম্মদাসবাবু দু'একদিন তাঁকে নিজের কলকাতার বাড়ীতে আনিয়ে গা শুনেছিলেন। এর বেশী বইটিতে আর কিছু পাওয়া যায়না কিন্তু অনুমা করে নেওয়া যায় যে আরো কিছু ঘটেছিল, যার—— ——

উকীলটীকে খাতির করতেন। বাইজীর নামটি ছিল মেনকা আর সেই উকীলবাবুর নাম ছিল হারাণ ভড়! হারাণবাবু সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে প্রবাল আর শৈবাল দুভাই ঠিক করলো, বাবার এত বড় জমিদারী আর ব্যাঙ্কের টাকা যখন আছে তখন তাদের আর কিছু করবার দরকার নাই। বোনটার বিয়ে বাবা দিয়ে যেতে পারলেন না, ঐ যা একটা মোটা খরচ আছে, বাকি সবই তাদের দু'ভাইএর। কিন্তু বোনটার বিয়েও তো দিতে হবে। তারা জানতো, বাবার বন্ধু হারাণ ভড় তোখড় লোক এবং বাবার শ্রাদ্ধে এসেও ছিল চণ্ডীপুরে; সেই বলে গেছে, তার হাতে খুব ভাল পাত্র আছে, যেদিন ইচ্ছে বিয়ে হোতে পারবে। কালাশৌচের একটা বছরও সবুর সইলনা দু'ভাইএর। 'অরক্ষনীয়া অজুহাত দেখিয়ে তারা ঠিক করে ফেললে, সেই জৈষ্ঠেই বিয়ে পাত্রটি খুবই ভাল, তখনকার দিনের এফ্-এ ফেল, কলকাতায় পাটের গুদামের বড় বাবু। আর দেখতে যেন রাজপুত্তুর! বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

কিন্তু উজ্জ্বলা বড় মেয়ে। ওর বাংলা আর সংস্কৃত শেখাবার পণ্ডিত শ্রীবল্লভ বাঁড়ুজ্যের ছেলে সমীরনের সঙ্গে ও ছেলেবেলা থেকে খেলাধূলো করেছে। ওদের অন্তরের মিল দেখে ধর্ম্মদাস বলতেন—উজ্জ্বলাকে সমীরনের হাতেই দেবেন—কিছু জমিজমাও তার সঙ্গে দিয়ে দেবেন, যাতে মেয়ে কষ্ট না পায়—কিন্তু সে কাজ তাঁর আর করা হোলনা; তবু তিনি মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন, উজ্জ্বলাকে যেন সমীরনের হাতেই দেওয়া হয়। কিন্তু জমিদার প্রবাল, শৈবাল সামান্য একটা পণ্ডিতের ঘরের ছেলেকে ভগ্নীপতি করবে, এতে তাদের সম্মানে বাধে, তাই ও সম্বন্ধে কোনো কথাই আর করলো না তারা।

কিন্তু উজ্জ্বলা তুললো, বললে, সমীরের সঙ্গে বিয়ে না দিলে সে গলায় দড়ি দেবে, না হয় পুকুরে ডুবে মরবে······কিন্তু আর অধিক কিছু বলবার পূর্ব্বেই দুভাই যুক্তি করে জ্যৈষ্ঠ মাসের এক সন্ধ্যায় কলকাতার সেই গুদামবাবুর সঙ্গেই বোনের বিয়ে দিয়ে ফেললো। টাকা খরচ কম কিছু হোল না বরং বেশীই হোল, তবে কিনা কলকাতার জামাই—টাকা খরচ হবেই তো! উজ্জ্বলা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ী এসে দেখলো—শাশুড়ী আর বিধবা ননদী আছে। বাড়ীটা ইট বের করা আর শোবার খাটখানায় বসলেই ক্যাঁচক্যাঁচ্ করে। তবুও কিছু আট্‌কালো না—ঐ ঘরেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা হয়ে গেল। গুদামবাবু টাঙির মত গোঁফ বাগিয়ে মোচড় দিয়ে নিলে একবার—তার্‌পরে সুন্দরী নবীনা বধূর চিবুকে একটা চুমা দিয়ে বলল - রাণী আমার! রূপ তো নয়, যেন স্বর্গের নাচ্‌নী!

উজ্জ্বলা গন্ধটা তখুনি পেয়েছিল ওর মুখের; গা বমিবমি করতে লাগলো কিন্তু ওর পিতৃপুণ্য কিছু ছিল, তাই মাতাল স্বামী আর অধিক কিছু শুধু বললো—নাচ্‌তে জানো মাইরী! অ্যাঁ—জানো? আহাহা! নাচোতো, মাণিক, নাচোতো।

উজ্জ্বলা সুখেই লালিত হয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে ও অভ্যস্থ নয়, তবু সাহস করে পায়ের রূপার তোড়াগুলোনে শব্দ করে দিল ঝুনুরুণ রুনুঝুনু! - আহা-হা! মরে যাই চাঁদ আমার! —গুদামবাবু বাহবা দিল।

কিন্তু লোকটা এতো বেশী মদ খেয়েছিল যে ঘুমিয়ে পড়লো তখুনি। বেঁচে গেল উজ্জ্বলা! ঐ বর্ব্বর লোকটাকে দেহদান করবার অসম্মান সইতে হোল না ওকে, কিন্তু পরদিনের ভাবনায় ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ভেবে ভেবে ঠিক করলো, আত্মহত্যা পাপ, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য আত্মহত্যাই করতে হবে ওকে। হয়তো করতো, কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে দিল মেনকা; পৈতৃক সম্পর্ক ধরে হারাণ ভড় আর মেনকা সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা ওকে

দেখতে এসেছিল ; বাইরের ঘরখানায় ওদের ক'জন বহুরাত অবধি মদ খেয়ে মাতলামী করে ঘুমিয়ে পড়ে—কিন্তু মেনকা মাতাল হয়নি। মাতাল সে হয় না! উজ্জ্বলা যখন গামছাটা নিয়ে উঠোনের কোনায় পেয়ারা গাছটায় বাঁধছে গলায় দড়ি দেবার জন্ম তখন মেনকা হঠাৎ দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললো,—থাম! মরলে আর বাঁচতে পারবেনা। জীবনটা নটেশাক নয় সে মুড়িয়ে দিলে আবার গজাবে! যাও, ঐ পাশের ঘরে শোওগে ; আমি থাক্‌ছি লোচনের কাছে।

—কিন্তু কাল আবার····· উজ্জ্বলার প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে মেনকা বলেছিল—কাল ওকে আমার কাছে আটকে রাখবো—পরশু বাপের বাড়ী চলে যেও!

তাই ঠিক হোল। তৃতীয় দিনে উজ্জ্বলা বাপের বাড়ী চলে এলো, কিন্তু সঙ্গে এল লোচন। তবে বাপের বাড়ী—তাই উজ্জ্বলা তত ভয় পেলনা। আর ভয় পাবার কারণও বিশেষ ঘটেনি, কারণ জামাইবাবু চব্বিশটি ঘণ্টা বিলিতিমদে ডুবে থাকতেন—সঙ্গে থাক্‌তো বড় শ্যালক প্রবাল আর ছোট শ্যালক শৈবাল ; বেশ কদিন কাটিয়ে গ্রামের দুএকটা ছোট জাতের মেয়ের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে লোচন যখন একা কলকাতা ফিরে এলো তখন প্রবাল আর শৈবাল মাতালগিরির দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেছে!

অতঃপর লোচন খুব কমই যেত চণ্ডীপুরে, কারণ প্রবাল আর শৈবালই আসতো তার কাছে। চণ্ডীপুরে লোচন গেলে চুরমাতাল হয়ে যখন শুতে আসতো ভেতরে, তখন উজ্জ্বলা আত্মরক্ষার অভিনব এক উপায় করতো। তার পুরোনো ঝির মেয়ে উষাকে গয়না কাপড় পরিয়ে পাঠিয়ে দিত লোচনের কাছে। মাতাল লোচনের লোচন তখন জবাফুলের মত লাল—একদিনের দেখা উজ্জ্বলাতে আর উষাতে তফাৎ বোঝা তার

অসাধ্য ছিল। দু'একবার উজ্জ্বলাকে কলকাতা নিয়ে যাবার প্রস্তাবও করেছিল লোচন কিন্তু উজ্জ্বলা বলে দিয়েছিল যে ভাল পাকা বাড়ী তৈরী করবার টাকা দাদাদের কাছে নিয়ে তবে সে যাবে কলকাতা। লোচন খুবই খুসী হয়েছিল বৌ-এর পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা শুনে। ঠিক করেছিল— হাজার পঁচিশ টাকা যদি উজ্জ্বলা আনতে পারে, তাহলে বেশ দিনকতক ফুর্ত্তি করা যাবে। বৌকে তাই সে বেশী কিছু আর বলেনি—শ্বশুরবাড়ীতে নিজেই আসতো আর শ্যালকদের নিয়ে ইতর আনন্দে সারাদিন কাটিয়ে গভীর রাত্রে শুতো ঝির মেয়ে উষার সঙ্গে।

কিন্তু উজ্জ্বলার অসুখ হ'য়ে গেল। প্রথম ম্যালেরিয়ার মতনই গোল, তারপর নিজের একান্ত অযত্ন করায় সেটা ঘুষঘুষে জ্বরে দাঁড়ালো। উপরের ঘরে উজ্জ্বলা চুপচাপ শুয়ে থাকে, ঝি আর তার মেয়ে উষাই দেখাশুনো করে ওর। ঘুষঘুষে জ্বরের অর্থ ওরা বোঝেনা। প্রবালের বৌ নীলিমা মাঝে মধ্যে এসে শুধোয়—কেমন আছ ঠাকুঝি আজ? জ্বর আসেনি তো?

—না বোধ হয়। ভালোই তো রয়েছি বৌদি—বলে শুকনো হাসে উজ্জ্বলা। বৌদির চার বছরের খোকা প্রণব এসেই বলে,

—পিতিমা, দানা দাও—কাবো।

দানা মানে বেদানা—উজ্জ্বলার লেগে ওসব যা আনা হয়, তাও খেয়ে যায় ঐ প্রণব। মাঝে মাঝে উজ্জ্বলার কপালের ছোট চুলগুলো সাপ্‌টে ধরে—তুম্ ডিলেনা পিতিমা!—বলে ঠোঁট ফুলোয়। উজ্জ্বলার ওকে চুমা দিতে হয়।

কিন্তু একদিন ভোর রাত্রে কাশির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখলো উজ্জ্বলা; বুঝতে পারলো, তার দিন পৃথিবীতে বেশী নাই আর। প্রথমটা এই সোনার পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে ভেবে ভীষণ দুঃখ বোধ করলো

স, কিন্তু যখন ভেবে দেখলে, সোনার পৃথিবীতে সোনা তার এক রতিও নই তখন আনন্দ যে ওর কতখানি হোল, তা আর বলবার নয়। শীঘ্র য ও জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, এই আশায় মা-চণ্ডীকে প্রণাম নিবেদন করলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়ালো—

"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—"মরণরে আও তু আও!"

"এত চুপি-চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মরণ মরণ।"ইত্যাদি।

চয়নিকা খুলে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো—"এবার ফিরাও মোরে…

কিন্তু প্রণব এসে বলল— দানা দাও পিতিমা!

ছেলেটার সর্ব্বনাশ কেন করে আর, ভেবে, উজ্জ্বলা খানকয়েক বই আর মীরের একখানি ছবি নিয়ে নেমে গেল বাড়ীর দুর্গাদালানে। পূর্বদিকের বারান্দার কোণে ছোট একটা ঘর ছিল— তখনকার দিনের ঝাড়-লণ্ঠন, বাতিদান, বেলয়ারী মালা ইত্যাদির গুদাম—যা পূজার সময় মন্দির সাজাতে দরকার হোত্—সেই ছোট ঘরখানাই খুলে উজ্জ্বলা বিছানা পাতলো— পূবদিকের আর দক্ষিণ দিকের জানালা দিল খুলে, তারপর নিশ্চিন্তে শুলো মরবার লেগে! ঝির মেয়ে উষা ওর রোগের কথাটা জেনে ফেলেছে; সে বললে তার মাকে—তারপর সারা বাড়ী এবং সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল কথাটা চট্‌পট্!

ডাক্তার-বদ্যি যে না এল তা নয়, কিন্তু উজ্জ্বলা ওষুধপত্র বিশেষ খায়না, ফেলে দেয়। মন্দিরে পূজোর পরে ফিরে যাবার পথে পুরোহিত ওর মুখে ঠাকুরের এক গণ্ডূষ পাদোদক দিয়ে যায়—তাই গিলে ও উপবাস ভঙ্গ করে কোনোদিন এগারটায় কোনোদিন-বা বারটায়! সকালে আর সন্ধ্যায় ঐ মন্দিরের পিছনের পুকুরটায় গা'ধুয়ে কাপড় কেচে আসে—জ্বর বেশি থাকলে উষার মা কেচে দেয়। উষাকে কিন্তু তার মা বেশীক্ষণ থাকতে দেয়না ওর কাছে; কাপড়-চোপড়ও কাচতে দেয় না।

বৌদি নীলিমা এসে বললে—এমন করে বাঁচবে কি করে ঠাকুরঝি?

—বাঁচতেই যে হবে, এমন তো কোনো কথা নাই বৌদি! বলে উজ্জ্বলা হাসে!

ভাইরাও দু'একদিন দরজার কাছে এসে বলে—উজ্জ্বলা, ভাল আছিস তো রে? উজ্জ্বলা বলে—হ্যাঁ দাদা, যক্ষ্মা বোধ হয় নয়, রক্তপিত্তিই হবে; আর দিনকতকের মধ্যেই ভাল হয়ে যাব।

লোচনও এলো একদিন, বললে—একি বৌ! বেঁচে ওঠো, বেঁচে ওঠো, নইলে আমার চলবে কি করে? আমি যে দিনে আঁধার দেখছি বৌ! আমি কি পাপ করেছি এমন যে .....

উজ্জ্বলা হেসেই বললো—বেঁচেই তো গেছি। মদের নেশা ছুটলেই বুঝতে পারবে—যাও এখন।

কিন্তু একদিন এলো সমীরন। সন্ধ্যার সমীরণ তখন দক্ষিণদিক থেকে বইছে, আর উজ্জ্বলা গা' ধুয়ে ফরসা একখানা লালপাড় তাঁতের শাড়ী পরে মন্দিরের আরতি দেখতে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। মন্দিরের উঠোনের চারপাশে অজস্র বেলফুল আর রজনীগন্ধার গাছে ফুলের উৎসব চলছিল—সমীরণ-গন্ধে মাতাল মানুষ সমীরন মাতালের মত টলতে টলতে এসে বললে উজ্জ্বলা! তুমি এই হয়েছো!—

—হ্যাঁ, কিন্তু যাও; কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে—যাও, যাও এখান থেকে!—

—উজ্জ্বলা, আমি চাকরী নিয়ে ধানবাদে ছিলাম, জানতাম না উজ্জ্বলা!

—আবার ধানবাদ চলে যাও, আজই, এখুনি—বলেই উজ্জ্বলা তার ছোট ঘরটায় ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিল! সমীরন তবু গেলনা। মন্দিরের আরতি দেখে কয়েকটা বেলফুল আর রজনীগন্ধা তুলে জানালা-পথে উজ্জ্বলার বিছানায় ছুড়ে দিল। উজ্জ্বলা ধমক দিয়ে বললে,

—ফের এসেছ? জান, তোমার জন্যে আজ আমার এই দুর্দ্দশা? মুখ দেখাও কোন্ লজ্জায় আবার!

—চিঠি আমি দেরীতে পেয়েছিলাম, তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

—ভালই হয়েছিল, কিন্তু যাও তুমি—মরণের আগে আর কলঙ্কী করোনা আমায়।

নিরুপায় সমীরন চলে এল, কিন্তু উজ্জ্বলা দেখলো সমীরের চোখ জলে ভর্ত্তি।

নিজকে সম্বরণ করা কঠিন হয়ে উঠছিল উজ্জ্বলার পক্ষেও। সমীরনের চোখের জল সে দেখলো, আর সেই বেদনা ওর বুকে সংক্রামিত হয়ে ওকেও অশ্রু-পঙ্কিল করে তুললো। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত দেবতার এককণিকা প্রসাদ ওকে দিতে এলেন—প্রসাদ নাও মা উজ্জ্বলা!

চোখ মুছে উজ্জ্বলা প্রসাদ নিল, মাথায় ছুঁইয়ে প্রার্থনা করলা—'সমীরনের যেন কল্যাণ হয়,' তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল! ভাবছিল জীবনের বাল্যস্মৃতি। ঐ সমীরনকে ঘিরেই কত কথা, কত হাসি, কত গান! সামীরনের সঙ্গে ওর জীবনের ষোলাটা বছর ঠিক সূতোর সঙ্গে শাড়ীর মতোই জড়ানো। সূতো খুলে নিলে শাড়ী আর থাকে না!

বাড়ীর পিছনের বড় বাগানটায় দড়ি বেঁধে দোল খেতে খেতে একদিন উজ্জ্বলা পড়ে গিয়েছিল—পাঁজরায় লেগেছিল খুব, কিন্তু সমীরন সেই ব্যথা যেন উজ্জ্বলার থেকে বেশী অনুভব করেছিল তার নিজের বুকে। আজ উজ্জ্বলার বুকখানা রোগের আক্রমণে ঝাঁজরা হয়ে গেল,—সমীরনের বুকেও তার ব্যথা কি লাগে না! লাগছে খুবই, তার প্রমাণ ঐ কান্না, কিন্তু ও যেন এ ব্যথা সামালাতে পারে। হ্যাঁ, নিশ্চয় সামলে যাবে।

ব্যাটাছেলে, যুবক, সুন্দর—সুন্দরী বৌ নিয়ে আসবে ঘরে, তারপর তার আদরে সোহাগে এক সময় ভুলে যাবে উজ্জ্বলার কথা। আহা! তাই যেন ভুলতে পারে। উজ্জ্বলা কারো মনে ব্যথা দিয়ে মরলোক ত্যাগ করতে চায় না!

মাতাল একটা লোকের কথা মনে হোল—ওর স্বামী। ওদিকের ঘরে চেঁচাচ্ছে—"কলকাতা নিয়ে চলো। সহরের সেরা ডাক্তার দেখাও. যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। তোমাদের তো টাকার অভাব নাই, সুইজারল্যাণ্ডেই দাও পাঠিয়ে। আমায় টাকা দাও, আমিই নিয়ে যাচ্ছি"—বলছে উজ্জ্বলার দাদাকে। আশ্চর্য্য! উজ্জ্বলাকে বাঁচাবার লেগে ওর আজ এত উৎকট ইচ্ছে হোল কেন? বুঝতে পারছে উজ্জ্বলা, ওর টাকার দরকার। উজ্জ্বলা মরলে দাদাদের কাছে আর ত আসতে পারবে না। বাড়ী তৈয়ারীর জন্য পঁচিশ হাজার টাকাও পাবে না—তাই উজ্জ্বলাকে এখনো কিছুদিন ও বাঁচিয়ে রাখতে চায়; চিকিৎসার নাম করে মোটা টাকা আদায় করতে চায়; কি সাংঘাতি অর্থলোভী লোকটা।

কিন্তু বেঁচেই তো আছে উজ্জ্বলা। গত কাল পর্য্যন্ত ওর অবস্থা খুবই খারাপ গেছে; এমন কি আজ সকালেও। 'টেলি' করে তাই ওর স্বামিকে (উজ্জ্বলা 'স্বামী" ভাবতে চমকে উঠলো) আনানো হয়েছে। কিন্তু আজ সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত উজ্জ্বলাকে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করালেন, আরো কত কি করালেন মন্ত্রপাঠ; উজ্জ্বলা করজোড়ে প্রার্থনা করেছিল, তার প্রাণ যেন এই জীর্ণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়! কিন্তু ও হরি! আজ উজ্জ্বলা সারাদিন ভাল আছে, এমন কি উঠে বসেছে, কাপড় পরেছে, চুল বেঁধে ধেশ বিয়ের কনেটির মত হয়ে উঠেছে! রোগটা তাহলে সেরেই গেল—কি বল! উজ্জ্বলার বড় ভয় করতে লাগলো; সত্যি ও সেরে যদি ওঠে তাহলে আবার ঐ মাতালটার পাল্লায় তাঁকে পড়তে হবে

তো—এবার উজ্জ্বলা তাহলে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। উজ্জ্বলা প্রাণপণে মন্দিরের ঠাকুরকে স্মরণ করতে চাইলো, বলতে লাগলো, —হে ঠাকুর, মৃত্যু দাও; দাও আমার জীবনে মৃত্যুর অমৃত পরশ! এসো মৃত্যু, এসো প্রিয় সখা—"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

কে যেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে ঘুমা, ঘুমা মা আমার! উজ্জ্বলার মনে হোল, ওর মা—ওর স্নেহময়ী জননী। ঘুমিয়ে গেল উজ্জ্বলা।

—জলা! জলা! ওঠো!

কে যেন ডাকছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত কিন্তু উজ্জ্বলার ঘরে যেন বেশ মৃদু জ্যোৎস্না—আর একটা চমৎকার গন্ধ ঘরের বাতাসে। বেশ জোরে নিশ্বাস টানলো উজ্জ্বলা, বুকখানা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। বহুদিন ও এমন পূর্ণ শ্বাস নিতে পারে নি। ভারী আরাম লাগছে যেন। কিন্তু আবার কে ডাকে?

—ওঠো জলা! উঠে এসো!

উজ্জ্বলা তাকিয়ে দেখলে, তার সুমুখে দক্ষিণদিকের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি—যেন চাঁদের জ্যোতিকে ঘন করে দেহ তৈরী হয়েছে, আর ঘরের মধ্যের এই জ্যোৎস্নাটুকু তাঁরই অঙ্গজ্যোতি! উজ্জ্বলা একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর পানে, তার পরে আস্তে বললো,—কাকে ডাকছেন? আমায়?

—হ্যাঁ, উঠে এসো আমার সঙ্গে চলে এসো জলা!

—আমার নাম উজ্জ্বলা! আপনি জলা বলে ডাকছেন কেন?

—উজ্জ্বলা নাম আর নেই তোমার; সে নাম তুমি ছেড়ে দিয়েছ; এবার ঐ মলিন জীর্ণ দেহটা ছেড়ে চলে এসো! ওসবে আর দরকার নেই!

—কেন? কোথায় যাব আপনার সঙ্গে? আপনাকে তো চিনি না আমি!

—আমি চন্দ্রলোকের মৃত্যুদূত! তোমার ঐ উজ্জ্বলা নামের অভিমান-টুকু ঘুচিয়ে উঠে এসো জলা! ঐ নামের অভিমান তোমাকে অনেক বিড়ম্বনায় ভুগিয়েছে; ও নামের কথা ভুলে যাও!

—নাম আমাকে বিড়ম্বনায় ভুগিয়েছে!

—হ্যাঁ! তুমি চন্দ্রের অধিকারের আত্মা! তোমার নামের প্রথম অক্ষর "উ"—অক্ষরটা প্রেমের দেবতার অধিকারে, কিন্তু সে প্রেম কামপঙ্কিল; আর শুধু 'জ' না হয়ে "জ্ব" অগ্নি, হার্শেলের অধিকারে, তাই তোমাকে দুঃখের জ্বলনে পুড়িয়েছে! এ জন্মটাও তোমার ব্যর্থ হোল! এসো জলা, দেরী হোয়ে যাচ্ছে—আমাকে আরেক যায়গা যেতে হবে রাত ঠিক তৃতীয় প্রহরে।

—না, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না—বলে উজ্জ্বলা তার বুকখানা হাত দিয়ে চাপলো, যেন ওকে কেউ টেনে নিয়ে যাবে।

—কিন্তু আজই তুমি যাবার জন্য প্রার্থনা করেছো! এখানে তোমার আর ঠাঁই নাই। যেতে হবেই, অনর্থক দেরী করো না!

—কিন্তু আপনি কোথায় আমায় নিয়ে যাবেন? কতদূর?

—চন্দ্রলোকে; বেশী দূর নয়, এখুনি পৌঁছে যাবে।

উজ্জ্বলা উঠলো, কিন্তু নজর পড়লো তেতোলায় ওর ঘরটার দিকে; সেখানে লোচন হয়তো এখনো মদ খাচ্ছে—আলো জ্বলছে দেখা গেল। বললো—সবার সঙ্গে দেখা করে আসি আমি।

—না, দেখা তুমি আর করতে পারবে না কারো সঙ্গে এ বাড়ীর।

—বারে বাঃ, তাহলে আমি যাবো না—বলে উজ্জ্বলা আবার শুলো! ওর চোকদুটো খুলে চাইলো তেতোলার ঘরটার দিকে।

দূত বললেন—কেন অনর্থক দেরী করছো বাছা—চলে এসো!

—না।—উজ্জ্বলার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু ওর মাথার কাছে ক যেন কোমল স্নেহ-সুরে বললো—আয় মা, চলে আয়, এখানে তোর র কোনো কাজ নেই!

উজ্জ্বলা তাকিয়ে দেখলো,তার মা তার কপালে হাত বুলুচ্ছেন!

—মা তুমি? কখন এলে তুমি মা!

—অনেকক্ষণ এসেছি! আয়!

—না; জানো মা, আজ সন্ধ্যাবেলা সমীরন এসেছিল; খুব ঝগড়া করেছি ওর সঙ্গে। কেঁদে ফিরে গেছে। ভোরেই বোধহয় আসবে আবার। ওর সঙ্গে দেখা করে যাব মা। আর শোন মা, আমার অসুখটা ভাল হয়ে গেছে, আর তো কষ্ট হচ্ছে না। ওকে ছুঁলে ওর আর ব্যায়রাম হবে না, না মা? ওর সঙ্গে কতকাল খেলা করিনি!

—খেলা যে আর এ জীবনে হোল না মা তোর—বলেই মা অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলেন। উজ্জ্বলা অবাক হয়ে বললো,—কেন মা? কাঁদছো কেন তুমি? আমি ভাল হয়ে গেছি, আমার অসুখ সেরে গেল; এবার কেন খেলা করবো না? আর শোন মা, তোমার উপরও খুব রাগ হচ্ছে আমার। আমি এত অসুখে ভুগছি, কৈ তুমি তো দেখতে আস নি? বাবাও আসেন না। তোমাদেরও অসুখ ধরে যাবে—ভয় কর নাকি?

—না মা, না, আমি অনেকবার এসেছি, তুই ঘুমিয়ে থাকতিস তাই দেখতে পাসনি—আয়, উঠে আয়!

—সমীরের সঙ্গে দেখা না করে কোথাও যাব না আমি।

—যেতেই হবে যে মা—বলে মা কাঁদতে লাগলেন। দেবদূত বললেন, —বেশ, ও থাক আরো কিছুক্ষণ, তবে ওকে তুমি কোলে তুলে রাখ

মাটি থেকে। আমি সেই তৃতীয় যামের লোকটিকে আনতে যাচ্ছি রবিদেবের উদয়মুহূর্ত্তে ভূর্লোক আর ভুবর্লোকের সংযোগপথে ওবে নিয়ে যেও, আমি সেইখান থেকেই ওকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে! এই পৃথিবীর নশ্বরতাটা ওকে এর মধ্যে দেখিয়ে দাও—চন্দ্রদেবের দূত অদৃশ্য হলেন, ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। উজ্জ্বলার কেমন যেন ভয় ভয় করছে নিদারুণ অন্ধকার, সভয়ে ডাকলো—মা, মা! কৈ তুমি মা! আমাকে ধরো মা। ভয় করছে!

—এই যে মা বলে জননী ওকে কোলে তুলে নিলেন, যেমন করে খুব ছোট বেলায় ওকে কোলে নিতেন। উজ্জ্বলা অনুভব করলো মা'র গায়ের আশ্চর্য্য স্নেহ সৌরভ! গলা জড়িয়ে ধরে বললো—তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে মা আজ! বেদীর ঐ দুর্গাপ্রতিমার মত!

মা হাসলেন একটু, বললেন,—তুইও সরস্বতীর মতন সুন্দর হয়ে উঠেছিস! বলেই গালদুটি টিপে চুমা খেলেন উজ্জ্বলার। উজ্জ্বলা মা'র কোলে উঠে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে. দেখতে পেল, বিছানায় একটা অতি কুৎসিৎ নারীদেহ পড়ে রয়েছে। এতো কুৎসিৎ যে উজ্জ্বলার ভয় করতে লাগলো দেখে; মাকে বললো—ওটা কে মা, পেত্নী নাকি?

—ঐ দেহটার মধ্যে তুই বন্দী ছিলি মা, ওটা তোর কারাগার ছিল, আজ ওর থেকে তুই মুক্ত!

—উঃ! অত কুচ্ছিৎ কারাগারে আমায় রেখেছিল মা? কী বিশ্রী! কি রকম নোংরা!

মা হাসলেন,—মানুষ কিন্তু ঐ নোংরা দেহটাকেই তার সর্ব্বস্ব মনে করে, বুঝলি মা? শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সব জীবই মনে করে, তার দেহের মত সুন্দর আর কিছু নাই। দেহটাকে ছাড়তে তার বড় দুঃখ। ঐ পিঁজরায় বছরের পর বছর থেকে থেকে জীব এমন অভ্যস্ত হয়ে যায়

—ওঁকে তুমি সরিয়ে নিয়ে যেতে পার না মা ?

—না, সরে যাবার শক্তি ওঁর নিজেরই জন্মাবে। কারণ, পাপের জন্য অনুতাপ করে উনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে শুদ্ধ করছেন। কিন্তু গ্রামকে রক্ষা করতে পারলেন না। এ গাঁয়ে পাপ ঢুকেছে মা, গ্রাম-রক্ষয়িত্রী মা মঙ্গলচণ্ডী বিমুখ হয়ে বসেছেন। ঐ দেখ, কে যেন ঘরে ঢুকছে।

উজ্জ্বলা দেখলো—তার বুড়ো ঝি উষার মা আলো নিয়ে সেই কুৎসিৎ দেহখানা দেখেই চীৎকার করে উঠলো—ওগো, আমাদের কি হোল গো, ওগো আমার উজ্জ্বল ধন কোথায় গেল গো—মাগী চণ্ডীমণ্ডপেই আছাড় খেয়ে পড়লো। এত কাঁদে কেন? উজ্জ্বলা বুঝতে পারছে না, কিন্তু দেখতে পেল, ওর বড় বৌদি, লোচন, ছোটদা, ছোট বৌদি, চাকর, ঝি, উষা, শেষে বড়দাও পেটে হাত দিয়ে ঘরটার বাইরে এসে দাঁড়ালো।

— কাঁদছে কেন মা ?—উজ্জ্বলা শুধুলো মাকে।

মা জবাব দিলেন না ওর কথার। উজ্জ্বলা নিজেই কিন্তু বুঝতে পারলো, ঐ মেয়েটা মরে গেছে তাইতে ওরা কাঁদছে।

সব থেকে বেশী কাঁদছে উষার মা আর বড় বৌদি। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। উঃ! অত বেশি শোক কেন ঐ কুৎসিত দেহখানার লেগে! ওটাকে অত বেশি ভালো বাসতো নাকি ওরা ? ভালোকরে তো দেখতেও আসতো না কোনো দিন। উজ্জ্বলার হাসি পাচ্ছে ওদের কাণ্ড দেখে। কিন্তু দেখতে পেলো পাড়ার আরো অনেক লোক, মেয়ে পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে—তারাও কাঁদছে। একজন বললো,—কাছে কে ছিল সে সময় ? শেষ কথা কি বলে গেল ?

উত্তর দিল উষার মা। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছ্‌তে মুছ্‌তে বললো,—আমিই ছিনুগো—হতভাগী আমি, কোলে করে মানুষ করেছি। আহাহা, মা আমার, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—ও মা গো, উজ্জ্বলা— আবায় ডুকরে কেঁদে উঠলো উষার মা।

—শেষের কথাটি কি বললো? আবার কে যেন শুধুলো ওদের মধ্যে—বড়দাই বোধ হয়!

—বলনু, বড় বাবুকে ডাকি, মা, বৌমাকে ডাকি, জামাইবাবু রইছেন, তা বললো, না উষার মা, আমি ভাল আছি—আহাহা! ভালোই যে ছিল গো বড়বাবু! আজ সারাদিন মা আমার উঠেছে, বসেছে, কত কথা বলেছে—কোথায় গেলি মা আমার গো!

—তারপর কি বললো? লোচনের কথা কিছু বলেছিল? বড়দা শুধুলো।

—হুঁ, বললো, ওকে বলিস, আবার যেন বিয়ে করে, আমার লেগে দুঃখ যেন না করে, আর উষা আমার খুব সেবা করেছে, আমার দু'একখানা গয়না তাকে দিস—বলনু, উকি কথা মা আমার? তুমি ভাল হবে, গয়না পরে শ্বশুরঘর যাবে—ও আমার সোনার পিত্তিমে কালি মেরে কে দিল গো···আবার আছাড় খেল উষার মা।

মা'র কোলে বসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল উজ্জ্বলা মাগীর মিথ্যা কথা বলবার বহর দেখে। ও মাগী তো ছিলই না এতক্ষণ! ওর সঙ্গে উজ্জ্বলা তো কোনো কথাই বলেনি। আশ্চর্য্য মিথ্যাবাদী মেয়ে তো!

—তারপর কি হোল, বল উষার মা বড়দা ব্যগ্র হয়ে শুধুলো আবার।

—তা'পর জল চাইল, দিলেম, তা'পর বললো, নাম শুনো, বলনু, বল হরি হরি হরি, কিষ্টো কিষ্টো, গোবিন্দ বল মন আমার—চেয়ে দেখি

চোখ দুটি খোলা—আহাহা, ওমা আমার ঘর আলোকরা মাণিক যে গো··· !

এই রকম ডাঁহা মিথ্যাকথা মানুষ বলতে পারে ! উঃ ! কিন্তু ওসব ভাববার অবসর পেলনা উজ্জ্বলা। দেখলো, ওর ছোট বৌদি আর গাঁয়ের কয়েকজন বুড়ি গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেই মৃতদেহটার কাছে। গয়না ক'খান খুলে নিল ওরা। রইল হাতের শাঁখা আর নোয়া। তারপর তোয়ালে দিয়ে সেই দেহটাকে ধুয়ে মুছে চুলগুলো খুলে আঁচড়ে দিল। সারা গায়ে আতর গোলাপজল ছড়িয়ে দিল. কপালে দিল সিঁন্দুর আর পায়ে টক্‌টকে করে আলতা। বিছানাভর্ত্তি ফুল ছড়িয়ে দিল - একটা মালাও দিল গলায় পরিয়ে। এদের কান্না ততক্ষণ অনেক ঝিমিয়ে এসেছে। আলোচনা করছে সবাই, ঐ মৃত মেয়েটা কতখানি রূপবতী আর গুণবতী আর সতী ছিল। সতীলক্ষ্মীর পায়ের ধূলো নিচ্ছে এয়োস্ত্রীরা সব। উজ্জ্বলার মা বললো – চল্ মা, এবার বাইরে যাই।

—না ! কৈ, সমীরন তো এলোনা ; ওকি ধানবাদ চলে গেল নাকি মা ?

—না আছে, আসবে এখনি– চল, বাইরের ঐ তেমাথায় গিয়ে দাঁড়াইগে।

—না মা, দেখ, কুচ্ছিৎ মেয়েটাকে কেমন সাজিয়েছে, দেখ মা—বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু ! আমার ইচ্ছে করছে ওর বুকের মধ্যে গিয়ে বসি।

—তোর পৃথিবীর চোখ এখনো যায়নি মা, তাই ওটাকে সুন্দর দেখছিস। চন্দ্রদেব তোকে ভালবাসেন, তাই তাঁর প্রচণ্ড শক্তি ক্ষয়কাস দিয়ে ঐ পিঁজরাটা চুরমার করে দিলেন—নইলে তুই বেরুতে পারতিস না—বন্দী হয়ে থাকতিস। ওটা পিঞ্জর - সোনার হলেও পিঞ্জর তো, আয়, চলে আয়।

—ওটাতে আর কেউ থাকতে পারেনা মা ?

—না, ওটা পৃথিবীর বস্তু! পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে ওটাকে মাটিতে পুঁতে রাখে—কোনো দেশে ইতর জীব-জন্তুকে খাইয়ে দেয়, কোনো দেশে বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এদেশে আগুনে পুড়িয়ে দেবে—দেখবি এখনি।

—সমীরন এলোনা যে মা এখনো ?

—আসবে! বলে মা ওকে কোলে নিয়েই বাইরে এলেন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,—উজ্জ্বলা দেখলো, তেমাথার কাছে একটা যায়গায় সমীরন দাঁড়িয়ে কাঁদছে। উজ্জ্বলা মার কোল থেকে নেমে ওর কাছে ছুটে গিয়ে বলতে লাগলো,

—আমার অসুখ সেরে গেছে সমী, চলো, বাগানে খেলা করবো—এসে উজ্জ্বলা হাত ধরলো সমীরনের। কিন্তু আশ্চর্য্য, সমীরন শুনতেই পাচ্ছে না—যেন তার হাত ধরাটাও বুঝতে পারে নি। উজ্জ্বলা তো ভালো হয়ে গেছে, আবার কাঁদে কেন সমীরন! উজ্জ্বলা আবার বললো,—চলো সমী—দেখ মা, ও কেন কাঁদছে এমন করে! আমি তো ভালই হয়ে গেছি—ওমা, দেখ!

কিন্তু মা দেখছিলেন—"বল হরি হরিবোল" বলে কয়েকজন লোক সেই সাজানো পিঁজরাটাকে বয়ে নিয়ে উজ্জ্বলাদের বিরাট ফটকের এপাশে চলে আসছে। নায়েব, গোমস্তা, চাকর, মেথর সবাই কাঁদছে—উজ্জ্বলার মাও!

—তুমিও কাঁদছো যে মা ?—উজ্জ্বলা বিস্মিত হয়ে শুধুলো। মা আস্তে বললেন,—মাটির মায়া বড় বেশী মায়া মা,—এই মাটিতে কতদিন আগে তুই আমার দেহ থেকে নেমে এসেছিলি ঐ পিঁজরাটার মধ্যে। তখন আমিই কি ঐ মাটির পিঁজরাটাকে কম ভালোবাসতাম্! ওকে কোলে নিয়ে

সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে যেত! এতোটুকু ধূলো লাগলে অস্থির হয়ে উঠতাম। একদিন একটা চোট্ লেগেছিল খেলা করবার সময়, সেদিন সারারাত আমি ঘুমাইনি।

—কিন্তু ওটা তো শুধু পিঁজরা মা, আমি তো তোমার কাছেই রয়েছি।

—হ্যাঁ মা, তবু ওটার ধ্বংস দেখতে আমার কষ্ট হচ্ছে। বড় কষ্টে ওকে পৃথিবীর আকার দিয়েছিলাম—চল মা, চলে যাই এখান থেকে।

—কিন্তু সমীরন কথা কইছে না যে! রাগ করেছে মা; কাল ওকে বকেছিলাম।

—না মা, ও তোর কথা শুনতে পাবেনা আর, তোর স্পর্শও বুঝতে পারবেনা। ও স্থূল পিঁজরায় রয়েছে কিনা—তোর কথা বা পরশ সেখানে পৌছাবে না আর।

মা ওকে আবার টেনে নিলেন কোলে। তারপর চলতে লাগলেন, কিন্তু উজ্জ্বলা চেয়ে রয়েছে সমীরনের পানেই। রাগই করেছে সমীরন অভিমান করেছে—ভাবছে উজ্জ্বলা, ওদিকে দেহ-পিঁজরাটা বয়ে আনছে ওরা—সমীরনও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে!

—চলো মা, দেখি ওরা কি করে। সত্যি ওটা পুড়িয়ে দেবে মা?

—হ্যাঁ, আয়, দেখবি—

বলে মা নদী-ধারের শ্মশানে এসে একটা বড় অশত্থ গাছের তলায় দাঁড়ালেন। পুরানো অশত্থ গাছ্। উজ্জ্বলা কতবার দেখেছে, কিন্তু তখন ভয় করতো এখানে আসতে ওর। আজ কিন্তু ভয় তো করছেই না, বরং আনন্দ হচ্ছে খুব। দেখতে পেলো তার মতন আরো অনেকে রয়েছে ঐ গাছতলায়, তাদের মধ্যে একজন—ওর সাথী নিরুও দাঁড়িয়ে, উজ্জ্বলা বললো,—এই নিরু, আয় আয়, কতকাল তোকে দেখিনি—আয় আমার কাছে।

— তোমার কাছে যেতে পারছিনা উজ্জ্বলা—আমি জানতাম, তুমি আজ আসবে, তবু আনতে যেতে পারি নি ; তুমি অনেক উঁচু জাতের, আমি যে ভাই পতিতা।

—ওমা, কেন ? তুই কায়েতের মেয়ে !

— ছিলাম, কিন্তু অন্যকে ভালবেসে স্বামীর হাতে খুন হওয়ার জন্য আমার আর ভদ্রজাত নাই ; আমি এখন খুব ছোট জাত ; তোমাকে প্রণাম করি ভাই উজ্জ্বলা !

সত্যি প্রণাম করলো নিরু ! উজ্জ্বলার মা বললেন—এখানে যারা আছে তারা এই ভুর্লোকের আত্মা, নরক বা প্রেতলোকের ভোগ শেষ হলে আবার পিঁজরায় ঢুকবে ; যাঁরা অন্য লোকের আত্মা তাঁরা চলে গিয়েছেন। তোকেও যেতে হবে মা, — তুই চন্দ্রলোকের আত্মিক !

—সেখান থেকে আর আসতে পারবোনা মা ?

—পারবি, এমন কি পিঁজরাতে আবার ঢুকতেও পারিস, কিন্তু মা, আর কেন ? ঐ দেখ, পিঁজরাটাকে ঐ চিতায় তুলে জ্বালাবে। দেখ, তোর স্বামী লোচন ওর মুখে আগুন দেবে, পিণ্ডী রান্না করছে ঐ দেখ, দিচ্ছে, যা নে গিয়ে।

—না, ও আমার কে ? ঐ বজ্জাৎ লোকটার হাত থেকে কিছু নিতে পারবো না আমি। ও অশুচি মা, এখনো গায়-হাতে আঁস গন্ধ রয়েছে। উঃ ছি !

—নিতে হয় যে মা। তোমার তো ছেলে নাই—ও ছাড়া আর কে দেবে পিণ্ডী !

—কেন ? সমীরন তো রয়েছে। ওকে বলুক না দিতে।

—তা হয় না মা, ব্যবহারিক জগতের নিয়মতান্ত্রিক পৃথিবীতে সমীরন তোর কেউ নয়।

—তাহলে ও আমি নিতে পারবো না। ওর মন রয়েছে বড় বৌদির দিকে, হাত অশুচি—মদের নেশা এখনো কাটেনি—না মা, না, আমি যাব না।

—ওসব মদ মাংস পৃথিবীর। শব্দ ব্রহ্ম, তিনি অশুচি হন না! সেই ব্রহ্মের সঙ্গে পবিত্রীকৃত পিণ্ডের প্রাণসত্তাটুকু তুই নে গিয়ে মা—নিতে হবে।

উজ্জ্বলা এগিয়ে গেল। দেখলো, সেই নারী-দেহটা সত্যি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে এখনও। বড় মমতা জাগছে অন্তরে ওর। ওটা এরা পুড়িয়ে দেবে? কেন? রাখতে দোষ কি! পিণ্ডের প্রাণসত্তা নিয়ে উজ্জ্বলা এসে মাকে শুধুলো—

—দেহটা রাখতে দোষ কি মা?

ঐ দেহে যে ছিল তার আকর্ষণ থাকতে পারে ওটার উপর। তা ছাড়া, ওটা রাখা যায় না। মাটির বস্তু দিয়ে ওটা তৈরী, মাটির নানা ভাগে ওটা মিশে যাবে, আবার নতুন ভাবে আরেক জন কেউ ওর থেকে দেহ তৈরী করবে। চল আমরা যাই।

—সমীরন নদীর জলের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদচে মা, চলো, দেখিগে।

—আয়; ঐ দেখ পিজরাটা আগুনে পুড়ছে—বলে দুজনে এসে দাঁড়ালো নদীধারে; দেখলো, সমীরনের চোখ থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে নদীজলে—কেন কাঁদছো সমী?—উজ্জ্বলা বললো, কিন্তু সমীরন কিছুই শুনতে পেল না। এদিকে রবিদেবের উদয়লগ্ন এসে পড়েছে। মা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে চল্লেন—উজ্জ্বলার চোখের দৃষ্টিশিখা কিন্তু সমীরনকে ঘিরে রয়েছে।

ভূমণ্ডলের বায়ুস্তর,—মেঘের কুয়াসা, জলকণা, সূর্য্যালোকে দীপ্ত সপ্ত বর্ণের অপরূপ ইন্দ্রধনু দেখতে পাচ্ছে উজ্জ্বলা। ঘনকৃষ্ণ মেঘগুলি রৌদ্রালোকে পুষ্পিতা লতার মত দেখাচ্ছে পথের পাশে পাশে। ঐ মেঘেরই ঘন শ্যামল বৃক্ষরাজি, গুল্ম, ওষধি, স্ফটিকস্বচ্ছ প্রাসাদ, এমন কি অদৃশ্যপূর্ব্ব নরনারী,জীবজন্তু দেখছে উজ্জ্বলা। গতি ওদের খুব বেশী নয়—বায়ুস্তরের উপরে হাল্কা পালকের মত ভেসে যাচ্ছে যেন। উজ্জ্বলা এখনো দেখতে পাচ্ছে, শ্মশানে সেই লোকগুলি নারীদেহটাকে উল্টেপাল্টে পুড়িয়ে দিচ্ছে আগুনে, কিন্তু ঐ দেহটার অদগ্ধ-অর্দ্ধদগ্ধ মাংস খাবার জন্য অশথ তলা থেকে কয়েকটি প্রেত আর প্রেতিনী এগিয়ে এসেছে, কসাইএর দোকানের সুমুখে যেমন করে কুকুর বসে থাকে ঠিক সেই রকম করে ওঁৎ পেতে রয়েছে ওরা। উজ্জ্বলা দেখলো, ওদের মধ্যে নিরুও রয়েছে। নিরুর চেহারাটা এর মধ্যেই কুৎসিৎ হয়ে গেছে খুব, মস্ত লম্বা দেহ, পরণে এক-টুক্‌রো ছেঁড়া গামছা, আর গলায় একটা কাটা দাগ, রক্ত পড়ছে সেই ক্ষত থেকে! সরু লিকলিকে হাত পা, চোখ কোটরগত কিন্তু জ্বলছে যেন! হিংসার আগুন যেন সেই চোখে। উজ্জ্বলা একটু পূর্ব্বেই ওকে ঠিক আগের নিরুর মত দেখেছে। তখন তো ভালই লাগছিল ওকে দেখতে। মাকে শুধুলো উজ্জ্বলা – নিরু হঠাৎ অমন কুসিৎ হয়ে গেল কেন মা?

– ঐটাই ওর এখনকার রূপ—মা বললেন; মরবার সময় মনে ওর নিদারুণ হিংসা জেগে উঠেছিল—পরণে ছিল ছেঁড়া গামছা আর ওর বর ছোরা মেরেছিল ওর গলায়। তোকে দেখে ও তখন কষ্ট করে পূর্ব্বের আকৃতি ধরেছিল, কিন্তু সে আকৃতিতে ওরা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। ওদের বায়ুর শরীর—ঘনীভূত বায়ু ওরা, তাই চেষ্টা করলে পৃথিবীর দেহের মত রূপ অল্প সময়ের জন্য গ্রহণ করতে পারে।

—ওরা কি এখানে আসতে পারেনা মা?

—না, ওরা বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যেতে পারেনা। ওদের শরীর পৃথিবীর বায়ুতে তৈরী, তার উপর শীতল বলে ভারী—হাল্কা শরীর না হলে উপরে ওঠা যায় না বাছা,—তবে মানুষের জলে সাঁতার কাটার মতন ওরা চেষ্টা করলে দু'পাচশো হাত উপরে উঠতে পারে—এর বেশী নয়।

—ওরা খুব শীতল? তাই কি ভূতের হাত ঠাণ্ডা বলে মা লোকে?

—হ্যাঁ, গায়ে ঠেকলে অনুভূতিশীল মানুষ ওদের শীতলতা টের পায়।

উজ্জলারা তখনো বায়ুস্তর পার হয়ে যায়নি, নিরুকে আর একবার ব্যথিত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গিয়ে উজ্জলা দেখলো, সেই নারী-দেহটা থেকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ বেরিয়ে পড়ছে, আর সেই প্রেতগুলো শুধু ক্ষিতিত্ব আর অপত্বটুকু টপ্ টপ্ করে ধরে গিল্‌ছে,—কিন্তু তেজ, মরুৎ আর ব্যোম পদার্থের দিকে কারো নজর নাই। ঐ দুটি বস্তুর লেগেই কাড়াকাড়ি মারামারি করছে ওরা। উজ্জলা মাকে আবার প্রশ্ন করলো।—তেজ, মরুৎ, ব্যোম ওরা খাচ্ছেনা কেন মা?

—ওদের ক্ষমতা নেই খাবার। ওদের থেকে উচ্চ শ্রেণীর আত্মারা এই বায়ু স্তরে আছে, তারা ওগুলি গ্রহণ করবে, ঐ দেখ— বলে মা দেখালেন। উজ্জলা দেখলো—মেঘস্তরের কোমল আস্তরণে বসে কয়েকটী প্রেত তেজ আর মরুৎ সত্ত্বা গ্রহণ করছ, কিন্তু ব্যোম সত্ত্বা আরো উচ্চ দেশে চলে গেল। তেজ আর মরুৎ গ্রহণকারী প্রেতগুলির অঙ্গ যেন অত্যন্ত স্বচ্ছ; আর দেখতেও খারাপ নয়, কিন্তু মানুষের মতও নয় ঠিক।

—এরা বেশ তো—বেশ উপরে উঠেছে মা—উজ্জলা শুধুলে

—হ্যাঁ, এরা লঘু বায়ুর দেহধারী; এদের দেহ অনেক হাল্কা, তাই উঠতে পারে।—তবে বায়ুস্তর ভেদ করে যেতে পারে না। এদের খাদ্য ঐ তেজ আর মরুৎ।

—ব্যোম সত্ত্বা কোথায় গেল ?—বলে উজ্জলা ঊর্দ্ধে চাইল, দেখতে পেলে ঐ শ্মশানের উপর ঊর্দ্ধকাশেই দু'তিনটি প্রেত ব্যোম সত্ত্বা গ্রহণ করছে—কিন্তু গ্রহণ করেছ অতি সামান্য মাত্র অংশ—বাকি ব্যোম সত্ত্বা আরো ঊর্দ্ধাকাশে উঠে গেল। উজ্জলা আবার শুধুলো—ওরা কি দিয়ে তৈরী মা ?

—ওঁরা পৃথিবীতে অনেক ভাল কাজ করেছেন—তবে পৃথিবীর মায়া এখোনো ওঁদের টানছে। ওঁরা বায়ুসত্ত্বা দেহধারী। পার্থিব বস্তুর দেহ এখনো রয়েছে ওঁদের, তাই ওঁদের আকাশচারী বলা চলেনা। ভূমণ্ডলের শেষ বায়ুস্তর পর্য্যন্ত গতি ওঁদের, তার বেশী নয়। তাই আবার শীঘ্র ওঁরা পৃথিবীতে জন্মাবেন, তারপর আবার যে যেমন কাজ করবেন, তিনি সেই মত জায়গায় যাবেন। এখানকার সপ্তলোক যমের অধিকারে; তাঁর বিচারেই এদের এই ব্যবস্থা। আয় মা. দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—যাই বলেই, কিন্তু উজ্জলা দেখতে পেলে, নীচের নদীতে বহুদূরে সমারন একাকী হেঁটে চলেছে। কোথায় যায় ? উজ্জলা ভয় পেয়ে মাকে ডাকলো—সমীরন গাঁ ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। সন্নিসী হবে নাকি মা ?

- কি হবে তা জানি না, মানুষের ভবিষ্যৎ বলবার ক্ষমতা নেই আমার—আয়।

মা ওর হাত ধরে টান দিলেন, কারণ রবিদেবের পৃথিবীতে উদয়-মুহূর্ত্ত এসে গেছে, আর খানিক দূরেই দেখা যাচ্ছে ভূলোক আর ভুবর্লোকের সংযোগস্থলটি। ঐখানে চন্দ্রদূতের হাতে সঁপে দিতে হবে উজ্জলাকে।

—চন্দ্রলোকে আমরা গিয়ে কোথায় থাকবো মা ? সেখানে ঘররাড়ী সবই আছে তো ?

—চন্দ্রলোক পৃথিবীর উন্নততম বিচার-শালা। উন্নত শ্রেণীর আত্মাদের এখানে আসতে হয় প্রথম, তারপর সেই আত্মার কর্ম্ম অনুসারে তাকে আমাদের পৃথিবীতে বা আরো উর্দ্ধলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; এমন কি আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্য গ্রহেও পাঠিয়ে দিতে পারে। কোথায় কাকে পাঠাবে তা আমাদের মত নগন্য আত্মাদের জানা নেই মা, আয়, উনি এসে গেছেন।

উজ্জ্বলাও দেখলো,—সেই সুন্দরকান্তি দেবদূত আর তাঁর সঙ্গে একটি যুবক ঐ সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। মা উজ্জ্বলাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পৌছুলেন—বললেন,—আমার মতন অযোগ্যার হাতে ওকে আনবার ভার দিয়েছিলেন দেব—দেরি হয়ে গেল, মার্জ্জনা করুন।

মধুর হাসলেন দেবদূত, বললেন—মা'র থেকে সন্তানকে আনবার বেশী যোগ্যতা যে আর কারো নেই মা, এ ক্ষেত্রে তুমিই যোগ্যতমা, এস!

—আমি কি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি দেব?

—হ্যাঁ মা, তুমি স্বর্লোকের অধিবাসিনী, ভূলোক আর ভুবর্লোকের সর্ব্বত্র তোমার অবাধ গতি, তবে ভূলোকে এখন আর যেও না মা—অনর্থক কষ্ট পাবে।

—স্বর্লোকেইবা আমার সুখ কোথায় দেব—মা অত্যন্ত করুণ স্বরে বললেন।

—সুখ পাবে মা, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে এল। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর পর তার ব্যোমসত্ত্বা গ্রহণ করেই তোমার স্বামী স্বর্লোকে আসতে পারবেন।

উজ্জ্বলা চমকে উঠলো শুনে। বড়দা তাহলে মারা যাবে, আর বাবাকে নিতে হবে তাঁর ছেলের দেহ থেকে ব্যোমস্বত্ত্বা! ভয়েভয়ে ও জিজ্ঞাসা করলে—বাবার কোন পাপে এই শাস্তি দেব—জানতে পারি কি?

—পাপ কিছু আছে বৈকী মা, কিন্তু ওসব জেনে তোমার দরকার নাই ; সরে এসো, সরে এসে জলা, এখনো তুমি ভূর্লোকে তোমার বাঁ পা টা দিয়ে আছ, এসো !

উজ্জ্বলা পা না সরিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলো, প্রচণ্ড একটা ঘুর্ণাবর্ত্ত নীচের বায়ুসমুদ্র থেকে উঠে আসছে ওদের দিকে ; উজ্জ্বলাকে হয়তো এখনি ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ভয় খুব পেয়েছে তবু পা সরাতে পারছেন উজ্জ্বলা। বায়ুর আবর্ত্ত প্রায় এসে গেল। চন্দ্রদূতের সঙ্গের ছোকরাটি চট্‌করে উজ্জ্বলার ডান হাত খানা ধরে টেনে নিলে তাকে ওপাশে, নইলে কি যে হোত বলা যায় না। যুবকের টানে সম্বিত পেয়ে উজ্জ্বলা তার পানে চাইলো—চোখাচোখী হয়ে গেল দুজনার। দিনদেবের উদয় লগ্নে এ যেন দৃষ্টি বিনিময়। উজ্জ্বলা চোখ নামালো তৎক্ষণাৎ।

দেখতে পেলো—ভূর্লোক আর ভুবর্লোকের সীমারেখা যেন সমুদ্র আর পৃথিবীর বালুসীমার মত আর সেই বেলাভূমিতে তারা দাঁড়িয়ে। ওদিকে ভূস্তর থেকে হিমালয়ের মত বিরাট বায়ুতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে এসে সেই বালুবেলায়, ভুবর্লোকের সামান্যতম অংশ তাতে প্রক্ষালিত হয়ে যাচ্ছে বারম্বার। পুরীর সমুদ্রকূলে বসে যেন ঢেউ দেখছে উজ্জ্বলা, এমনি মনে হচ্ছিল তার। ঐ অগাধ বায়ুসমুদ্রের সঙ্গে পৃথিবীর সমুদ্রের তফাৎ বেশী নেই, শুধু রংটা একটু উজ্জল নীল, আর সূর্য্যকরোজ্জ্বল তরঙ্গের স্তরে স্তরে ব্যোমসত্ত্বার (ইথারের) মৃদুকম্পন ঝিলিক মারছে। দৃশ্য অপূর্ব্ব ! জলজ সামুদ্রিক উদ্ভিদের মত বৃক্ষলতা, ফল পুষ্প, কড়ি ঝিনুক, জীবজন্তু কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছে উজ্জ্বলা—মাটির পৃথিবীকে বায়ুর সমুদ্রে ডোবা ছোট দ্বীপ মনে হয়, কিন্তু কী চমৎকার সৌন্দর্য্য ! পৃথিবীর শ্যামল অরণ্যানীতে প্রভাত সূর্য্যের আলো লেগেছে—লেগেছে মরু-প্রান্তরে, নগরে-গ্রামে, আকাশে বাতাসে সেই শ্বেত জ্যোতিঃ—কত যায়গায় সাতরঙএ

াগ হয়ে কত ফুলে কতরকম রঙ সৃষ্টি করেছে! মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে জ্জলা! দেবদূত বললেন—মাটি-মার মায়ার শেকল বড় শক্ত জলা, তুমি কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছো না—কিন্তু ফেরাতে হবে—এসো, চলে এসো!

—মাটি-মা'র অগাধ ঐশ্বর্য্য দেব! উজ্জ্বলা বিনীত স্বরে বললো—ঐ আমার সোনার পৃথিবী—আমার মা; ওর কোলে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার!

—ঐ ইচ্ছাই আত্মাকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে; কিন্তু জলা, তুমি আরো ভালো জায়গায় যেতে পারবে—তাই শ্রাদ্ধের দশদিন না-যেতেই আমি তোমায় ভূর্লোক থেকে নিয়ে এলাম। চল, সে-সব দেশ পৃথিবী থেকে অনেক বেশী সুন্দর!—বলেই তিনি চলতে লাগলেন সামনের দিকে। সঙ্গে উজ্জ্বলার মা চলেছেন, কিন্তু উজ্জ্বলা আর সেই যুবক কিছুতেই তাঁদের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না, পিছিয়ে পড়ছে।

আরো খানিকটা এসে উজ্জ্বলা আর একবার তাকালো পৃথিবীর পানে—দেখলো, জাহাজে যেতে যেতে তটরেখা যেমন অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর অয়শ্চক্রবৎ পরিধিরেখা মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু এখনো কত সুন্দর! উজ্জ্বলার কালিদাসের কবিতা মনে পড়লো!

"দূরাতয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী, তমাল তালী বনরাজিনীলা"

সঙ্গের যুবকটি কোনো কথা এ পর্য্যন্ত বলে নি ওর সঙ্গে, কিন্তু কবিতা শুনেই বললো—তুমি কি কবি? দেশ কোথায় তোমার?

—কবি নই, কবিতা ভালোবাসি; আমার দেশ ভারতের বাংলা দেশে। তোমার?

—আমার? সে অনেক কথা! জন্মেছিলাম হ্যাম্‌ডেনে, সেখান থেকে যাই অষ্ট্রেলিয়ায়, তারপর সিঙ্গাপুরে এসে যুদ্ধে যোগ দিই—সেখানে

তোমাদের ভারতবর্ষের অনেক লোক ছিল—দু' একজনের সঙ্গে আলাপও জমেছিল আমার বেশ! ভারতের লোকরা খুব ভাল কবিতা বোঝে; না?

—ভারতবর্ষ কবির দেশ! যুদ্ধে কি তুমি হত হয়েছিলে? কৈ, আঘাত তো দেখছি না।

—না, আঘাত কোথায় পাবে? আমাদের জাহাজটা শত্রুর টর্পেডো লেগে ডুবে যায়—আমিও সেই সঙ্গে ডুবে যাই—তারপর এই আসছি।

—আর যারা ডুবেছিল, তারা কোথায় রইল? সমুদ্রের তলায়?

—তা জানি না—ঐ দেবদূতের মতন আরো দুচার জন ওদের অন্য রাস্তা দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেলেন। হয়তো ওরা সব পরে আসবে এখানে; কিন্তু উঃ! এত আফ্‌শোষ হচ্ছে!

—কিসের আফ্‌শোষ? উজ্জ্বলা শুধুলো।

—আমার একখানা লেখা খাতা হারিয়ে গেছে। সময় পেলাম না খুঁজবার। ওঁর যা তাড়াহুড়ো!—বলে সে দেখালো অদূরবর্ত্তী চন্দ্রদূতের দিকে আঙুল বাড়িয়ে।

—কি ছিল খাতাটায়? উজ্জ্বলা হেসেই শুধুলো।

—কবিতা। ওটা আন্‌লে তোমাকে শোনাতাম। দু'একটা মুখস্থ আছে, শুনবে?

কিন্তু ওদিকে চন্দ্রদূত ডাক্‌ছেন তাদের, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন ওঁরা, তাই—এখন থাক, পরে শুনবো—বললো উজ্জ্বলা।

চণ্ডীতলা গ্রামের প্রান্তে নদীকূলে উজ্জ্বলার দেহখানা আগুনে পুড়িয়ে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে গেল যে যার বাড়ী। বড়দা প্রবাল পেটের যন্ত্রণায় এতখানা আসতে পারে নি—বাড়ীর বৈঠকখানায় একখানা কৌচে বসে ছিল, আর বাড়ীর ভেতর ছোট-বৌ, বড়বৌ, উষার মা, উষা তখনো

বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল। কান্নটা আন্তরিক কি না, মানুষের বুঝবার উপায় খুবই কম—কিন্তু মনুষ্যেতর লোকের অধিবাসী একজন হাসছিলেন সেই কান্না শুনে। তিনি উজ্জলাদের পূর্ব্বপুরুষের অর্চ্চিত গৃহদেবতা বাস্তুপুরুষ। এই বংশের ধারাকে তিনি বহুদিন থেকে দেখে আসছেন, এখনো কিছুদিন তাঁকে দেখতে হবে, কারণ এই বিরাট প্রাসাদের পূর্ব্বের অধিকারীরা আজিও এখানে আসেন আর তাঁর দেখা না পেলে কাঁদেন। তাছাড়া এই বংশের রক্তধারা এখনো নরলোকে রয়েছে প্রবাল আর শৈবালের মধ্যে ; প্রবালের ছোট ছেলেটার মধ্যেও—তাই উনি এখনও এ ঘর ছাড়তে পারছেন না।

ভেতর বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণায় উনি বসেছিলেন। মেয়েরা করুণ সুরে কাঁদছে—কিন্তু কারো কিছুমাত্র আন্তরিকতা নেই কান্নায় ; শুধু উষার মা মাঝে মাঝে আন্তরিক ভাবে কাঁদবার চেষ্টা করছে। দেখে ওঁর আরো হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু দেখতে পেলেন আবার, এই বাড়ীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ছোটবৌকে বলেছে বড়বৌ—মরার যায়গায় একটা পেয়েক পুঁতে দে ছোটবৌ—গোবরজল ছড়া দিতে হবে সব—আহা, ওগো আমার কত সাধের ঠাকুরঝি কোথায় গেলে গো !

দম ফেটে হেসে উঠলেন বাস্তুপুরুষ। সর্ব্বক্ষণ দেহেমনে অশুচি এই মেয়েটা আবার ঘরদোর শুচি করবার চেষ্টা করছে ! ঘরের মঙ্গলের লেগে ভাবছে—কেউ যেন জানে না, ও কতবড় পাপীয়সী !

বিরক্ত হয়ে উনি সেখান থেকে উঠে এলেন বার বাড়ীতে। দেখলেন, চাকর-বাকর গুলোর মুখ ব্যথাকরুণ ! এদের দুঃখ সত্যি আন্তরিক, দেখে তবু খানিকটা ভাল লাগলো ওঁর। বাড়ীর সব থেকে পুরোণো মালী বৈকুণ্ঠ ফটকের কাছেই ঘাসের ওপর বসেছিল। উজ্জলাকে ও ভালবাসতো, কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে ! রোগের সময় রোজ

সকালে একগোছা ফুল তুলে দিয়ে আসতো ওর ঘরে। লোকটি উড়িষ্যার অধিবাসী, বৃদ্ধ! উজ্বলার ঠাকুরদার আমল থেকে আছে এ বাড়ীতে। ওর আর কেউ নাই। 'জয় প্রভু জগড়নাথ' বলে শয্যা ত্যাগ করে রোজ, তারপর সারাদিনের কাজ করে চলে কলের মত। সন্ধ্যায় পড়ে "পুরীমাহাত্ম্য" আর 'রামায়ণ'। লোকটা আজ পঁচিশ বছর যাবৎ কোনদিন মিথ্যা কথা উচ্চারণ করে নি। সজ্ঞানে সত্য কথা বলাই ওর সাধনা। এ সাধনায় ও সিদ্ধি লাভ করেছে। বাস্তুপুরুষ তার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

কে জানে, বৈকুণ্ঠ তাঁর আবির্ভাব বুঝতে পারলো কি না। উঠে দাঁড়ালো, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কয়েকটা ফুল তুলে তোড়া বাঁধতে লাগলো. যেন আজও সকালে উজ্বলার ঘরে দিয়ে আসবে। কাঁদছিল বৈকুণ্ঠ। ওর চোখের জল পড়লো একটা ফুলে, বাস্তুপুরুষ দেখলেন, এই স্নেহ-পরায়ণ সত্যবাদী বৃদ্ধের অশ্রুবিন্দুটি পুষ্পের প্রাণ-সত্ত্বাটুকু আকর্ষন করে নিয়ে উর্দ্ধলোকে উঠে গেল, হয়তো উজ্বলার কাছেই! বৈকুণ্ঠ এখনো এই বাস্তু-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ মানবাত্মা রয়েছে, তাই ওর সান্নিধ্য ভালো লাগে বাস্তু-পুরুষের। উনি সস্নেহে বৈকুণ্ঠের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—সত্যচারি, তোমায় স্নেহের অর্ঘ্য পেয়ে উজ্বলা তৃপ্ত হোক!

কিন্তু বৈকুণ্ঠ সে কথা শুনতে পেল না। ফুলগুলো তুলে মোটা একটা তোড়া বেঁধে নিয়ে গেল উজ্বলার শেষ-শয়ন ঘরে। দিল সাজিয়ে—তারপর ঐখানেই বসে রইল চুপটি করে।

বাস্তুপুরুষ এসে উঠলেন বৈঠকখানায়। গতরাত্রে অনেকক্ষণ অবধি এঘরে মদ, মাংস আর নারীর ভিড় চলেছিল, তারই ক্লেদ-পঙ্কিল ঘরখানা নরকের মত মনে হচ্ছে ওঁর চোখে। কিন্তু ওঁর কর্ত্তব্যে ত্রুটি হলে চলবে না, এই বংশের স্নেহঋণে বদ্ধ উনি—তাই প্রবালকে দেখা ওঁর দরকার। দেখলেন,

প্রবাল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে কৌচে শুয়ে—কিন্তু কাঁদছেও, আর কাঁদছে উজ্জলার জন্যই। এতকাল পরে আজ যেন তার ভগ্নীস্নেহ উথলে উঠেছে! কান্নাটা সত্যি আন্তরিক - বাস্তুপুরুষ বুঝলেন, সতী মায়ের গর্ভজাত সহোদর সহোদরা এরা ; তাই আজ প্রবালের বত্রিশ নাড়ী পাক খাচ্ছে উজ্জলার জন্য ! ওর অন্যায় ও আজ অনুভব কচ্ছে, অনুতাপ জাগছে তাই মনে। বুঝতে পারলেন উনি।

সমীরনের সঙ্গে উজ্জলার বিয়ে দিলে উজ্জলা মরতো না—প্রবাল এই কথাটাই ভাবছে, আর ভাবছে, লোচনের মত অতি শয়তান একজন লোক তাদের পরিবারে ঢুকবার সুযোগ পেত না। কিন্তু এখন এ ভাবনা মিথ্যা। —তবু প্রবাল ভাবছে, লোচনকে এবার প্রবাল তাড়িয়ে দেবে। তার শয়তানী প্রবাল আর বরদাস্ত করবে না।

বাস্তুপুরুষ বুঝতে পারলেন, প্রবালের বর্ত্তমান অনুভূতিটা তার পূর্ব্ব পুরুষের রক্তের গুণেই জেগেছে। তাঁদের পবিত্র রক্তকে পঙ্কিল করেছে ঐ লোচন, আর সেই উকীল ; প্রবাল এখন বুঝেছে সে কথা, কিন্তু এখন আর বুঝে কি লাভ ! এ-বংশের আর কল্যাণ নেই !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি এসে প্রবালের কাছে দাঁড়ালেন ; সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন ওর গায়ে, মাথায়, পেটে, প্রবাল সুস্থবোধ করছে।

—এই, কে আছিস ? বড়বৌকে এখানে ডেকে দে—প্রবাল বললো।

—যাই হুজুর ! বলে বারান্দা থেকে একটা চাকর গেল ভেতরে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই এল বড়বৌ ; চুল আলুথালু, কাপড় অসম্বৃত, মুখে চোখে কান্নার কাকুতি, গলায় সুর করে কান্না, কিন্তু মনে ?—বাস্তুপুরুষ বুঝে চমকে উঠলেন,—ওর মনে রয়েছে অতি কুৎসিত একটা চিন্তা। গত রাত্রে লোচনের সঙ্গে যে কথাটা কইবার সময় ঝি'র কান্নায় ওরা ঘর ছেড়ে

এসেছিল, সেই চিন্তাটাই ওর মনে। ওর দেহ অপূর্ণ কামনায় উত্তেজিত তাই মন ক্ষুব্ধ, তরঙ্গ-সঙ্কুল। ও ভাবছে শ্মশান থেকে লোচনের ফেরবার কথা আর উজ্জ্বলার বাবার রাখা যে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উজ্জ্বলার নামে জমা আছে, সেটা প্রবালকে বলে কেমন করে আদায় করে লোচনের হাতে দেওয়া যায়, তার ফিকির! কিন্তু বোন মরে গেছে, কাজেই প্রবাল-শৈবাল টাকাটা হয়তো দিতে চাইবেনা; অথচ বড়বৌ লোচনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, টাকাটা সে আদায় করে দেবে—ভাবতে ভাবতেই এল বড়বৌ। সোহাগ জাগিয়ে স্বামীর কোঁচেই বসে বললো—আহা, মা'র পেটের বোন! তোমার কি হচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু লক্ষ্মীটি! তোমার আবার পেটব্যথা বাড়বে—যে গেল সে তো গেলই, তোমাদের ত বাঁচতে হবে—ওঃ! সেই বিয়ের সময়কার চেহারাটি খালি মনে পড়েছে; কী চমৎকার না মানিয়েছিল লোচনের সঙ্গে ওকে! যেন হরগৌরী! কেঁদোনা গো .... বলে বড়বৌ নিজেই কাঁদতে লাগলো। প্রবাল চুপ করেই ছিল, এবার বললে—সবই অদৃষ্ট!

বাস্তুপুরুষ এই ভণ্ডামী আর সইতে পারলেন না, চলে গেলেন।

*   *   *   *   *

সদর দরজাতেই দাঁড়ালেন এসে বাস্তুপুরুষ। উজ্জ্বলার ঠাকুরদার আমলের বুড়ো চাঁপা গাছটা ফুলে ছেয়ে রয়েছে। উজ্জ্বলার ঠাকুরদা নিজের হাতে এগাছ পুঁতেছিলেন—মনে আছে বাস্তুপুরুষের। গাছটির তলাটুকু শান-বাঁধানো। সেই গাছতলাতেই উজ্জ্বলার ঠাকুরদা ম্লান বিষন্ন মুখে বসে রয়েছেন—দেখতে পেলেন বাস্তুপুরুষ। কাছে এসে দাঁড়ালেন; ঠাকুরদা ওঁর অঙ্গগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে চোখ তুলেই আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন ওঁকে; কাঁদতে কাঁদতে বললেন—এবংশের সব তে শে যহয়ে গেল প্রভু—আর কোনো আশা নেই!

—আছে বৎস। করুণাময় ঈশ্বর এখনো এককণা অগ্নি রেখেছেন এই বংশে – তাই আজো রয়েছি এখানে। কিন্তু তুমি কেন আবার এলে বৎস?

—কিসের যেন আকর্ষণ প্রভু, কি যেন আত্মিক শক্তি টেনে নিয়ে আসে। কিছুতেই স্বর্গলোকে থাকতে পারি না, উর্দ্ধলোকে যেতে পারি না—এত সাধের সংসার……

—ওসব মায়ার বাঁধন এবার কাটাও বৎস; তুমি স্বর্গলোকের অধিবাসী; পৃথিবীর মৃত্যুতিথিতে একবার এসে পিণ্ড গ্রহণ করা ছাড়া তোমার আর আসা উচিৎ নয়।

—ঐ পিণ্ডের আকর্ষণই পৃথিবীর কথা মনে পড়িয়ে দেয় দেব; কি করে উদ্ধার পাই!

—পাবে; ঈশ্বরকে ডাকো। তিনিই উর্দ্ধতর লোকে ঠাঁই দেবেন। তোমার থেকে তৃতীয় পুরুষ পার হয়েছে প্রবালের ছেলে হয়ে। তোমার পৃথিবীর আকর্ষণ শেষ হয়ে এল! যে কাজ পৃথিবীতে করেছিলে, তার গুণ-মাত্রা বাড়িয়ে উচ্চতর লোকে যাবার সাধনা কর, কর্ম্মের যোগ্য ফল পাবে, উচ্চলোকে যেতে পারবে। পৃথিবীর ভূমির বড় বেশী আকর্ষণ, বৎস, মনের মধ্যে আবার কামনা-বাসনা বাসা বাঁধলে আবার এই পৃথিবীতেই জন্মাতে হবে। সাবধান! কে কোথায় মরলো, কার সংসার ছারখার হোল এখানে, এসব তুমি আর দেখতে এসো না।

কথা বলছেন এঁরা, উদয় সূর্য্যের আলো পড়েছে গাছে-পাতায়, সুন্দর শান্ত প্রভাত, পাখীর কাকলিমুখর। পাখীর মতই সুস্বরে কে কেঁদে উঠলো—মা-ওমা…। উপরের ঘরে ঘুমুচ্ছিল প্রবালের খোকা প্রণব; ঘুম ভেঙ্গে উঠে মা'কে কাছে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। হয়তো সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবে, ছোট ছেলে, বাস্তুপুরুষ ত্বরিতে উঠে গেলেন ওঁকে দেখবার জন্য, ঠাকুরদাও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু গিয়ে

দেখলেন,—উজ্জ্বলার বাবা ওকে ধরে ধরে নামিয়ে দিচ্ছেন! শ্মশান থেকে ফিরেই উজ্জ্বলার বাবা উপরে গিয়েছিলেন। বাস্তুপুরুষ হেসে বললেন—আছ তো তুমি!

—হ্যাঁ, প্রভু! আপনি বলেছেন, এই প্রণবই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল!

—হ্যাঁ! তোমাদের দুর্গতি দেখে এই বংশেরই উর্দ্ধতন মুক্ত পুরুষ, যিনি এই বিগ্রহ, আর এই চণ্ডীপুর গ্রামের ধর্ম্মচক্র রচনা করেছিলেন, তিনিই তপোলোক ছেড়ে এই শিশু হয়ে জন্ম নিয়েছেন। এঁর থেকে তোমরা উদ্ধার পাবে; শুধু তোমরা নয়, আরো অনেক পাপী মানবাত্মা, অনেক নারকীয় জীবও মুক্তি পাবে!

প্রণব সিঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে নামছিল, আর মা-মা বলে ডাকছিল, কেউ সাড়া দিল না ওকে। কিন্তু ছেলেটা ঠিক নেমে এল, আর উঠলো গিয়ে উঠান পার হয়ে উজ্জ্বলার ঘরের কাছে! বৈকুণ্ঠ বসেছিল ওখানে; তাড়াতাড়ি উঠে ওকে কোলে নিয়ে বললো—ওরে বাপরে, খোকন, তুমি নামতে পারলে?

—হুঁ-উ; পিতিমা কৈ!—শুধুলো খোকন!

বাস্তুপুরুষ আর উজ্জ্বলার ঠাকুরদা সরে এলেন, কারণ দেখলেন, খোকার পিসিমাকে খোঁজা দেখে বৈকুণ্ঠ কাঁদছে আর বলছে—পিতিমা ঐ-ঐ-ঐ দেশে গেল খোকন .....।

উজ্জ্বলার বাবা কিন্তু স্থান ত্যাগ করলেন না! নাতির কাছে বসে রইলেন। বৈকুণ্ঠ ছেলেটার পরিচার্য্যায় মন দিয়েছে, কাজেই এঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ীর অন্য প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন প্রকাণ্ড বাদামগাছটার তলায়; দেখলেন, চণ্ডীমণ্ডপের ঈশানকোনে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বসে বসে কড়ি-ঝিনুক নিয়ে খেলা করছে! পাথর দিয়ে ঠুকে ভেঙে ফেলছে

কড়িগুলো, ঝিনুকগুলো—বড় বড় শাঁখগুলোও ভেঙ্গে দিচ্ছে মেয়েটা। ভাঙছে আর খিড়কীর পুকুরের জলে ফেলে দিচ্ছে। কি এ খেলা? বাস্তুপুরুষ এগিয়ে এসে শুধুলেন—আজ আবার ওকি খেলা খেলছো মা?

—শেষ খেলা। "হাতের সুখে পাতলুম্, পায়ের সুখে ভাঙলুম" বলেই মেয়েটা তার কড়ি-ঝিনুক-শাঁখ দিয়ে তৈরী খেলার ঘরবাড়ীগুলো পা দিয়ে মাড়িয়ে ভাঙতে লাগলো। সুন্দর কড়ি-ঝিনুক-শাঁক, কত রঙবেরঙের কিন্তু মেয়েটা নির্ম্মম ভাবে ভাঙছে সেগুলো! বাস্তুপুরুষ কিছু আর না বলে দেখতে লাগলেন, চোখের দৃষ্টি ওঁর ব্যথা-কাতর, কিন্তু ঠাকুরদা শুধুলো – কে মা তুমি? কেন এগুলো ভাঙছো?

—ভয় কি? ভাঙতে ভাঙতে আট-দশ বছর কেটে যাবে! এতো জমাট আর পাকা করে পেতেছিলাম ঘর-সংসার— উঃ! কতকাল খেলা করছি এখানে! না যাই—বলেই মেয়েটি লাফদিয়ে পড়লো গিয়ে পুকুরের জলে; আর উঠলো না!

—কে মেয়েটি দেব?—ঠাকুরদা প্রশ্ন করিলেন বাস্তুপুরুষকে।

—উনিই চঞ্চলা লক্ষ্মী। এই বংশের শেষ পুণ্যকণা আজ বিদায় নিয়েছে, তাই চলে গেলেন। প্রণব মুক্তপুরুষ, তাই এ বংশের কেউ নয়, তাছাড়া ধন-সম্পত্তি ভোগ করতে আসেনি সে। লক্ষ্মীর আর প্রয়োজন কোথায়?

ওঃ! সব ধ্বংস হয়ে যাবে! স্বর্লোকবাসী ঠাকুরদার চোখে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হচ্ছে, কিন্তু বাস্তুপুরুষ কঠোর স্বরে বললেন –পৃথিবীর মায়ায় তুমি অভিভূত হোচ্ছ—যাও, চলে যাও এখান থেকে! নইলে আবার তোমাকে হয়তো এই বংশেই, এই লক্ষ্মীছাড়া পরিবারেই জন্ম নিতে হবে কিম্বা অন্য কোথাও জন্ম নিতে হবে—কেউ রক্ষা করতে পারবে না সেই চুম্বকাকর্ষণ!

—আপনিও না !—ঠাকুরদা করুণ প্রার্থনার স্বরে প্রশ্ন করলেন !

—না, পারেন তিনি যাঁর ইঙ্গিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তিনিও তা করবেন না ! বিশ্বের প্রত্যেকটি অনুপরমাণু নিয়মবদ্ধ। নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কোনো উপায় নাই। লোহা চুম্বকের কাছে এলেই আকর্ষিত হবে— যাও !

—যেতে ইচ্ছে করছেনা দেব ! এই গ্রামকে বড় ভালবাসতাম। উত্তরের ঐ আম বাগান, দক্ষিণের ঐ বিরাট পুকুর, পশ্চিমের ঐ শ্যামল শস্যক্ষেত্র আমিই করেছিলাম। আমিই টোল করেছি, ইংরাজি স্কুল করেছি, ডাক্তারখানা বসিয়েছি ; এই গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার যাতে সুখে থাকে তার জন্য ·····

—তোমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি গে বৎস। স্বর্গের থেকে পৃথিবীর উপর মায়া তোমার অনেক বেশি ! তুমি তৃতীয় লোকের দ্বিতীয় স্তরের অধিবাসী হয়েও পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারোনি— তোমার দুর্ভাগ্য !

বাস্তুপুরুষ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরদা চারদিকে চেয়ে কোথাও তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। হয়তো উনি ঠিকই বলছেন, হয়তো পৃথিবীর এই ক্ষুদ্রগ্রামের উপর ভালবাসা আবার তাঁকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাবে ! কিন্তু হোলইবা জন্ম ! তাঁর ইচ্ছে করে, আর একবার এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বাল্য-কৈশোর-যৌবনের লীলা করে যাবেন ; সত্যি ইচ্ছে করে। কিন্তু পৃথিবীতে সেই রোগ শোক জরা-মরণ—না, পৃথিবীর মায়া তাঁকে কাটাতে হবে—কাটাতেই হবে—ভাবতে ভাবতে ঠাকুরদা ওখান থেকে চলে আসছেন, দেখলেন, সেই চাঁপাতলায় তাঁর ছেলে ধর্ম্মদাস দাঁড়িয়ে। কাছে গিয়ে বললেন—শ্মশান থেকে ফিরেই খোকাকে দেখতে গিয়েছিলি ?

—না, ও ঘুমোবার সময়, ওর আত্মাই শ্মশানে গিয়েছিল উজ্জ্বলার সঙ্গে। উজ্জ্বলার মা উজ্জ্বলাকে নিয়ে চলে গেল, খোকা দেখলো, তারপর ফিরবার পথে আমি খোকার সঙ্গে আসি। ও এসেই দেহের মধ্যে ঢুকে জেগে চোখ খুললো—আমাকে দেখছিল আর হাসছিল, ভারী সুন্দর লাগছিল ওর হাসিটি বাবা ; তারপর কেঁদে উঠলো !

—কেন কাঁদলো ?

—কি জানি ? হয়তো ঘুম ভেঙে ছেলেরা যেমন কাঁদে, তেমনি।

—না, ওতো ছেলে নয়, ওর মধ্যে মহাপুরুষের আত্মা রয়েছে। শোন্, তুই তো দিন দশেক থাকবি এখানে, ওকে সব সময় চোখেচোখে রাখিস !

—যে আজ্ঞে, আমার পাপেই এই সর্ব্বনাশ গেল বাবা .....

—দোষ কারো নয় বৎস ! সমস্তই শ্রীভগবানের করুণার লীলা—বলেই এসে দাঁড়ালেন বাস্তু পুরুষ, বললেন,—তোমার মনের ভাব বদলাতে পেরেছি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—যাও বৎস, স্বদেশে চলে যাও !

উজ্জ্বলার ঠাকুরদা বাস্তুপুরুষকে প্রণাম করে ঊর্দ্ধাকাশে উঠতে লাগলেন ; উজ্জ্বলার বাবা তখনো দাঁড়িয়ে ঐ গাছতলায়। বাস্তুপুরুষ বললেন—তুমিও পিতৃলোকে যেতে পার বৎস, আর ইচ্ছে করতো দশদিন থাকতে পার।

—আমার থাকতেই ইচ্ছে হচ্ছে প্রভু—খোকাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না !

—বেশ, থাক, তবে থাকবে ঐ চণ্ডীমণ্ডপে, অন্য কোথাও বেরিও না !

—রাত্রে খোকা যখন ঘুমুবে.....

—হ্যাঁ, তখন আমার সঙ্গে যেও তাকে দেখতে ! একা যেও না, কারণ তোমার পুত্রবধূর পাপের ক্লেদ তোমার গায়ে লাগলে তোমার সূক্ষ্ম শরীর

মলিন হয়ে ভারি হয়ে যেতে পারে—তাহলে আবার জন্মাতে হবে এই পৃথিবীতে—পৃথিবী ছেড়ে উর্দ্ধে যেতে পারবে না !

—ওকে আমিই এনেছিলাম প্রভু ! নীচ কুলজাতা ঐ মেয়েটাকে না আনলে……

—তুমি কিছুই করবার মালিক নও বৎস—এই জগৎ যাঁর ইচ্ছায় চলে, তুমি চল, আমি চলি, ঐ অগণ্য গ্রহনক্ষত্র ব্যাপ্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ড চলে, তিনিই ওকে এনেছিলেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। গাড়ীতে মাল বোঝাই করে ঠেলে নিয়ে যায় চালক তার ইচ্ছামত—গাড়ীর ইচ্ছার কেনো দাম নাই, তবে বোঝা হিসাবে গাড়ীর ওজন কিছু বাড়ে, বেশী ওজন হলে গাড়ী ভেঙ্গে যায়—আর হাল্কা ওজন হলে অবাধে চলে !

—আমার পাপের বোঝা কি খুব ভারী হয়ে গেছে প্রভু ?

—ভাবছো কেনো ?—তুমি তো এখনো ভেঙে পড়নি। যিনি চালাবার তিনি চালাবেন—স্মরণ কর, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—

* * * * *

বাস্তুপুরুষ ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। গ্রামের সর্পিল পথ ধরে চলতে লাগলেন, দেখলেন, উজ্জ্বলার শববাহকরা মড়া পুড়িয়ে ফিরে আসছে। ওদের সঙ্গে শৈবাল আর লোচন রয়েছে, আর শৈবালের ঠিক পাশেই একটা বিদেহী আত্মা আসছে ওর সঙ্গে, একটি নারী-আত্মা। বাস্তুপুরুষ দেখেই চিনলেন, আত্মাটি নিরুপমার। একদিন রাত্রে শৈবালকে নিরুর ঘরে দেখতে পেয়ে নিরুর স্বামী তাকে খুন করে, শৈবাল পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। নিরুর স্বামী এখন দ্বিপান্তরে, কিন্তু শৈবালের নামে কোনো কলঙ্ক উঠেনি। কারণ, শৈবাল যে ওখানে যেত তা বেশী লোক জানতো না, যারা জানতো, তারা অর্থশালী শৈবালের নাম চেপে

গিয়েছিল। নিরুর স্বামীও বুঝতে পারেনি, লোকটা শৈবাল কি অন্য কেউ। কিন্তু আজ নিরু শৈবালের পাশে পাশে আসছে। নিশ্চয় কোনো অমঙ্গল ঘটাবে। বাস্তুপুরুষ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নিরুর পানে তাকালেন। নিরুও দেখলো তাঁকে, ভয়ে নিরু ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠলো ; বাস্তুপুরুষ বললেন, —যাও,—চলে যাও, নইলে আরো যন্ত্রণাদায়ক নরকে ফেলে দেব, যাও!

নিরু চলেই যাচ্ছে, বাস্তুপুরুষ বললেন আবার—শোন, যতদিন আমি আছি এ-বাড়ীতে ততদিন এদের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করো না ; এখান থেকে অবশ্য আমিও শীঘ্রই চলে যাব, তারপর তোমার প্রতিহিংসা নিও!

নিরু কোন কথা না বলে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল। বাস্তুপুরুষ হাতের শূলখানা দিয়ে শৈবালকে স্পর্শ করলেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, —আমার কর্ত্তব্যে যেন ত্রুটি না হয় প্রভু!

শবযাত্রীরা ফটকের কাছে গিয়ে নিমপাতা চিবিয়ে মুখ ধুয়ে লৌকিক আচার শেষ করলো, দেখলেন উনি দাঁড়িয়ে—তারপর বিরাট প্রাসাদটার দিকে চেয়ে একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন– তোমারই ইচ্ছা করুণাময়!

বরাবর চলে এলেন উনি গ্রামপ্রান্তে। বিশাল বটগাছের নীচে ছোট্ট একটি বেদী, পাথরের, সেই বেদীর উপর একটি রক্তবসনা অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী গ্রামের বাইরের দিকে মুখ করে শুয়ে অছেন। বাস্তুপুরুষ গললগ্নীকৃত-বাসে প্রণাম করে কড়যোড়ে ডাকলেন—মা, একেবারে বিমুখী হয়ে শুয়ে আছিস মা! বিমুখ হয়েই দেবী উত্তর দিলেন—আর সুমুখে ফিরতে ইচ্ছে করেনা বাছা, আছি এখনো শুধু প্রণবকুমারের জন্য। ও যেদিন চলে যাবে, সেইদিন আমিও যাব, তুইও চলে যাস্।

— এই গ্রামের আর এই বংশের অনেক পূজা-প্রণাম গ্রহণ করেছি মা, বহুদিনের মায়ার বন্ধন, কিন্তু এদের কিছুই করতে পারলাম না। তুইও কি উঠবিনা মা ?

—না, করবার মালিক তুই-আমি কেউ নই বৎস। যা-কিছু করবার তিনিই করছেন। এই বংশের সত্ত্বগুণাশ্রিত পুণ্যকর্ম্ম এই গ্রামের মানুষদের সকলকে সৎ আর সুন্দর করেছিল, আবার এই বংশেরই পাপের প্রভাব সারা গ্রামটাকে প্রভাবিত করেছে অসৎ আর অসুন্দর কর্ম্মের তমো গুণে ! জীব নিজের গুণ আর কর্ম্ম অনুসারেই ফল পায় বাছা—ওদের জন্য তুই আমি কি করতে পারি ?

—ওদের এমন ভাগ্য কেন হোল মা ? কেন ওরা অপকর্ম্ম করলো ? কার প্রেরণায় ?

—নিয়তি বৎস ! সে নিয়তির কারণ আমাদের অজ্ঞাত। ধ্বংসের মধ্যে যিনি সৃষ্টির বীজ সঞ্চিত করে রাখেন, তিনিই জানেন, সে কারণ কি। তবে আমরা দেখতে পেলাম, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে এদের ইন্দ্রিয়জ সুখানুভূতিকে প্রবল করে তুললো, আমিত্বকে বড় করে দেখালো, ত্যাগ-সাধনার সূক্ষ্ম মার্গ ছাড়িয়ে ভোগ-সাধনার প্রশস্ত রাজপথে নিয়ে এল—এরা হোল কামক্রোধাদির বশীভূত অতি সাধারণ জীব—এ নিয়তি !

—এ গ্রামে তুই রক্ষা করে আসছিলি মা এদের ; কাল হোল ধর্ম্মদাসের কলকাতা যাওয়া। ঐ ছিদ্র পথেই পাপ ঢুকলো। কিন্তু মা, ওকে যেতে দিয়েছিলি কেন ?

—ওর জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মের বন্ধন বৎস, সেই টানে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, আমি কি করবো ! তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম,—প্রথম দিন অযাত্রা দেখাই, দ্বিতীয় দিন গাড়ী ফেল হয়, তৃতীয় দিন শরীর খারাপ করে

দিই ; কিন্তু ওর গত জন্মের ভোগবাসনা ওকে টানছে,—অসুস্থ শরীর নিয়েই ও চলে গেল। হয় তো ঈশ্বরের এই ইচ্ছে, যে এ গ্রাম ধ্বংস হোক।

—আর কোনো উপায় ছিলনা মা ?

—না ! ওর সতীলক্ষ্মী পত্নীর বুকে সে ব্যথা সইবেনা, তাই ঈশ্বর তাকে কয়েকমাস পূর্ব্বেই এখান থেকে সরিয়ে দেন—নইলে হয়তো সেই পবিত্র সতী-দেহের স্পর্শে ধর্ম্মদাসের কায়-মন আবার পবিত্র হয়ে যেত ! শক্তিরূপা সেই নারীর শক্তিতে ধর্ম্মদাস আবার ধর্ম্মজগতে ফিরে আসতে পারতো। কিন্তু যা হবার তাই হোলো বৎস, আমাদের যতটুকু সাধ্য করেছি—যা, ফিরে যা !

—তুই আর কতদিন এমন করে শুয়ে থাকবি মা ?

- যতদিন প্রণব এই পথ ধরে এই গ্রাম থেকে চলে না যায়। ওর পবিত্র সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে পারবোনা এত কষ্ট সত্ত্বেও। তবে বৎস, তোকে তো বলেছি, এই বংশের উপর বিশ্বদেবতার আশীর্ব্বাদ আছে—তাই প্রণব এখানে জন্মেছে। ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখিস।

—মা'র আদেশ শিরোধার্য্য—বলে বাস্তুপুরুষ প্রণাম করে ফিরতে লাগলেন। নিরুদের বাড়ীটা পথে পড়ে—দেখলেন—প্রেতিনী নিরু পড়োবাড়ীর ভাঙা দেওয়ালে বসে গান ধরেছে—উনি মুখ ফেরালেন।

ছোট একটা ঘূর্ণি হাওয়া সবেগে আসছে পথের উপর,- কোনো বিদেহী আত্মা হবে, ভেবে বাস্তুপুরুষ দাঁড়ালেন। ঘূর্ণিটা ওঁর পায়ের কাছে এসেই থেমে গেল করুণ কণ্ঠে বললো—বড় বিপদ প্রভু, শীগ্‌গির আসুন। প্রণব ঘুমুচ্ছে, আর কয়েকটা দুষ্ট প্রেতাত্মা তার দেহটাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে !

—বৈকুণ্ঠ কোথায় ? বাস্তুপুরুষ প্রশ্ন করলেন চলতে চলতে। উজ্জ্বলার বাবা বলল —সে উঠোনের চারপাশের ফুলগাছগুলোয় কোপ্ দিচ্ছে, ঘাস পরিষ্কার করছে। আমি কোন রকমেই তার মনে আমার ইচ্ছা চালিত করতে পারলাম না—প্রণব ঘুমুচ্ছে ভেবে সে নিশ্চিন্তমনে বাগানের কাজ করছে। কথা বলতে বলতেই ওঁরা বায়ুর গতিতে চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে পৌঁছে দেখলেন, রোয়াকে প্রণব ঘুমুচ্ছে, আর বৈকুণ্ঠ বাগানটার গাছগুলো কোপাচ্ছে। এদিকে কয়েকটা ভীষণ দর্শন প্রেত নিজেদের মধ্যে কি সব পরামর্শ করছে। প্রেতেরা ওঁদের যাতে দেখতে না পায়, এইজন্য ওঁরা ভূ-স্তর থেকেও উর্দ্ধ লোকের সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করে শুনতে লাগলেন, একজন বলছে—এই ঠিক সময়—একটা শির ছিঁড়ে রক্ত চুষে খাব।

—একে মারতে পারলেই কাজ ফতে—বুঝলি, তখন এই ঘর-বাড়ীতে আমরা মজা করে নাচবো আয়—আয়!

কণ্ঠস্বর ওদের অনুনাসিক—শব্দ ব্রহ্ম, তাই নীচুস্তরের প্রেতের কণ্ঠে সঠিকভাবে উচ্চারিত হন না—রাম বলতে গিয়ে ওরা রাঁম বলে বসে, কৃষ্ণ বলতে কিঁরিষনো বলে। বাস্তুপুরুষ দেখলেন, সত্যি দুটো প্রেত উঠে আসছে প্রণবের ঘুমন্ত দেহটার দিকে। প্রেতদুটি বেশ শক্তিশালী ; এখুনি ওরা প্রণবের দেহের পার্থিব রসরক্ত চুষে নেবে, তারপর অসুস্থ হয়ে প্রণবের দেহটা জীর্ণ হয়ে যাবে, প্রণব সে-দেহ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কি উপায় তিনি করবেন, ভাবতে ভাবতে নিজের দেহের-সূক্ষ্ম তেজ দিয়ে প্রণবকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু কতক্ষণ তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন ? সদা-সর্ব্বদা কে প্রণবকে রক্ষা করবে ? প্রণবের মা কোথায় ? ভেবেই তিনি উপরের ঘরে দৃষ্টি ফেললেন, দেখলেন, লোচনের মাথাটা কোলে নিয়ে বড়বৌ তাকে সরবৎ খাওয়াচ্ছে! একেবারে গল্পে মসগুল, ছেলের দিকে ওর মন এখন ফেরানো সম্ভব নয়। আর ইচ্ছেও করলো না বাস্তুপুরুষের।

ঐ মহা পাপীয়সী নারীর অন্তরে প্রবেশ করে কেন তিনি নিজকে কলুষিত করবেন! তার চেয়ে বৈকুণ্ঠের অন্তরে প্রবেশ করে তিনি প্রণবের দিকে তার মন ফেরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ আপন ভাবে আচ্ছন্ন; কোনো রকমেই কিছু করতে পারছেন না বাস্তুপুরুষ। ওদিকে প্রেতগুলো প্রণবের দেহের চতুর্দ্দিকে তেজোরেখা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু প্রণবকে হত্যা করবার চেষ্টা ওরা করবেই।

উজ্জ্বলার বাবা প্রেতদের অশ্রুতব্য উর্দ্ধলোকের সূক্ষ্ম ভাষায় বললেন, —বৈকুণ্ঠের অন্তরে আপনিও প্রবেশ করতে পারছেন না দেব?

—না—বৈকুণ্ঠ সত্যবাদী, সত্যচারী, সত্যব্রত সাধক, ও এখন জগৎ-স্বামী জগন্নাথের চিন্তায় বিভোর; প্রভুর রথযাত্রার সময় ও দেশে যাবে, তাই প্রভুর কথাই ভাবছে। ওর ধ্যান ভাঙানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

—তা হলে?

—প্রণবের দেহে চিমটি কেটে দাও। ও কেঁদে উঠলে বৈকুণ্ঠের ধ্যান ভাঙবে।

উজ্জ্বলার বাবা তৎক্ষণাৎ প্রণবের ডান বাহুতে চিমটি দিলেন।

প্রণব কেঁদে উঠলো। বৈকুণ্ঠ হাতের খোন্তাটা ফেলে তাড়াতাড়ি এসে কোলে নিল ওকে, সস্নেহে বললো,—কি হোল মানিক, গোপাল আমার!

বাস্তুপুরুষ নিজ জ্যোতি সংবৃত করেই দেখলেন, বৈকুণ্ঠের আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেতগুলো পালাতে আরম্ভ করেছে। গতি ওদের পার্থিব বায়ুর থেকে বেশী নয়—তাই বাস্তুপুরুষ নিজের দেহকে ওদের দেখবার উপযুক্ত করে ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালেন—হাতের শূল উঁচিয়ে বললেন বজ্রকঠোর স্বরে—এখানে কেন এসেছিস্ হতভাগার দল! এখানে

এই বংশের পুণ্যাত্মারা আসেন, প্রণবের মুক্তাত্মা এখানে দেহধারী, আমি এখনো উপস্থিত রয়েছি, আর তোরা কোন সাহসে এসেছিস ?

ওরা ভয় পেয়েছে খুবই, কিন্তু একজন সাহস সঞ্চয় করে করযোড়ে বললো—ইখাঁনে মদ চঁলছে, মাগী আঁসছে—তুমি আঁবার আঁছ কেন ঠাঁকুর ? ঐ দেঁখ, ঐযে......বলেই সে আঙ্গুল বাড়ালো দোতালার দিকে।

বাস্তুপুরুষ দেখলেন—বড়বৌ লোচনের গায়ে ঠেস দিয়ে শুয়ে, আর লোচন তার মুখে মদের গ্লাসটা ধরছে, খাচ্ছে বড়বৌ। দীপ্ত প্রভাত, দিনের বেলা, আর এই সময়েই এই বংশের কুলবধূর এই জঘন্য কীর্ত্তি! এদের কল্যাণ আর কি করে করবেন তিনি ? অশ্রুসজল চোখে বললেন—আমি যেকদিন আছি, তোরা একটু সামলে চল! আমিও আর বেশীদিন নাই—তারপর তো আসবিই—বাড়ীটা নরক হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রণবের কোনো ক্ষতি করতে আসিস না—তাহলে দণ্ড পাঁবি—যা সব।

ওরা অনুমতি পাবামাত্র বায়ুবেগে পালিয়ে গেল! বাস্তুপুরুষের দুচোখে জলধারা। ধীরে ধীরে তিনি এসে চণ্ডীমণ্ডপের বেদীর কাছে দাঁড়ালেন ; সে বেদীতে নিত্য পূজা হয় এখনো—কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী ঘুমুচ্ছেন। সত্যি ঘুমুচ্ছেন কিম্বা চলে গেছেন, জানতে পারছেন না বাস্তুপুরুষ। করুণ স্বরে বললেন—মা—মা! তুই কি আছিস এখনো ?

কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা, কিন্তু দেখতে পেলেন, বেদীর উপর দেবীর..অস্পষ্ট ছায়া—ঘুমুচ্ছেন। জাগবার ইচ্ছে নেই, তবে এখনো আছেন!—করুণাময়ি মা, এখনো তুই রয়েছিস—এতো পাপের পরেও তোর মাতৃ-অন্তর ক্ষমাই করছে এদের, নইলে প্রণবের মত মুক্তাত্মার এখানে জন্ম হবে কেন! কিন্তু মা, বুঝতে পারছিনা, ঐ পাপীয়সীর গর্ভে প্রণব কেন জন্মালো!

কোনো উত্তরই পেলেন না তিনি ; দেবী নিদ্রিতা। পুরোহিত পূজা করতে এলেন, বাস্তুপুরুষ নতজানু হয়ে শুনতে লাগলেন স্তোত্রপাঠ :—

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়নে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥"

— হে আর্ত্তিহারিণি শরণাগত-পরিত্রাণ-পরায়না মাতা, তোমায় বারম্বার প্রণাম করি! কোন্ উদ্দেশ্যে তুমি কি কাজ কর - জানবার আমাদের কোনো উপায় নাই। হে মহা রহস্যময়ি মহাবৈষ্ণবি, কোন্ মহাপাপীর মধ্যে কোন মহাপুণ্য তুমি সঞ্চিত রাখ, তুমিই জানো, হে চরাচর সৃজন-কারিণি মহাপ্রকৃতি, তোমার রহস্য তোমার ইচ্ছাতেই আমার কাছে অজ্ঞাত রইল—আমার নির্ব্বুদ্ধিতা মার্জ্জনা করো! মা'কে প্রণাম করে বাস্তুপুরুষ দেখলেন—প্রণবকে কোলে নিয়ে বৈকুণ্ঠ তার মাথায় দেবীর নির্ম্মাল্য ঠেকিয়ে বলছে - মা দুগ্‌গা রক্ষে কর! জয় প্রভু জগড়নাথ—জয় সুভদ্রা-বলরাম-শ্রীকৃষ্ণ—জয় হোক!

বাস্তুপুরুষ দেখলেন, দেবীর অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির সুপ্ত মুখখানি স্নেহের কোমল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো একটি নিমিষের জন্য!

চন্দ্রদূত মাকে বলছিলেন—ঐ যে ছেলেটি দেখছো মা, ওর বিলাতে জন্ম, পৃথিবীর পশ্চিম দিকে, কিন্তু ওর কর্ম্ম পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে ওকে টেনে এনেছিল, সেখানেই মরলো।

—পৃথিবীতে কি করতো ছেলেটি? মা জিজ্ঞাসা করলেন!

—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে ও শিক্ষা পেয়েছে। ধনীর ছেলে; কষ্ট কেমন, জানতো না, কবিতা লিখতো, প্রেমের কবিতা, অথচ ছেলেটা প্রেমিকা পেল না জীবনে।

—কারণ?

—কারণ এর আগের জন্মে ও ছিল এশিয়ার অধিবাসী, ইরানে জন্মেছিল ; একটি সরলা ইহুদি মেয়ের প্রেমকে ও বারম্বার প্রত্যাখ্যান করেছে, শুধু তাই নয়, এমন শক্ত কথা বলেছিল, যার জন্য মেয়েটির জীবনে আর কোনো মমতা ছিল না—সে একদিন বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে। তাই এ জন্মে একে প্রেমিক কবি হতে হয়েছে, অথচ প্রেম জিনিষটাই ও জানলোনা ; কারো ভালবাসা পায়নি ছেলেটি।

—কেউ ওকে ভালোবাসে না ? অমন সুন্দর ছেলে !

—না, পৃথিবীর কেউ না ; ওর মা বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করে সরে গেলো। একটা বোন ছিল, দাদার কবিতাকে বিদ্রূপ করতো, সেও বিয়ে করে পর হয়ে গেছে ; বাপের সম্পত্তি আছে, কিন্তু নায়েব গোমস্তারা ওকে ঠকিয়ে খায়—কেউ পৃথিবীতে ওকে ভালোবাসে নি ! এমন দুর্ভাগা !

—ওর কোন্ লোকে ঠাঁই হবে প্রভু !

—তা তো আমি বলতে পারবো না মা, আমার সে ক্ষমতা কোথায় ! তবে জানি, চন্দ্রদেব ওকে স্নেহ করেন, তাই ও গত তিন জন্ম কবিতা লিখে আসছে, কিন্তু ওর কর্ম্মফল কাটলো না, রক্তাক্ত সেই মেয়েটী গত জন্মের থেকে ওর অনুসরণ করছে। সে এবারও মঙ্গলের প্রভাব নিয়ে জন্মেছে, আছে ঐ পূর্ব্ব যুদ্ধাঙ্গনেই নার্স হয়ে। তারই টানে ওকে পৃথিবীর পূর্ব্ব সীমায় আসতে হয়েছিল, ওর নিয়তি এনেছিল ওকে মা।

—কি হোল তারপর ?

—সে মেয়েটি প্রতিশোধ নিচ্ছে। এ জন্মে এই ছেলেটিই সেই মেয়েটীর প্রেমে পড়লো, খাঁটি দৈহিক রূপজ মোহ আর কি ! ঐ নার্সের পিছনে ও ঘুরতো, তার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করতো, তাকে কবিতা পড়ে শোনাতে চাইতো। মেয়েটি তো প্রতিশোধ নেবেই, তাই ওকে তার রূপের

শিখায় আরো ভালো করে পুড়িয়ে মজা দেখতো, খেলাতো, শেষে একদিন নার্সের খাতায় নাম লিখিয়ে ও বলে এলো, ফিরে এসে ধরা দেবে, কিন্তু মোহগ্রস্ত এই কবি, নিতান্ত দুর্বল কবি হয়েও ঐ মেয়েটির সন্ধানেই যুদ্ধে যোগ দেয়। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে কতবার সে ও মূর্চ্ছা হবহব হয়েছে, ঠিক নাই ; কেবল কাঁদতো আর কবিতা লিখতো।

—মিলন হয় নি দুজনায় ?

—না মা, মেয়েটা তো একে ভালবাসে না এ জন্মে ; সে এবার হয়েছে একটি প্রজাপতি, ফলেফুলে ঘোরে। প্রেম তার অন্তর থেকে শুকিয়ে গেছে। অবশ্য তার গত জন্মের প্রেমটাও দৈহিক ক্ষুধাই ছিল, যা না-মেটানোর জন্য এর উপর রাগ করে সে শত পতি বরণ করছে। ওদেশের প্রেমটা প্রায়ই দৈহিক হয় মা অনেক জন্ম ঘুরতে হয় ওদের— এদের মিল হতে দেরী হবে।

— তাহলে ?

—দুঃখের আগুনে পুড়ে ছেলেটি শুদ্ধ হবে, তারপর সত্যিকার প্রেমিক হয়ে ভালো কোনো দেশে জন্মাবে ; তারপর পাবে ভালোবাসা। যতদিন তা না হয়, ততদিন ও কবিতা লিখবে আর কাঁদবে ঐ মেয়েটার জন্যই। এমনকি, ওর সঙ্গে অবৈধ সংযোগও হতে পারে কিন্তু তাতে দুজনেরই দুঃখ বাড়বে—পাপ ভারী হবে। এ ওর পাপের শাস্তি মা। চন্দ্রদেব ওকে ভালোবাসেন, তাই জলে ডুবিয়ে ওর দেহটাকে নষ্ট করে ওকে নিয়ে এলেন এখানে—চল মা, জলারা এসে পড়ল।

—কত জন্ম ওকে ঘুরতে হবে দেব ?—মা আবার শুধুলেন যেতে যেতে !

—তা তো জানি না মা, তবে অনেক গুলো জন্ম নিশ্চয়। জন্মমৃত্যুর আবর্তে এই বিশ্বচক্রে দেহঘট সৃষ্টি হয়, আবার ভাঙে, আবার হয়, প্রত্যেক

বারই কিছু কিছু মাটি কমে যায় অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয় হয়—কতদিনে কার কর্ম্ম শেষ হবে কেউ তা বলতে পারে না—যিনি বলতে পারেন, তিনি চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম, কিন্তু তিনি বলেন না, তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার সুপ্ত!

- সকলেই কি কর্ম্মের অধীন প্রভু? আপনারাও!

- হ্যাঁ, মা,—নইলে কেন যাই পৃথিবীতে এদের আনবার জন্য? আমার কর্ম্ম এই। কর্ম্মের অধীন বিরাট বিশ্বজগৎ, ঐ অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ গ্রহতারা, চন্দ্রসূর্য্য, ঐ কোটি কোটি অণুপরমাণু সমন্বিত অসীম ব্রহ্মাণ্ড!—এসো!

মা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছিলেন দেবদূতের কথা, বিশ্বের অধিদেবতার অগাধ অসীম ধারণাহীন বিরাটত্বে শ্রদ্ধায় মাথা তাঁর নুয়ে আসছিল। বললেন,

—আপনাদেরও পৃথীবীতে যেতে হয়েছিল দেব মানুষ হয়ে?

—হ্যাঁ, শুধু মানুষ নয়, কত ইতর জীব হয়ে জন্মেছি, তারপর কত জাতির মধ্যে, কত ধর্ম্মের প্রভাবে, কত সমাজের পীড়নে, কত দুঃখের দাহন আর সুখের সুবাসকে কতবার ভোগ আর কতবার ত্যাগ করে এলাম, সে সব আমার লক্ষ লক্ষ জন্মের কথা—তারপর আরো কত পৃথিবীর মত গ্রহে, পৃথিবী থেকে উচ্চতর জীবের আবাসভূমি অন্যান্য গ্রহে কতবার জন্মেছি, হিসাব রাখতে পারিনে—আবার জন্মাতে হবে কি না, তাও জানি না!

—কর্ম্মের কি কোনোদিন ক্ষয় হয় না প্রভু?

—হয়, কিন্তু কার কতদিনে হয়, জানি না আমরা কেউ। যার হয় সে তো আর বলতে আসে না মা—সে ঐ চিদানন্দময় পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। সে অবস্থার কথা আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তি, কি করে জানবো!

মা নীরবে চলতে লাগলেন। উজ্জ্বলা আর সেই যুবকটি ওঁদের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। উজ্জ্বলা অনুভব করছিল, পৃথিবীতে তার দেহের যতটা ওজন ছিল, এখন যেন তা থেকে অনেক কমে গেছে! বিয়ের আগে সে একবার শরীরের ওজন করিয়েছিল, একশ' বিশ পাউণ্ড! তারপর অসুখে ভুগে তার ওজন কমে প্রায় আশী-নব্বই পাউণ্ডে দাঁড়ায়—আজ পৃথিবী থেকে আসবার সময়ও সে সেরখানেক আন্দাজ ভারী ছিল—কিন্তু এখন বোধ হয় একছটাকও নয়। কিন্তু আরো কমে যাচ্ছে ওজন। দেহ এত হাল্কা লাগছে যে গতি তাদের বেশ দ্রুতই হয়ে উঠছে। বেশ জোরেই তারা পথ বেয়ে যেতে পারছে।

পথটাই বা কী সুন্দর! চন্দ্রমণ্ডল থেকে সোজা নেমে এসেছে একেবারে, যেন একফালি কৃষ্ণ জ্যোৎস্না,—কৃষ্ণপক্ষ বলেই হয়ত, কিম্বা দিনের বেলা বলে—একটা উজ্জ্বল কালো জ্যোতিরেখা চন্দ্র থেকে পৃথিবীর উচ্চতম বায়ুস্তর পর্য্যন্ত চলে গেছে—নরম, সুন্দর সে পথ, পেঁজা তুলো থেকেও নরম। যেখানে মা আর দেবদূত একটু আগেই কথা বলছিলেন, সেখানে পৌঁছে উজ্জ্বলা দেখলো, অন্য দিক থেকে আরো একটা লাল আলোর মত পথ এই পথটিকে কেটে চলে গেছে, কোন্‌দিকে কে জানে! এখানে তাই একটি চৌমাথার সৃষ্টি হয়েছে—তার এক কোনায় একটি বিরাট বনস্পতি ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে। কি গাছ, চেনে না উজ্জ্বলা, কিন্তু দেখতে গাছটি আশ্চর্য্য সুন্দর! সঙ্গের যুবকটিকে শুধুলো—এটা কি গাছ, চেন?

—না তো! কী সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে! ফুল, না ছোট ছোট চাঁদ ওগুলো?

—কি জানি, চাঁদই হবে হয়তো!—ওম্মা, তোমার সেই মিলিটারী পোষাক কৈ?

—তাইতো, কিন্তু তোমারই বা শাড়ী কোথায় ?

দুজনেই নিজের পানে চেয়ে দেখলো—কৃষ্ণ আবরণে ওদের দেহ আচ্ছাদিত হয়ে গেছে ; সে আবরণ অন্ধকারের নয়, আলোকের ছায়ার—সে ছায়ার নিজস্ব জ্যোতি আছে—অথচ স্নিগ্ধ সে জ্যোতি, শীতলও। চন্দ্রদূত আর উজ্জলার মা কথা কইতে কইতে আস্তে চলছিলেন ; কারণ, উজ্জলারা আবার পিছিয়ে পড়তে পারে, ওদের গতিবেগ এখনও চন্দ্রলোকে চলবার উপযুক্ত হয়নি। ওরা এখানে নবজাত শিশু, যদিও আকৃতি প্রকৃতিতে ওরা পৃথিবী ছেড়ে আসবার সময়কার দেহটার মতই আছে, শুধু ওজন কম। কারণ, এ-দেহ ওদের চন্দ্রলোকের জ্যোস্নাময় উপাদানে তৈরী। ওঁরা চলছিলেন, যেন ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে সঙ্গে করে নতুন দেশ দেখাতে যাচ্ছেন বাপ-মা, ঠিক এমনি ধরণে। উজ্জলা যতটা পারে ছুট্‌বার চেষ্টা করে কাছে এসে শুধুলো—আমাদের জামা কাপড় এমন হয়ে গেল কেন মা ?

—পৃথিবীর জামা কাপড় ফেলে এসেছ যে মা, সে দেহও তো ফেলে এলে। এই দেহ, পোষাক পরিচ্ছদ সব এখানকার—মা উত্তর দিলেন। উজ্জলা সঙ্গী যুবকের পানে চেয়ে দেখ্‌লো, তার কবি-সঙ্গী ঠিক কবির মতই পোষাকে সজ্জিত হয়ে গেছে। আর সে নিজে পরেছে স্নিগ্ধ ছায়ার শাড়ী, আঁচলাতে ছোট ছোট জ্যোস্নাকণা, সারা শাড়ীটার জমিতে কেমন একটা আলো-আঁধারি ঢেউ—বড় চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে ! গলায় শাঁখের মত সাদা এক রকম সুন্দর মালা আর হাতে ঝিনুকের চুড়ী। ওর সঙ্গীর পোষাকের রঙ একটু পীতাভ ছায়া, আর তার জমিতে কোন রকম ঢেউ নেই, গলার উত্তরীয়টা ঠিক দ্বিতীয়ার চাঁদের এক ফালি জ্যোস্নার মত। ওকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ; ওর হাতে আবার এক-

গোছা ফুল দেখ্‌তে ঠিক সমুদ্র ফেনার মতন। উজ্জলার বেশ লাগছিলো। ওকে—শুধুলো,

—আচ্ছা ভাই, তোমার নাম কি?

—ওনীল মর্গ্যান—বললো সেই যুবকটি, তারপর হাতের ফুলগুলি উজ্জলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লো—নাও, ঐ পথের পাশে ফুটেছিল. তুলে আনলাম।

—আমায় দেখালে না যে, বাঃ রে! আমি নিজে তুল্‌তাম—উজ্জলা অভিমান ক'রে ফুল নিতে চাইছেনা। ওনীল প্রথম একটু থতমত খেয়ে গেল, তারপর বললো—তোমায় দেব বলেই তো তুললাম, আমায় দেওয়ার আনন্দটি পেতে দাও মিস্‌…!

—ধেৎ! ওসব কথা বলোনা আমায়, বুঝলে! বলেও উজ্জলা কিন্তু নিল ফুলগুলি। ওই ফুলের একটা গন্ধ রয়েছে, মাটি-মায়ের সোঁদা গন্ধ যেন সে ফুলে।

—দেখ মা, কেমন মিষ্টি গন্ধ! বর্ষার প্রথম জল পাওয়া মাটির যেমন গন্ধ হয়, ঠিক তেমনি—দেখো মা, ভারী চমৎকার কিন্তু! উজ্জলা আবার শুঁকলো ফুলগুলি। চন্দ্রদূত বল্‌লেন—ভূর্লোকের শেষ চুম্বক-তরঙ্গ যেখানে চন্দ্রলোকের তটরেখায় প্রতিহত হচ্ছে, সেইখানে মৃত্তিকার ব্যোমসত্ত্বা ফেনায়িত হয়ে ওঠে; ওগুলি সেই ফেনপুঞ্জ। ওতে এখনো মৃত্তিকার গন্ধ; ঐ মৃৎসুবাস এখনো তোমাদের পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করছে মা, আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তুমি পৃথিবীর জীব, পৃথিবী তোমার জন্মভূমি; তোমার স্মৃতির মধ্যে তার অঙ্গ-গন্ধ জেগে রয়েছে এখনো; ও তোমার জন্মভূমি মায়ের পুণ্য সুবাস! ঐ স্মৃতিকে কূটস্থ করতে না পারলে পৃথিবীর আকর্ষণ প্রবলতর হবে. আর তার টানে আবার যেতে হবে সেখানে ফিরে— ও ফুল ফেলে দাও মা, নিওনা।

উজ্জ্বলা তৎক্ষণাৎ ফেলে দিল ফুলগুলো, কিন্তু আহত হোলো সেই যুবক ওনীল। ওর মুখে ব্যথা আর অভিমান জেগে উঠলো যেন। উজ্জ্বলা বুঝতে পারলে, উপহার দেওয়া ফুলগুলির অনাদর করায় ওনীল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হেসে বললো—রাগ করোনা ভাই, এ ফুল নিতে বারণ করছেন উনি। নিলে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে আমাদের।

—যাবো, তাতে ক্ষতিটা কি? পৃথিবী কি এমন মন্দ জায়গা?—বলে ও চুপ করলো। একটু পরে আবার বললো—স্নেহ-প্রেম-ভালবাসায় ভরা সোনার পৃথিবী আমাদের, কত রূপ, কত রস, কত গন্ধ, কত হাসি মান অভিমান ···

—সে সব হয়তো এদেশেও আছে—উজ্জ্বলা আস্তে বললো।

—আছে মা, সবই আছে, তবে পৃথিবীর মত নয়, তার থেকে সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী স্নেহ প্রেম ভালবাসা আছে এদেশে; বললেন চন্দ্রদূত কিন্তু এসো, আর দেরী করতে পারবোনা। বলেই তিনি দ্রুত চলতে লাগলেন। উজ্জ্বলার মাও সঙ্গে আছেন কিন্তু উজ্জ্বলা আর ওনীল এখনো পারছেনা তাঁদের সঙ্গে সমানে চল্‌তে, পিছিয়ে পড়ছে ওরা। মা বললেন- ওরা আবার পিছিয়ে পড়ছে দেব!

—আসুক, ঐ প্রথম তোরণ-দ্বারে গিয়ে অপেক্ষা করবো। ওরা এখানে নবজাতক, চলাফেরায় অভ্যস্থ হ'তে সময় লাগবে,—বললেন দূত। কিন্তু তিনি যেন চিন্তিত।

—কি আপনি ভাবছেন প্রভু? খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে যেন!

—হ্যাঁ মা চিন্তার বিষয়। চন্দ্রদেব আমাকে আদেশ করেছিলেন. জ্জলা আর ওনীলকে যেন এক সাথে নিয়ে আসি- কেন যে আদেশ করেছিলেন, এখন বুঝতে পারছি।

—কেন? আমি কি জানতে পারি?

—না মা, জানাবার শক্তি নেই আমার। তাছাড়া আমি শুধু অনুমান মাত্র করছি। পৃথিবীর উন্নত জীবদের অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার যে জীবের আছে, তাদের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের নিয়ন্তা চন্দ্রদেব. তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে কার মন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন, আমরা জানিনা মা, অনেক সময় আমাদের অনুমান ভুল হয়।

—অন্যান্য জীবের আত্মাদের কি হয়? মা প্রশ্ন করলেন।

—তাদেরও মন আছে, তবে অপরিস্ফুট ; চন্দ্রদেব সে মনকে জন্মের পর জন্মের মধ্য দিয়ে উন্নত করেন, জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মন জাগ্রত করেন তাদের মধ্যে। আমরা নগণ্য দূত মাত্র, বিশেষ কিছু জানিনা মা, তবে চোখে দেখি, অগণ্য জীবাত্মা অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করছে—উদ্ভিদ, কৃমিকীট থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষ পর্যান্ত, তারপর মানুষের হাজার বিবর্ত্তন, ক্রূর, হিংসুক, পরদ্বেষী, লোভী, কামুক, আবায় দয়া-মায়া স্নেহ-প্রীতিতে উজ্জ্বল, ভক্তিতে প্রেমে উদ্বেল, ত্যাগে তপস্যায় ঈশ্বরের পর্য্যায়ে উন্নীত। মনই যে কত রকমের দেখলাম, কত বিচিত্র, কত বীভৎস, কত সুন্দর, কত বিশাল, কত পবিত্র!

ভাবাবেগে দূতের চোখ দুটিতে শান্ত জ্যোস্নার আলোলেখা ফুটে উঠলো। অন্ধকারের মসৃণ জ্যোতির্ময় পথে আসছিল ওনীল আর জলা—দেখতে পেল, উজ্জ্বল কৃষ্ণ প্রস্তরের অপূর্ব তোরণদ্বার চন্দ্রদূতের সেই চোখের জ্যোতিতে। কী চমৎকার, কত অপরূপ এই তোরণ! জমাট আঁধার থেকে পাথর কেটে কেটে যেন তৈরী করেছে স্তম্ভশ্রেণী, খোদাই করেছে অনুপম শিল্পমূর্ত্তি তার গায়ে – মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে আছে উজ্জ্বলা।

– এসো মা, দূত আহ্বান করলেন – এই কৃষ্ণতোরণ শুক্লপক্ষের কলায় কলায় যখন জ্যোস্নামময় হয়ে ওঠে, তখন আরো সুন্দর, আরও বিচিত্র হয়। পরে দেখতে পাবে ; এসো!

ওরা প্রায় তোরণের কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ 'গম্ গম্ গম্ গম্' একটা

অশ্রুত সুর-ঝঙ্কার কানে এল—কিন্তু ঝঙ্কার নীচের পৃথিবী থেকে আসছে। —কিসের এ শব্দ! উজ্জ্বলা প্রশ্ন করলো চন্দ্রদূতকে। দূত বললেন—

—প্রণব নাদ মা, বিশ্বের বীণাযন্ত্রের ওঙ্কার ধ্বনি! পৃথিবীবাসী সাধনা না করলে এ ধ্বনি শুনতে পায়না। উর্দ্ধলোকে এ ধ্বনি আরো সুন্দর, আরো মধুর!

দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছা করছে উজ্জ্বলার, কিন্তু দূত বললেন—এসো, ভিতরে এসো। আরো দুজন চন্দ্রদূত কয়েকটা আত্মাকে নিয়ে আসছেন, দেখতে পেয়ে ইনি তোরণপথে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বলা শুধুলো—আপনার মত আরো দূত আছেন নাকি?

—অনেক, অসংখ্য। বিভিন্ন শ্রেণীর আত্মার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর দূত আছেন, এসো।

অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বিশাল তোরণদ্বার উদঘাটিত হয়ে গেল। উজ্জ্বলা দেখলো, শুক্লাপ্রতিপদের স্নিগ্ধ কিরণে চন্দ্রলোক উদ্ভাসিত। সে কিরণ এমন কোমল আর শীতল যে উজ্জ্বলার মনে হচ্ছিল, সারা গায়ে মেখে নেবে। চন্দ্রদেবের প্রথম কলাটি যেন কৃষ্ণ কেশাবৃত যোগীর কোমল ললাট-ফলকের মত শোভা পাচ্ছিল—উজ্জ্বলা অভিভূত হয়ে নমস্কার করলো।

চন্দ্রদূত ওদের নিয়ে এলেন। উজ্জ্বলার দেহ যেন নরম পালক-মেঘে গড়া, এতো হাল্কা হয়ে গেছে আর বাতাসও খুব হাল্কা এখানকার। প্রথম অবশ্য নিশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছিল উজ্জ্বলার কিন্তু এখন খুব আরাম লাগলো। ওঃ! পৃথিবীতে রোগের কবলে পড়ে কতদিন যে সে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারেনি! বুকখানা যেন উইধরা কাঠের মত জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আজ সেসব কিছুই নাই, একদম সেরে গেছে উজ্জ্বলা—আর চমৎকার সুন্দর হয়েছে ও। কী সুন্দর স্বাস্থ্য! উজ্জ্বলা নিজের দেহটার

দিকে চেয়েই ভাবলো, এখন যদি সমীরন তার কাছে আসে, উজ্জ্বলা তার মাথাটি কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। তাড়িয়ে দেবেনা।

চন্দ্রদূত হঠাৎ হেসে উঠ্‌লেন। সলজ্জে উজ্জ্বলা ভাবলো, দূত ওর মনের কথা জানতে পারছেন নাকি? কিন্তু দূত কিছু বললেন না; মুখখানা আবার বিমর্ষ হয়ে গেল তাঁর।

চন্দ্রলোকের অপরূপ সৌন্দর্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মুগ্ধ হচ্ছে উজ্জ্বলা। চন্দ্রদেবের কলায় কলায় নবরূপ ধারণ করে এখানকার স্থাবর জঙ্গম। পৃথিবীর মত সবই আছে, কিন্তু সবই যেন জলায় বাষ্পে গড়া, শীতল, উষ্ণ, অত্যুষ্ণ, ধূসর, কৃষ্ণ, শ্বেতাভ, স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময় কত রকমের কত দেখা অদেখা প্রাণী, কত সুন্দর ফুল, ফল, অরণ্য পর্ব্বত, নদী, উজ্জ্বলা দেখে আর বিস্ময়ে হতবাক হয়। একটি প্রশস্ত গিরিপথ লঘু মেঘস্তর দিয়ে গড়া, তারই এক পাশে যেন শ্বেত মর্মর দিয়ে গড়া একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর; চন্দ্রলোকের স্বচ্ছ তৃণদলে তার আবরণ ছাওয়া—জ্যোস্না সেই আবরণ ভেদ করে উজ্জ্বলার ঘুমন্ত মুখে স্নেহ-চুম্বন আঁকে—মুক্তার মত শিশিরবিন্দু সেই আবরণের উপর গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল হয়ে দোল খায়; কত রঙ তাদের সেই ছোট ছোট অঙ্গে। উজ্জ্বলার ইচ্ছা করে, তুলে নিয়ে মালা গেঁথে পরবে। কিন্তু সাহস পায়না। মা এইখানে ওকে পৌঁছে দিয়েই কোথায় যে গেছেন, বলে যান নি। আর সেই ওনীল – তাকে যে কোথায় রেখেছে, উজ্জ্বলা জানেনা, হয় তো এই পাহাড়ের অন্য প্রান্তে কিম্বা ঐ দূরের সহরে। কিন্তু তার কথা ভাববার দরকার নেই উজ্জ্বলার।

ওর একটি পরিচারিকা আছে; ছোট একটি মেয়ে, কিন্তু সেবা করে চমৎকার। দেখতে মেয়েটি তত সুন্দর নয়, কিন্তু ভাল রাঁধতে পারে।

আর গাইতে পারে নানান রকম ছড়াগান। উজ্জলা পৃথিবীতে যেসব গান গেয়ে ব্রত করতো, সেই পুণ্যিপুকুর, দশপুত্তুলের গান বেশ গায় মেয়েটি। উজ্জলা আজ তাকে ডেকে শুধুলো—তুই পৃথিবীর এই সব গান শিখেছিলি কোথায় লো কণিকা ?

—কেন ? পৃথিবীতেই। তোমার মনে পড়েনা ? তোমার যখন সাত আট বছর বয়স তখন আমি আমার বাবার সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে থাকতাম ! তুমি ব্রত করতে, আমি শুনতাম ; আমার তখন পাঁচ বছর বয়েস, মনে নাই ?

—না। কে তোর বাবা ? আমাদের বাড়ীতে থাকতো ?

—হ্যাঁগো দিদিমণি ! আমার বাবা বৈকুণ্ঠ যে ! আমি সেই যে গো, সেবার নিউমোনিয়ায় মারা গেলাম। বেশী দিন তো নয়, বছর পনর !

—তারপর থেকে এখানেই আছিস তুই ?

—না ; মাঝে মাঝে বাবাকে দেখতে যেতাম আর তোমাকেও। একদিন হোল কি জানো—পথ হারিয়ে ব্যস ! গিয়ে পড়লাম একেবারে "বোধ" নরকে ! উঃ, সে কি ভয়ানক জায়গায় গো—দিদিমণি ! চারিদিকে শুধুই বড় বড় কাঁটায় বেড়া, সে কাঁটার বিষ আছে, জানো, গায়ে ফুটলে এমন জ্বালা করে যে বিছের কামড় তার কাছে কিচ্ছু নয়। আর অন্ধকার, কিছু দেখতে পাইনা ; কোনো লোকের দেখাও পাইনা ! ভয়ে দিদিমণি কাঁদতে লাগলাম,—বাবা ও বাবা ! কোথায় আছ বাবা, আমাকে তুলে নিয়ে যা'ও। কতক্ষণ যে কেঁদেছিলাম দিদিমণি, কে জানে, রাত না দিন তাও জানিনা !

—তারপর ? কি করে বেরুলি ? উজ্জলা ভয়ে ভয়ে শুধুলো !

—উঃ ! তারপর বাবার কথা, বাবার ঠাকুর জগন্নাথের কথা মনে পড়তে লাগলো। তোমার কথা মনে হলো, তোমার মা'র কথা মনে হলো,

অমনি জানো দিদিমণি, একটা সুন্দর আলো নেমে এলো আমার কাছে ; দেখলাম, তোমার মা,আমি ও তাঁকে মা বলতাম কিনা—এসে বললেন,আয় কণা, এমন করে একা কেন আসিস পৃথিবীতে ? পৃথিবীর আকর্ষণ আবার তোকে টেনে নিয়ে যাবে।

—এটা কোন জায়গা ? শুধুলাম আমি, তিনি বললেন 'এর নাম "রোধ নরক", ওর পরেই শূকর নরক আছে। তারপর তাল, তপ্ততাল আরো কত কি।' ভয়ে তো আমি কাঁপতে লাগলাম দিদিমণি ! কিন্তু মা আমাকে কোলে নিয়ে এখানে চলে এলেন। বললেন, 'আর যাসনে তোর বাবার কাছে। ও পূজাআহ্নিক নিয়ে বেশ আছে।' তারপর থেকে আর যাইনি।

- সে আজ কতদিন ? উজ্জ্বলার দারুণ ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে, সেও যদি কোন দিন পথ হারিয়ে ফেলে ! কণিকা বললো—কতদিন কে জানে। এসো দিদিমণি, তোমাকে আজ আবার দরবারে নিয়ে যেতে হবে ; সাজিয়ে দিই। এখানে দিনরাত্রির হিসাব রাখা খুব কঠিন দিদিমণি।

কণিকা ওর পোষাক বদলে দিতে লাগলো। কিন্তু উজ্জ্বলা সভয়ে শুধুলো—দরবারে কেন লো ? সেখানে আমাকে কি দরকার ?

—ওমা, দরকার নেই ? এখানে তোমাকে রাখবে, নাকি আর কোথাও পাঠাবে, সে সব হিসাব করবে না ওরা ?—কণিকা ওর শাড়ী জামা বদলে দিল।

উজ্জ্বলা দেখলো, তার শরীরটা শুভ্র জ্যোস্নার মত আর পরণের শাড়ীখানা নীলাভ ছায়ার মত। মাথার চুল, চোখের কালো তারা, ঠোঁটের লালিমাটুকুতে ওর মুখখানা ঠিক একটি ফুলের মত দেখাচ্ছে ! এক খণ্ড স্ফটিক-মুকুরে নিজেকে দেখতে দেখতে উজ্জ্বলার মনে হোল, আহা ! কি সুন্দর সে সেজেছে আজ ! সমীরন যদি এই বেশে তাকে

একবার দেখ্‌তো ! বড় সাধ জাগছে ওর মনে সমীরনের কাছে যাবার জন্যে। কিন্তু কণিকা তাগাদা দিয়ে বললো—চলো দিদিমণি, সময় হোল !

কোথায় যেতে হবে, কি কথা বলতে হবে, কিছুই জানেনা উজ্জ্বলা ! মা থাকলে অনেক সুবিধা হত, কিম্বা সেই চন্দ্রদূত। ভয়ে ভয়ে উজ্জ্বলা এগিয়ে যেতে লাগলো। সুমুখে দেখলো, বিশাল মণ্ডপ, কত সুন্দর সুন্দর স্ত্রী আর পুরুষের জ্যোত্স্নাময় দেব-দেহ সেই মণ্ডপে বসে। অপরূপ উজ্জ্বল সিংহাসনে দশমীর চন্দ্রদেব উপবিষ্ট। চির-তরুণ সেই দেবকান্তি দেখে উজ্জ্বলা ভুলে গেল সে কোথায় এসেছে, কেন এসেছে। প্রণাম করতেও ভুলে গেল জলা। পদ্মরাগ মণির মতন তাঁর চোখ দুইটিতে সুস্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু রক্ত-শুক্তির মতন ঠোঁটে অব্যক্ত কঠোরতা। পূর্ব্বের সেই চন্দ্রদূত আহ্বান করলেন—এসো জলা, প্রণাম করো !

নতজানু হয়ে প্রণাম করলো উজ্জ্বলা। চন্দ্রদেব ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন,—পৃথিবীতে প্রেমের সাধনা করেছ তুমি জলা, তোমার সল্প-পরিসর পার্থিব জীবনে কোন পাপ স্পর্শ করা উচিত ছিলনা, কিন্তু তুমি আত্ম-হত্যার চেষ্টা করেছিলে।

—হ্যাঁ প্রভু ! জলা সভয়ে স্বীকার করলো—কিন্তু আমি তো করতে পারিনি আত্মহত্যা…।

—না, তোমাকে রক্ষা করেছিলেন গ্রহপতি সূর্য্যদেব। মেনকার মধ্যে তাঁর অপার করুণা প্রজ্বলিত হয়েছিল তোমার জন্যে ; মেনকা সূর্য্যো-পাসিকা। কিন্তু তার পরও তুমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করনি। প্রেমের সাধনায় তিলে তিলে দেহটাকে ক্ষয় করেছ—মনকে বিশুদ্ধ করেছ, তোমার প্রেম পার্থিব প্রেমকে ছাড়িয়ে উচ্চতর স্তরে উঠেছে। কিন্তু পৃথিবীর দেহকে তুমি অভুক্ত রেখেছ,—পিপাসিত রেখেছ,অথচ দেহাভিমান তোমার ছিল—এখনো আছে ; তাই তোমাকে উর্দ্ধতর লোকে পাঠাতে

পারলাম না—। জ্যোতির্দেহ নিয়ে স্বর্লোক পর্য্যন্ত যেতে পারবে ; সাবধান, পৃথিবীর আকর্ষণে পড়লে আবার তোমায় জন্ম নিতে হবে, দেহের ক্ষুধা মেটাতে হবে গিয়ে।

সমস্ত সভা গম গম করছে চন্দ্রদেবের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে। উজ্জলা প্রণাম করে বললো—যথা আজ্ঞা দেব, আদেশ শিরোধার্য্য, - কিন্তু আমি কি পৃথিবিতে আর যেতেই পারবো না ? আমার আকর্ষণ এখনো রয়েছে—আমার সমীরনের জন্যে।

হ্যাঁ, যেতে পারো, ঐ আকর্ষণই তোমায় উচ্চতর প্রেমানুভূতি-ভূমিতে নিয়ে যাবে, যেখানে দেহ নাই, কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ নাই,—সে প্রেমে দানেই আনন্দ, পূজাতেই পরিতৃপ্তি ; তারপর আরো আরো উচ্চতর উচ্চতম প্রেম, সে প্রেম ঈশ্বরের বিভূতি, চিদানন্দময়ের আনন্দ-স্বরূপ। আশীর্ব্বাদ করি বৎসে, তোমার বহু জন্মের কর্ম্মফল ক্ষয় হোক, স্বর্গভোগ তুচ্ছ করে তুমি মহান ঈশ্বরের প্রেমে আকৃষ্ট হও। উজ্জলা আবার প্রণাম করলো।

এর পরই সেই যুবকটি, ওনীল এসে দাঁড়ালো। চন্দ্রদেব কঠোর স্বরে বললেন—তোমাকে অনেক সুযোগ দিয়েছিলাম কবি, সবই ব্যর্থ করলে। কবি তুমি, সুদূর ব্যোমচারী বরুণের (নেপচুন) প্রজা—। তুমি কিনা পড়লে মঙ্গলের একটা তুচ্ছ প্রজার প্রভাবে ! কিন্তু তোমার কর্ম্মফল কবি, তোমাকে আবার যেতে হবে ঐ মর্ত্ত্যলোকেই।

—যেতে অপত্তি নাই মিঃ লর্ড, মর্ত্ত্যলোক আমার কিছুই খারাপ লাগেনা ; কিন্তু আমার কর্ম্মের জন্য আমাকে দায়ী করছেন কেন—? আমাকে দিয়ে সে-সব করানো হয়েছে।

চন্দ্রদেব বিদ্রূপের হাসি হাসলেন ; গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"করানো হয়েছে', একথা আজ তো বেশ ভাবতে পারছো কবি ! ওখানে থাকতে

তুমি যে ভাবতে, সবই তোমার ইচ্ছামত করছো, তোমার অহং যে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল কবি !

—আমার সে ইচ্ছা কে নিয়ন্ত্রিত করতেন মাই লর্ড ?—কবি প্রশ্ন করলো।

—করুণাময় ঈশ্বর প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে এক কণা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, সেই ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করে মন, আর তার দ্বারা চালিত হয় পঞ্চ মহাভূত—অহংঙ্কার, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয়, বিষয় সমূহ—শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ, ঈর্ষা, দ্বেষ সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা আর ধৃতি। দাম্ভিক কবি, তোমার আত্মার মধ্যে বিবেকরূপী যে সূক্ষ্ম চৈতন্য তখন বারংবার সাবধান করেছিলেন, তখন তো তাঁর কথা শোনোনি ! আজ বলছো—তুমি কর নাই—। সেদিন যদি বলতে, "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি," কায়-মন-বাক্যে যদি আচরণ করতে ঐ মহা উপদেশের, তাহলে আজ মানাতো তোমার একথা বলা।*

কবি ওনীল কিছুক্ষণ চুপকরে রইল, তারপর করজোড়ে বললো, —এসব আমায় কেউ শেখায় নি প্রভু ! আমাদের দেশে এসব কথা কেউ তো বলেনা !

—বলে, তবে কম। তোমাদের দেশটা পার্থিব ভোগের দেশ। ভোগের উপাদান সংগ্রহ করতেই ওদেশের লোকের সময় চলে যায়। তবে তোমার ওদেশের দুর্ভোগ ঘুচেছে কবি, এবার ভারতবর্ষে গিয়ে জন্ম নেবে, যে দেশে আকাশে বাতাসে ছাড়িয়ে আছে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের বাণী, কবিরের দোঁহা, মীরার ভজন, চণ্ডীদাসের গান, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়, এবার সেখানেই যাও ; কিন্তু

* ঈশরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ—ন্যায় দর্শন, চতুর্থ অধ্যায়।

জলে ডুবে তোমার অপমৃত্যু হয়েছে, কিছুদিন এই খানে থেকে নিরাশ্রয় নিরবলম্ব হয়ে পৃথিবীর মহাকাশে দোল খাও। তার পর উচ্চতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে ; অবশ্য তোমায় বেশী দিন থাকতে হবে না।

—কেন প্রভু ! পৃথিবী আমার বড় প্রিয় ভূমি ! শীগ্রি আসতে চাই না !

—তোমার বাসনাই তোমাকে আবার ঘোরাবে কবি, কিন্তু তুমি অতি নির্বোধ। পৃথিবীতে তোমাকে কেউ ভাল বাসেনি, তবু তুমি পৃথিবীকে এত ভাল বাসলে ! এই ভালবাসা যদি বাসনা কামনা বর্জিত হোত, তাহলে একজন্মেই বহু উর্দ্ধ লোকে চলে যেতে পারতে।

—আমি উর্দ্ধ লোকে যেতে চাই না প্রভু !

কবির কথায় চন্দ্রদেব ঈষৎ হাসলেন, কিন্তু আর কিছু বললেন না। আরো অনেক আত্মার বিচার এর পূর্ব্বেই হয়ে গেছে ; যে কয়েক হাজার বাকি আছে, তাদেরও ব্যবস্থা করতে লাগলেন চন্দ্রদেব। দলে দলে সব বিদেহী আত্মা আসতে লাগলো, আবার দলে দলে বেরিয়ে যেতে লাগলো। উজ্জ্বলা এক জায়গায় বসে দেখছিল—দশমীর চন্দ্রলোক পৃথিবীতে গিয়ে পড়েছে, আর সেই কোমল সুন্দর জ্যোৎস্নার কিরণধারা ধরে অগণ্য কোটি আত্মা নিম্নাভিমুখী। কে কোথায় পড়ছে কে জানে !

—এই সব আত্মারা কোথায় যাচ্ছে ? উজ্জ্বলা প্রশ্ন করলো পাশের একটী বয়স্কা নারীকে।

—যার যেমন কর্মফল, সেই যায়গায় যাবে, সেই রকম যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে।

—তাহলে যমের কথা যে শুনি, নরকের কথা যে শুনি, সে সব মিথ্যে ?

—না, যমের অধিকার পৃথিবীতেই। ভূর্লোক সাত ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগেই বিভিন্ন নরক আছে, তার মধ্যে সাতটি প্রধান, রৌরব, মহারৌরব, অতিশীত, নিকৃতন, অপ্রতিষ্ঠ, অসিপত্রবন, তপ্তকুম্ভ ; এ ছাড়া,

রোধ, শূকর, তাল, কুম্ভীপাক, কালসূত্র আদি অনন্ত ছোটখাট নরক আছে। যম মৃত্যুর কর্ত্তা। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর হাতেই পার্থিব দেহের বিনাশের ভার দিয়ে রেখেছেন। মৃত্যুর পর যে সব আত্মা ভূস্তর ছাড়িয়ে আসবার মত শক্তি পায় না অর্থাৎ নিম্নস্তরের অপবিত্র আত্মা, তারাই যমের অধিকারে থেকে পৃথিবীর নরকে পতিত হয়। কর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ করলে জীবাত্মাকে আর সেখানে যেতে হয় না। সরাসরি এখানে আসে। আবার যমের নরকে শাস্তি ভোগ করেও জীব পুনরায় যখনি জন্মায়, এই চন্দ্রদেবের কিরণধারা অবলম্বন করেই তাকেই যেতে হয়। কেউ পড়ে বনস্পতিতে, কেউবা লতাগুল্মে, ওষধিতে, কেউ ধান্য যব যবশীষে, কারো বা ইতর জন্তুতে এমন কি মনুষ্য দেহেও পতন ঘটে,—কেউ কীট হয়, কৃমিকীট ভোক্তা প্রাণী হয়, কেউবা তাদের ভোক্ষণ করে জীবন ধারণ করে। জীবাবর্ত্ত এই ভাবেই চলছে।

—আজ যে কৃমি হয়ে জন্মালো কত জন্ম পরে সে মানুষ হয়ে জন্মাবে ?

—তার কি ঠিক আছে ? সেই জীবাত্মার কর্মের উপর নির্ভর করে সে ব্যাপার। তবে বহু লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়, চুরাশী লক্ষ, তবে মানুষ জন্ম।

উজ্জ্বলার কেমন যেন ভয় করছিল। সে যদি আবার কৃমিকীট বা ঐ রকম কিছু একটা হয়ে যায় ! কিন্তু না, চন্দ্রদেব তাকে জ্যোতির্লোকে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। সে আর কৃমি হবেনা। অনেক জন্ম তো ঘুরেছে সে, মনে পড়তে লাগলো উজ্জ্বলার, হাঁ নরকেও যেতে হয়েছিল কয়েকবার। উঃ—কী ভয়ঙ্কর কষ্ট—কিন্তু না, মনে পড়ছে না ঠিক ঠিক।

উজ্জ্বলা দেখলো, চন্দ্রদেব সভা ভঙ্গের আদেশ দিয়েছেন, আর তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। উজ্জ্বলার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই বললেন,

—দেহ রক্ষার চেষ্টা তুমি করোনি জলা,—তাই নরকের স্মৃতিতে কষ্ট পাচ্ছ। যাও, চন্দ্রলোকে আরও দিন কতক থাকতে হবে তোমায়।

উনি অদৃশ্য হলেন। উজ্জলা দেখলো, উর্দ্ধগগনে প্রদীপ্ত ভাস্করের মহিমময় মূর্ত্তি প্রকাশিত হচ্ছে; পৃথিবীতে নূতন দিন সুরু হোল আবার। পৃথিবীর হিসাবে আজ তার মানবদেহের মৃত্যুর একাদশ দিন। কে জানে, কে কি করছে ওখানে? কেমন আছে সনাতন, কেমন আছে বাড়ীর আর সব? মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর।

—চল দিদিমণি, বাড়ী যাই—কণা বললো। উজ্জলার এখানে কোন কাজ নাই, বললো—

—চল, কিন্তু কণা—এখানে ভিঁড়ের মধ্যে একজনকে দেখলাম, যেন চেনা চেনা মনে হোল!

—হুঁ, আমিও দেখেছি, সেই যে গো চণ্ডাপুরের বাগাল কেওট, সেই যে মদন কেওটের বড় ছেলেটা, এসেছে হয়তো এখানে।

—গেল কোন দিকে দেখতো, যদি থাকে তো ডাক, দেখা করি।

—দেখি! বলে কণা সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকলো গিয়ে। উজ্জলা একাই আস্তে আস্তে বাড়ীর পথে হাঁটছে; দুপাশে কত রকমের ফুল ফুটে আছে, কত অদেখা অদ্ভুৎ লতাগুল্ম, মাঝে মাঝে জোস্না-জমানো সুন্দর মূর্ত্তি; ভারি সুন্দর লাগছিল কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলবার ভয়ে ও বেশীদূর একা না এসে একটা ছোট পুকুরের বাঁধানো ঘাটে দাঁড়ালো। পুকুরটার জল অদ্ভুত রকমের। গলিত স্ফটিক যেন টল মল করছে বিরাট একটা পাত্রে, আর তার মধ্যে নানান রকম জলচর পাখী সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কারো রূপালী রং, কারো সোণালী, কারো আবার কোন রংই নাই, যেন স্বচ্ছ কাচ! কিন্তু রোদ লেগে হাজার রকম রং তার ডানায় খেলা করছে। জলের ভিতর মুক্তার মত রংএর মাছ, শাঁখ রংএর

মাছ, চন্দ্রকান্তমণির মত মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। বেশ দেখা যাচ্ছে উপর থেকেই। সুন্দর পুকুর, লঘু মেঘের মত নরম সিঁড়ি দিয়ে ঘাট বাঁধানো। উজ্জলার খানিক বসতে ইচ্ছা করলো এই খানে। জলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তার অঙ্গের প্রতিবিম্ব পড়লো স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলে, নিজেকে দেখে উজ্জলা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠলো ; তার চেহারা আরো সুন্দর হোয়েছে, আরো সুন্দর পোষাক পরেছে সে ! কিন্তু পোষাক পরলো কখন ? উজ্জলা একটু ভেবে দেখ্‌তেই বুঝতে পারলো, ঐ রবিদেবের আলোক ধারায় এখানকার সব জিনিষের রূপ বদলায়।

—মিস্ জলা ! কে যেন ডাকলো উজ্জলাকে। তাকিয়ে দেখে, সেই ওনীল সাহেব।

—কি ? খবর কি কবি ? উজ্জলা হেসেই বললো ওকে। দেখলো কবি বেশ ভাল পোষাক পরে এসেছে। বাংলা দেশের কবিদের মত কালো কোঁকড়া চুল, পীতাভ দেহে নীলাভ ধুতি-পাঞ্জাবী আর ফিকে গেরুয়া চাদর। হাতে একগোছা ফুল। উজ্জলার দিকে এগিয়ে দিয়ে

—সে-দিনের সমুদ্র ফেন নয়, চন্দ্রলোকের ফুল, গ্রহণ কর মিস্...

—দাও বলে উজ্জলা হেসেই নিল ফুলের গোছাটি, নিয়েই দেখলো, ওতে একটি কবিতা লেখা রয়েছে ; অতি পাতলা চাঁদের আলোর কাগজ, তাতে আঁধারের কালিতে লেখা—

মানুষের দেহ সব দেহ থেকে বড়,
সব লোক থেকে বড় মানুষের লোক,
সেথানে যে আছে পীরিতির নির্ঝর,
থাকুক না কেন জরা, মৃত্যু ও শোক !

প্রেমের বাঁধনে বাঁধি নর-দেবতারে
মরলোকে যাঁরা পাতেন সিংহাসন,
ঊর্দ্ধ লোকের অধিদেবতার দ্বারে
তাঁহাদেরই কথা করিছে গুঞ্জরণ ;
তুচ্ছ নহে এ মর্ত্ত্য-মানব-দেহ
ভোগে ও ত্যাগে যা পূর্ণ করিতে পারি,—
অনন্তকাল ফিরিব না মোরা কেহ
এই অভিলাষ সেই পরমাত্মারই।

—এসব কোথায় শিখলে কবি ?—উজ্জলা হেসে কাগজটুকু আলতো আঙুলে ধরে আছে, হঠাৎ শির শির করে একটা হাওয়ার ঠাণ্ডা ঝটকা এসে তার হাত থেকে কাগজটুকু উড়িয়ে নিয়ে ফেললো পুকুরের মাঝে জলে।

—আহাহা ! শেষ হয়নি কবিতাটি এখনো - কি করলে দেবি !

উজ্জলা সত্যি অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বেচারা কবির জন্য দুঃখ হোল ওর, বললো—

—হঠাৎ উড়িয়ে দিল বাতাসে ! কিন্তু আমি তো পড়েছি কবি ! দুঃখ কেন তোমার ?

—পড়েছ ? তাও ভাল, কিন্তু শেষ হয়নি, আরো লিখতাম।

—না, আর লিখে কাজ নাই।—তোমাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে কবি, ভাবছো কেন ?

—যাব, যাবার লেগে মন আমার কাঁদছে। এখানে একটুও ভাল লাগছে না আমার। আচ্ছা জলা, তুমি বলতে পার, মানুষ এখানে কি করে বাঁচে ! হাওয়ার থেকে হালকা শরীর, খাবার তো প্রায় দরকারই হয় না। কোন রকম নেশার জিনিষ নাই, নাচ নাই—গান নাই, নাই

স্লটো পার্টি পিকনিক্‌এগিয়ে দুজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করার জায়গা, একটা বলড্যান্স, এক পেগ হুইস্কি ··!

—থামো কবি ; বুঝেছি, এখানে সবই আছে, তবে তোমার মনোমত কিছু নেই। স্থূল দেহের স্থূল ভোগ-বাসনা তোমার মেটেনি—দেহের ওজন কমার জন্যেও তুমি ক্ষুণ্ণ। কিন্তু এ-লোকের অধিদেবতা—চন্দ্রদেব সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে আত্মার আধ্যাত্মিক···

—থামো জলা, প্লিজ থামো, তোমার 'সারমন' শোনার লেগে আসিনি এখানে। 'সারমন' আজ কদিন থেকেই শোনাচ্ছে আমাকে একজন পাদ্রী ; বিরক্তিতে মন ভরে উঠেছে আমার, তাই পালিয়ে এসেছি। চল, তোমার ঘরটা দেখে আসি, দু'এক পেগ দিতে পারবে ?

—কোথায় পাব আমি ?

—বাঃ এই যে বললে এখানেও সব আছে ! লক্ষ্মী জলা, মাই গুড্ গার্ল, এক পেগ . আজ দশ দিন খাইনি ; আর না খেলে কবিতা মোটে লিখতে পারিনে।

—লিখোনা !

—ব্যস ! তুমিও এই কথা বললে ! আশ্চর্য্য ! আমি ভেবেছিলাম, হেলেন কবিতা বোঝেনা, কিন্তু তুমি ঠিক বুঝবে। নাঃ—মেয়ে জাতটাই বোঝেনা কবিতা।

ওনীল মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে তাকিয়ে ; উজ্জ্বলার হাসি পাচ্ছিল, সামলে বললো—হেলেন কে ? সেই নার্স মেয়েটি ?

—এই ! 'জেলাসি' এসে গেল নাকি তোমার ? এদিকে মেয়েদের বুদ্ধি খুব খেলে যাহোক !

—না কবি, আমি কেন 'জেলাস' হতে যাবো ! বরং তোমার সেই হেলেনকে বলে আসবো, যাতে সে তোমার কবিতা বুঝতে চেষ্টা করে !

—ও বুঝবে না। ও চায় কি জানো? খুব অশ্লীল অশ্রাব্য ছড়া হলে ওর খুব ভাল লাগে। একটা ডাক্তারের সঙ্গে ওর খুব ভাব, জানো, ডাক্তারটা ওকে ঐসব কুৎসিৎ কথা শেখাচ্ছে; একদম খারাপ করে দিল মেয়েটাকে।

—ডাক্তারের উপর খুব রাগ হয় তোমার? না?

—না, রাগতে পারি কৈ? হেলেন ওকে বড্ড ভাল বাসে। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঐ ডাক্তারটা ভীষণ শয়তান, হেলেনকে ও বিয়ে করবে না, ওর সর্ব্বনাশ করে পালিয়ে যাবে—হেলেনের লেগে বড্ড ভাবনা হয় আমার।

—হেলেন আবার আরেকটা ডাক্তার ধরবে! তোমাদের তো সে নিয়ম আছে।

—না জলা, ও বুঝুক, আমি ওকে ভাল বাসি; ওকে বোঝাতেই হবে আমার। কিন্তু উঃ! এক ফোঁটা মদ না খেলে কিছুই ভাবতে পারছিনা!

কণা এসে পড়লো, বললো,—দিদিমণি, সেই বাগাল কেওট আবার পৃথিবীতে জন্মাতে গেছে। ওর মা এমন কাঁদতে লেগেছে, আর মা-মনসার কাছে মাথা কুটছে যে সেই টানেই ও এখানে থর থর করে কাঁপছিল, বলছিল "ছেড়ে দাও আমি যাই, ছেড়ে দাও আমি যাই", এখানকার লোকেরা তাই ওকে ছেড়ে দিলেন। দিন পঁচিশেক আগে ও সর্দ্দির অসুখে মরেছিল।

—ওঃ! দেখা হলে গাঁয়ের খবরটা নিতাম।—উজ্জ্বলা বাড়ীর পথ ধরলো। ওনীলও সঙ্গে আসছে, কণা বললো – তুমি কোথা যাবে গো বাবু?

—ওঁর বাড়ী—বলে ওনীল আঙ্গুল বাড়িয়ে উজ্জ্বলাকে দেখিয়ে দিল।

কণা কিছু বললো না, কারণ উজ্জ্বলার সঙ্গে এই বাবুটির কি সম্পর্ক, সে জানেনা।

—আমার ওখানে কিন্তু মদ নেই,—উজ্জ্বলা বললো।

—না থাক, তুমি তো আছো।—'এ থিং অব বিউটি' ...

উজ্জ্বলা এমন ভাবে চাইল কবির পানে যে বাকি লাইনটা কবি বলতে পারলো না। উজ্জ্বলার সত্যি রাগ হ'চ্ছিল। পাশ্চাত্য দেশের এই রকম কথায় কথায় রূপের প্রশংসা আর প্রেমের ন্যাকামি শুনতে ও অভ্যস্থ নয়। ধমকের সুরে বললো - এটা বিলাত নয়, শিঙাপুরও নয়, বুঝলে কবি? আর আমি তোমার হেলেনও নই, ভদ্রভাবে কথা কইতে না পার তো কয়োনা!

—কিছু তো আমি অন্যায় বলিনি—কি এমন অন্যায় বললাম! ও! প্লিজ এক্সকিউজ মি... ..

—আচ্ছা, ক্ষমা করলাম এবার। তোমার দেহের টান বড্ড বেশী রয়েছে কবি। দেহখানা হয়তো সাগরের জলে পচে গলে যাচ্ছে। না হয় কুমীরে খাচ্ছে। তবু তোমার দেহের টান গেল না? শোনো, আবার জন্মালে আবার মরতে হবে, তারপর আবার জন্মাবে! এমন কতবার জন্মাবে! তার চেয়ে......

—নো সারমন, প্লিজ!

—হ্যাঁ, সারমনই শুনতে হবে। আকাঙ্খার বিনাশ না হলে, কর্ম্মক্ষয় না হলে অনন্ত কোটি জন্মেও শ্রেয় লাভ হবে না; এমন কি, ইতর যোনিতেও জন্মাতে পার।*

—বেশ, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমার উত্তেজিত মুখখানা কি চমৎকার দেখাচ্ছে জলা! টকটকে টার্কিশ রোজের মত! চল না জলা, এখানে একটু বসি।

—না, আমায় কে যেন ডাকছে মনে হচ্ছে। বলেই জলা মুখ ফিরিয়ে

* ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ
সতিমূলে তদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগাঃ—পাতঞ্জল যোগদর্শন

আপন পথে চলতে লাগলো। অনেক খানি এসে পিছন ফিরে দেখলো, একটা উজ্জ্বল লোহিত নদীর মত ধারা তার আর কবির মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে, কবি সেটা পেরোবার চেষ্টা করছে, আর হাবুডুবু খাচ্ছে সেখানে। উজ্জ্বলা কণাকে শুধুলো,

—ওখানে নদীটা কখন হোল রে কণা ?

—নদী নয়, মঙ্গল দেবের প্রভারশ্মি। ঐ কবির উপর মঙ্গলের অশুভ দৃষ্টি রয়েছে।

অনেক দিন থেকে কণা আছে এখানে, তাই ও অনেক বিষয় জানে, যা উজ্জ্বলা এখনো জানতে পারেনি। চাঁদের দেশটা ঘুরে ঘুরে উজ্জ্বলা দেখবে একবার। কিন্তু কে যেন ডাক্‌ছে, অদ্ভুত আকর্ষণ! অননুভূত একটা অনুভাব জাগছে ওর মনে! এমনটা ওর কোন দিন এর আগে হয় নি। কণাকে শুধুলো—আমায় কে যেন টানছে কণা ?

—টানবেই তো, আজ তোমার শ্রাদ্ধের দিন যে, সেখানে সবাই ভাবছে তোমার কথা।

—যেতে হবে নাকি আমায় ?

—হ্যাঁ দিদিমণি, ও-টানে না গিয়ে উপায় নেই। পৃথিবীর শরীরটা ফেলে আসবার সময় তোমার যে আতিবাহিক দেহ হয়ে আছে, ওটা শ্রাদ্ধের পর ক্ষয়ে আরো সূক্ষ্ম হয়ে যাবে ; এই আমার চেয়েও হাল্কা হয়ে যাবে তুমি, তখন স্বর্লোকে যেতে পারবে।

উজ্জ্বলা ভাল করে কথাটা বুঝলো না ; আবার নাকি তাকে দেহ ত্যাগ করতে হবে! কিন্তু কণিকা তার মনের কথা যেন জানতে পেরেই বললো—ভয় কি দিদিমণি, এরকম সবারই হয়। পৃথিবীতে মরবার সময় মানুষের তিন রকম সংস্কার থাকে, সঞ্চিত, ক্রিয়মান আর প্রারব্ধ। সেই সংস্কার অনুযায়ী আতিবাহিক দেহে প্রেত হয়ে কেউ নরকে যায়, কেউ

চন্দ্রলোকে আসে, কেউ বা প্রেত হয়েই কিছুকাল থাকে। তোমার আতিবাহিক দেহটা আজই নষ্ট হয়ে যাবে; তারপর চলে যাবে উপরের স্বর্গলোকে। কিছু কষ্ট নাই দিদিমণি!

উজ্জ্বলা আর কোন কথা বললো না। তাড়াতাড়ি তার নিজের ঘরে ফিরে দেখলো, উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার জননী। উজ্জ্বলাকে দেখেই সস্নেহে বললেন—এত কেন দেরী করলি মা, জলা? তোকে আজ পৃথিবীতে যেতে হবে।

—রাস্তায় সেই কবিটা দেরী করে দিল মা। চলো, যাই পৃথিবীতে। উজ্জ্বলার চোখ-মুখ আনন্দে হেসে উঠলো। পৃথিবীতে ওর প্রিয়তম সমীরন আছে, স্নেহের প্রণব আছে, ঘর বাড়া, গ্রাম, চণ্ডীতলা, মনসাতলা, হাজার খেলার জায়গার হাজার স্মৃতি। দুঃখ-বেদনা, সুখ সম্পদের সেই শ্যামল নীড় আজ কদিন ছেড়ে এসেছে উজ্জ্বলা, আজ আবার ফিরে যাবে সেখানে, তাই খুবই আনন্দ হচ্ছে ওর। মার গলা জড়িয়ে বললো, —তুমিও তো যাবে মা সঙ্গে?

—হ্যাঁ, তোকে একা ছাড়তে সাহস হচ্ছে না মা, ও বড় খারাপ জায়গা; ওখানকার কামনা বাসনায় বড্ড তমোগুণ, লোহাকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে। নে, কাপড় ছাড়।

কিন্তু কাপড় কোথায়? উজ্জ্বলা নিজের অঙ্গের পানে চেয়েই মা'র পানে চাইল। আহা, মা কি সুন্দর হয়েছেন আজ! খনি থেকে তোলা কাঁচা সোনার ফাগ-গুঁড়ো দিয়ে গড়া যেন তাঁর শরীর, পরণে প্রদীপের আলোর মত রংএর শাড়ী, আর চোখদুটি মা'র, পৃথিবীর কোন বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা খুঁজে পেলনা উজ্জ্বলা, তবে কবির ভাষায় বলা যায়, স্নেহ-প্রেম দয়া-মায়ায় পরিপূর্ণ দুটি জীবন্ত শতদল! উজ্জ্বলা বললো, —তোমাকে কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে মা, যেন মা দুর্গা!

মা দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন উদ্দেশে ; বললেন, না মা, ওসব বলতে নেই। আমি মা দুর্গার দাসীর দাসী হবারও যোগ্যা নই। মা দুর্গা আমদের এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী : এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা সমন্বিত আমাদের বিশাল এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছায় সচল, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই একদিন তাঁতে সংবৃত হয়ে যাবে ; তিনি মহা-প্রকৃতি ! আয়, পোষাক বদলে দি ; বলে মা উজ্জ্বলাকে কাছে টেনে নিলেন। তারপর কণাকে বললেন,

—তুই থাক কণা, তোকে আর যেতে হবে না। আমি তোর বাবাকে দেখে আসবো।

কণা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। মা উজ্জ্বলাকে কি যে পরালেন, উজ্জ্বলা বুঝতে পারলো না, কিন্তু অনুভব করলো, চন্দ্রের একটি রশ্মি ওর গায়ে পড়ছে আর ওর শরীরটা ভারী হয়ে উঠছে। মা'র হাত ধরেই উজ্জ্বলা নামতে লাগলো সেই রশ্মির পথ বেয়ে। যে পথে এসেছিল এটা সে পথ নয়, অন্য একটা পথ, একেবারে সোজা নেমে এসেছে পৃথিবীর একটা জায়গায়। খানিকটা এসেই উজ্জ্বলা দেখতে পেল, মহাকাশের একস্থানে চমৎকার বাগান, পুকুর, নদী, হ্রদ, নানান রকম না-দেখা পাখী গান করছে, মাঝে মাঝে মর্ম্মর পাথরের বেদী, তাতে বসে রয়েছে পৃথিবীর মানুষের মতই প্রায় দেখতে, লোক সব, কেউ বা কুশাসনে বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে স্তোত্র পাঠ করছে। মা উজ্জ্বলাকে এক জায়গায় আনলেন, উজ্জ্বলা দেখলো, তার বাবা দাঁড়িয়ে। প্রণাম করে উজ্জ্বলা বললো,

—তুমি কেন আমাকে দেখতে যাওনি বাবা ?

—আমি বড় লজ্জায় পড়েছি মা, তোর কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। আর এখন তুই যেখানে আছিস, সেখানে যাবায় আমার ক্ষমতা নেই, আমি পিতৃ লোকের অধিবাসী।

—মা'র সঙ্গে উপর দিকে যেতে পারনা তুমি বাবা ?

—না মা, আমার ঊর্দ্ধগতি এই পিতৃলোক পর্য্যন্ত। তোর মায়ের পুণ্যে তবু এতটা উঠেছি। নইলে হয়তো আরো নীচে ঐ প্রেতলোকে কিম্বা নরকলোকে থাকতে হোত।

বলেই বাবা অতিশয় বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। মা বললেন—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, ভয় কি? করুণাময় পরমেশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন।

উজ্জ্বলা আগেই শুনেছিল মার কাছে, তার বাবা নিজের অসৎ কজের জন্য অনুতাপ করছেন। বাবার জন্য উজ্জ্বলাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো। তারপর মার হাত ধরে বললো,—চলো মা, বাবা কি যাবেন না?

—আমি পরে যাব মা, তোরা যা, আমার বাবা যদি উপর থেকে আসেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি।

উজ্জ্বলা মার সঙ্গে আবার নামতে লাগলো। আরো খানিক আসতেই ওর দেহ আরো ভারী হয়ে উঠলো। এত ভারী যে ও বুঝি ধপাস করে পড়ে যাবে! পৃথিবী যেন আঁকষি দিয়ে টানছে ওকে। ভয়ে মা'র গলাটা ধরে ও ডাকলো—মা!

—ভয় কি! বল—

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমস্তুতে॥

উজ্জ্বলা সঙ্গে সঙ্গে বলে গেল, হাত যোড় করে প্রণাম করলো তাদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের বেদীর উদ্দেশে; স্মরণ করলো বিশ্বমাতার অশিব-নাশিনী মূর্ত্তি। চেয়ে দেখতে পেল উজ্জ্বলা, আকাশের একটা জায়গা, নানা জাতের গাছ, কাঁটা, ঝোপ জঙ্গল, কোথাও কুৎসিৎ কঙ্কাল, ভাঙা হাঁড়ি কলসী, মরা পশুর আধ-খাওয়া দেহ, গন্ধ বেরুচ্ছে। কয়েক জায়গায় গরম বালিতে বাষ্প উঠছে, আবার ভিজে মাটিতে কোথাও

বা বুদ্বুদ্ উঠছে। এমন বিশ্রী নোংরা জায়গা যে বলবার নয়। কিন্তু এই জায়গাতে লোক-তো কম নাই! সব লম্বা লম্বা, আধ বুড়ো. কেউ বা খুব বুড়ো মানুষ. কি জঘন্য তাদের চেহারা হয়ে গেছে! জরায় জীর্ণ, রোগে শীর্ণ, কেউ বা শুধু কঙ্কালের দেহ. কারো হাত পা নেই, কবন্ধ; উজ্জ্বলার ভয় করতে লাগলো,—এটা কোন জায়গা মা? শুধুলো।

—প্রেত লোক মা; পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষই পাপের ফলে এই প্রেত লোকে আসে, আর নয়তো আরো নীচে ঐ যে দেখছিস্, ঐ অন্ধকার যায়গাটা, ওখানে যায়; ওটা নরকলোক। ও বড় ভয়ঙ্কর জায়গা মা!

—আমাকে এখানে কেন আনলে মা? ভয় করছে আমার।

—আসতেই হবে মা, তুমি যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলে। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। নইলে ঐ নরকে যেতে হোত। ভয় নাই, ঈশ্বরকে ডাকো, আজই তোমার প্রেতত্ব শেষ হয়ে যাবে।

উজ্জ্বলা প্রাণপণে দুর্গামূর্ত্তিকে স্মরণে আনতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করতে পারছে না। ভীষণ ভয় ওকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বার-বার।

মা অভয় মন্ত্রে বললেন যেন,—নরকে যারা যায় মা, তাদের সামনে ভীষণ সব যমদূত দাঁড়িয়ে থাকে; ভয়ে মূর্চ্ছা যায় তারা, তোর কাছে তো আমি রয়েছি, ভয় কি?

—তুমিই আমার মা, আমার জননী, আমার মা দুর্গা! আমায় পার করে দাও মা! উজ্জ্বলা ব্যাকুল হয়ে মার পায়ে ধরলো,—তুমিই তো আমায় সৃষ্টি করেছ মা, আমায় রক্ষা কর!

—না মা, আমি তোমার এক জন্মের মা, কিন্তু বিশ্বমাতা তোমায় কত লক্ষ বার কত লক্ষ মা'র গর্ভে সৃষ্টি করেছেন। ওষধি-বনস্পতিতে

কৃমি-কীট-অণ্ডজ-স্তন্যপায়ীর উদরে, জরায়ুজ উচ্চতর যোনিতে কতবার কতরূপে তুমি জন্মেছ তাঁর অপার করুণায়, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্রী! প্রণাম কর মা। বল:—

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভারে
প্রপন্নঃ-প্রকামী, প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুরজ্জু প্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

শোনার সঙ্গে উজ্জ্বলার ভয় কেটে যাচ্ছে। নিজেই এবার বললো শ্লোকটি। হ্যাঁ, এতক্ষণে ওর মা দুর্গার মূর্ত্তি মনে পড়ছে। নির্ভয়ে বললো—চল মা, চলে যাই!

কয়েকটা কুৎসিৎ দর্শন প্রেত একটা কাঁটা ঝোপে উলটো দিকে পা করে দোল খাচ্ছিল। সবকটাই বুড়ো, কারো পরণে ছেড়া কানি, কেউ সাপের খোলস, না হয় মাছের আঁশ পরে আছে। দুই একজন একেবারে উলঙ্গ। কি যে ওদের হয়েছে, কে জানে।

—হারামজাদীর বেটি! ভাগ, নিকাল যাও হিঁয়াসে, বলে উজ্জ্বলাকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা। একজন একটুকরো কলসী ভাঙা ছুঁড়ে মারলো উজ্জ্বলার দিকে। গায়ে অবশ্য লাগলোনা কিন্তু যেতে যেতে মাকে প্রশ্ন করলো উজ্জ্বলা—ওরা অমন করে গাল দিচ্ছে কেন মা?

—ওরা ভগবানের নাম শুনতে পারে না মা। ওরা পাপের ফলে প্রেত হয়ে রয়েছে বহুদিন থেকে, ওরা জানেই না যে ওরা মরে গেছে। ওদের আত্মা এখনো মূর্চ্ছিত।

কথা বলতে বলতে মা উজ্জ্বলাকে নিয়ে দাঁড়ালেন এসে বাড়ীর সেই প্রকাণ্ড ফটকের সামনে। বিস্তর লোকজন চলাফেরা করছে এখানে। বেজায় হট্টগোল, আর ভিড়। সবাই হয়তো শ্রাদ্ধে ভোজ খেতে আসছে।

মা বললেন,—আয় মা, চণ্ডীমণ্ডপের ওদিকে খিড়কীর দরজায় যাই। এদিকে বড্ড গোলমাল আর মাগী-মাতালের আড্ডা।

উজ্জ্বলা আশ্চর্য্য হয়ে গেল ব্যাপার দেখে। মাত্র দশদিন সে মরেছে; এর মধ্যে তার শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন তো এরা করেইছে, মাগী-মাতালেরও ব্যবস্থা করে ফেলেছে! ছোটদা শৈবাল সবাইকে অভ্যর্থনা করে বসাচ্ছে ভেতরে। ছোটদার মনে এক বিন্দু দুঃখ আছে বলে মনে হলোনা উজ্জ্বলার। খিড়কীর দরজায় পৌঁছুতেই দেখ্‌তে পেলে, ত্রিশূল হাতে গেরুয়া বস্ত্রধারী একজন সৌম্য মূর্ত্তি প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মুখে তার সকরুণ হাসি, কিন্তু চোখে জল!

—প্রণাম কর উজ্জ্বলা! ইনি আমাদের বাস্তুপুরুষ, বলে মা নিজেও প্রণাম করলেন।

—কল্যাণ হোক বৎসে! জগতের অধিদেবতা তোমাদের মঙ্গল করুন। বলে তিনি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বলা ভিতরে ঢুকেই মা'কে শুধুলো—ওঁকে তো আমি কখনো দেখিনি মা!

—উনি আজ সাতপুরুষ এই বাস্তু রক্ষা করছেন। আর হয়তো থাকবেন না। এই বংশের দুষ্কৃত নরাধমদের কর্ম্মফল ওঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই কাঁদছেন। উনি উচ্চশ্রেণীর আত্মা মা, চতুর্থ পঞ্চম লোকে ওঁর অধিষ্ঠান ভূমি। তোর পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে এখানে এসেছিলেন। ওঁর দয়া না হলে ওঁকে দেখা যায় না।

উজ্জ্বলারা এসে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলো। বিস্তর লোক রয়েছে এখানেও আর রাশিকৃত জিনিষপত্র রয়েছে শ্রাদ্ধের জন্য। শ্রাদ্ধটা খুব ঘটা করেই করবে এরা। উজ্জ্বলার আনন্দ হচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, দাদা বৌদিরা তা হলে খুবই ভাল বাসে উজ্জ্বালাকে। কিন্তু মা বললেন, —বৃষোৎসর্গ করবে নাকি রে? উঃ! নিজের সম্মান রাখবার লেগে মানুষ

কি ভণ্ডামিই না করে! ওদিকে লোচন বাবু তো এখনো মদ চালাচ্ছেন!

মা নিশ্বাস ফেললেন। উজ্জ্বলা মা'র কথা শুনে উপরের দোতলার ঘরে চেয়ে দেখলো, তার স্বামী লোচন আর বড় বৌদি বসে রয়েছে একটা সোফায়। লোচনের হাতে মদের গ্লাস। বড় বৌদি বললো,

—আর খেয়োনা এখন, বুঝলে? মন্তর বলতে পারবে না। তা হলে লোকে টের পেয়ে যাবে।

—বল কি মাইডিয়ার? আমি নাকি এমন একটা পুঁচকে মাতাল? ছোঃ কিছু ভাবনা নেই তোমার, এমন মন্তর বলবো যে উজ্জ্বলার বাবার বাবা তস্য বাবা এসে যাবে! কিন্তু মাই বিলাভেড, তোমার বরটা একটা ইডিয়ট্! এত খরচ পত্তর করার কি দরকার ছিল? এই টাকাটা আমায় দিলে দুবোতল বেশী বিলেতী কিনতাম।

—তুমি বুঝছো না, এতবড় বংশের সম্মান, তাছাড়া উজ্জ্বলা মরেছে খারাপ রোগে; আর টাকাতো তারই, ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। বড় বাবু যদি একটু বেশী খরচ না করে তো লোকে বলবে কি?

—লোকে! কি বলবে লোকে! লোকের কথায় কান দাও কেন প্রাণ আমার! লোকের মুখে ঝাড়ু মেরে এই যে আমি তোমার কোলে শুয়ে মদ টানছি—লোচন সত্যি শুয়ে পড়লো বড় বৌদির কোলে।

উজ্জ্বলার আর দেখতে শুনতে ইচ্ছা হোলনা। ছিঃ ছিঃ—বড় বৌদি এতো নীচুতে নেমে গেছে! ধিক! মা বললেন,

—এই শ্রাদ্ধে এদের শ্রদ্ধা এতোটুকু নেই মা, জলা। তবে তোর বড়দা একটু দুঃখ পেয়েছে তোর লেগে। ওর অনুতাপ হচ্ছে, তাই সে এই আয়োজন করেছে।

—চল মা, বড়দাকে দেখি, বলেই উজ্জ্বলা এসে দাঁড়ালো বড়দার

কাছারি ঘরে। মা এলেন না। চণ্ডীমণ্ডপে বেদীর কাছটিতে বসে রইলেন। উজ্জ্বলা বড়দার ঘরে ঢুকে দেখলো, ফরাসের উপর বড়দা শুয়ে, কাছে কয়েকজন লোক, একজন ডাক্তার আর উষা। বড়দা কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। পেটের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা। ডাক্তার একটা ছোট বড়ি ওকে খাইয়ে দিল। উজ্জ্বলা দেখলো, বড়িটা মরফিয়া দিয়া তৈরী। যন্ত্রণাটা এখনি কমে যাবে বড়দার। কিন্তু বড়দার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে! দেখে উজ্জ্বলার কষ্ট হতে লাগলো।

বড়দা ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। উষা তার মাথায় বাতাস করছে। ওদিকে বড় বৌদি বেশ আমোদে আছে লোচনকে নিয়ে। চমৎকার! রাগে দুঃখে উজ্জ্বলার মনে হচ্ছে, এখনি গিয়ে বড় বৌদিকে ঝাঁটা কতক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কি ভেবে ও নিজেকে সম্বরণ করে বাইরের ঘরে গেল। দেখলো, ছোটদা অনেকগুলি লোকের সঙ্গে বসে গল্প করছে! উজ্জ্বলারই মৃত্যুর আগের কথা। কেমন করে উজ্জ্বলা মরেছে, কাছে কে ছিল, কত চিকিৎসা করানো হোল, কত অজস্র টাকা ব্যয় হোল ইত্যাদি কথা ছোটদা এমন অনর্গল বলে যাচ্ছে যে কার সাধ্যি ধরে—সে কথার সব মিথ্যে। না, এদের আর কল্যাণ নাই, ভাবতে ভাবতে উজ্জ্বলা সদর ফটকের কাছে এল। প্রণব একা খেলা করছে একটা রঙিন বল নিয়ে। বলটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে আবার ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনছে। ধূলা কাদায় সোনার অঙ্গ বিশ্রী হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বলার ইচ্ছা হোল, ওকে কোলে নেবে। কাছে গিয়ে ডাকলো—"খোকন, কোলে আস্‌বে মাণিক!"

প্রণব এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। কিজানি কি দেখ্‌তে পেয়ে কেঁদে উঠলো অকস্মাৎ। উজ্জ্বলা তাড়াতাড়ি ওকে কোলে নিতে যাবে, কিন্তু প্রণব ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে! চীৎকার করে উঠলো আরো জোরে। ফটকের কাছের ঘর থেকে দারবান নেহাল সিং ছুটে এসে কোলে নিল

প্রণবকে। উজ্জ্বলা অবাক হয়ে ভাবছে, কাঁদলো কেন প্রণব! চাঁপা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন ওর বাবা আর ঠাকুরদাদা। উজ্জ্বলাকে ডেকে বললেন—পৃথিবীর আকর্ষণে আজ তোর প্রেত দেহ হয়েছে জলা, দেখতে মোটে ভাল নয় সে মূর্ত্তি, তাই প্রণব ভয় পাচ্ছে। শ্রাদ্ধের পর তোর আতিবাহিক দেহ নবরূপ পেলে আরও সূক্ষ্ম শরীর হবে, তখন ওকে কোলে নিস।

উজ্জ্বলা ঠাকুরদাকে প্রণাম করে বললো—আমার শ্রাদ্ধ কে করবে ঠাকুরদা?

—তোর বিবাহিত স্বামী। জানি, ও তোর কেউ নয়, তবু পৃথিবীর শ্রাদ্ধে ওরই অধিকার।

ও বসে বসে মদ গিলছে। ওর হাতের শ্রাদ্ধ নিতে পারবোনা আমি ঠাকুরদা!

—নিতে হবে দিদি, তোর নিজের প্রয়োজনেই নিতে হবে, কিন্তু এখনো অনেক দেরী করবে এরা—অসময়েই পিণ্ডটা দেবে দেখছি! বলে ঠাকুরদা বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর বাবা প্রণবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। নেহাল সিং প্রণবকে রাঙা জবাফুল তুলে দিচ্ছে, প্রণব এখন হাসছে বেশ!

—উজ্জ্বলার মনে হোল, কে যেন তাকে ডাকছে। গভীর, করুণ মমতা মাখানো একটি মধুর আহ্বান। কার? উজ্জ্বলার অন্তরে অকস্মাৎ সমীরনের মূর্ত্তি জেগে উঠলো। সমীরন আমাকে ডাকছে, যাই দেখে আসি—বলেই উজ্জ্বলা ফটকটার এপাশে বেরিয়ে পড়লো। হাওয়ার মত তার শরীর, হাওয়াতেই ভেসে ভেসে আসছে, গ্রামের লোক যে যার কাজে যাচ্ছে, দেখতে পেল। কিন্তু কেউ উজ্জ্বলাকে দেখলোনা, তার অঙ্গের এক চুল নিকট দিয়ে দুতিনজন চলে গেল, তাকে দেখতে পেলনা।

আশ্চর্য্য ! উজ্জ্বলা এখন বায়ুভূত নিরালম্ব প্রেতিনী—বুঝতে পারলো উজ্জ্বলা ।

*　　*　　*　　*

ভাঙা একটা ইটের পাঁচিলে বসে কাঁচা মাছের একটা কানকো চিবুচ্ছিল নিরুপমা ! কি বিশ্রী দুর্গন্ধ সেটার ! উজ্জ্বলা দেখতে পেয়েই কাছে গিয়ে ডাকলো, —নিরু, ওকি খাচ্ছিস লো, ছি ! ফেলে দে ! মাগো ! কি বিশ্রী গন্ধ

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো নিরু। কুৎসিৎ ক্রিমি রয়েছে ওর উঁচু দাঁতের মাড়িতে, সেগুলো কিল বিল করছে। পরণে ওর শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা একটুকরো কানি, পিঠে একটা দগদগে ঘা, রক্ত-পুঁজ বেরুচ্ছে তার থেকে।

—তুমি কেন এলে গো ইখানে ? যাও পালাও, পালাও ! আমি বাবু ছাড়বোনা, কিছুতেই ছাড়বোনা ওকে ! যে যাই বল, ছাড়বোনা, একবার বাগে পেলে হয় ; যাও, পালাও ইখান থেকে !

—কাকে ছাড়বিনা ?—উজ্জ্বলা শুধুলো।

—কেনে ? তোমার ঐ ছুটো দাদাকে। তুমি জানোনা নাকি কিছু ? আমার সর্বনাশ করে দিব্বি পালালো, আর আমার ভাতার আমাকে পিঠে শাবল গেদে···দেখছো না ? এই দেখ—নিরু পিঠের ঘা-টা দেখালো ফিরিয়ে।

—কি করবি ছোটদা'কে নিয়ে ? তোর নিজের দোষে কষ্ট পাচ্ছিস্ নিরু! তুই কেন ছোটদার সঙ্গে ভাব করতে গিইছিলি ?

—আমি গিইছিলাম ! বারে বা, নগদ নগদ টাকা, দামী দামী কাপড়, ভালো ভালো গয়না,—কিছুতেই আমি রাজি হইনি। তারপর একদিন দু'পর রাতে—ভাতার হারামজাদা ঘরে ছিলনা—তুমায়

ছোটদাদা এসে বললো কি জানো? বললো, আমার ভাতারকে সাপে কেটেছে, শুনেই না বাইরে এলাম কাঁদতে কাঁদতে, আর ওমনি আমাকে ঝপ্ করে ধরে নিয়ে গেল ঐ বাগান-বাড়ীতে। তা-বই মদ খাওয়ালো, মাংস খাওয়ালো, গয়না দিল, কাপড় দিল, টাকা দিল, বললো, দুচার দিন পরেই কলকাতা নিয়ে যাবে—হারামজাদার বেটা! তুর বাবার নাম ভুলোবো আমি, থাম তুই,—রাগে নিরুর চোখ জ্বলছে যেন।

—কিন্তু সে সব তো চুকে গেছে নিরু, এবার ভাল হ', আসছে জন্মে……

—উসব ধর্ম কথা বলতে এসোনা—মাইরি বলছি, ভাল হবেনা, যাও, পালাও ইথান থেকে! যাও, না হলে…নিরু এক আঁজলা ধুলোবালি তুলে নিল ঝপকরে; সেগুলো ছুঁড়ে দেবে উজ্জ্বলার দিকে, উজ্জ্বলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আর একটু গিয়েই সমীরনের বাড়ী। সদর দরজা খোলা, উজ্জ্বলা ঢুকলো ঘরের উঠোনে, তারপর সমীরনের বসবার ঘরে। দেখলো, সমীর একখানা মাদুরে চুপটি করে বসে আছে। কদিন যে দাড়ি কামায় নি, ঠিক নাই। রুক্ষ চুল, চোখ দুটি মলিন, বেদনা-কাতর—যেন সর্ব্বস্ব ওর খোয়া গেছে, এমনি অবস্থা। উজ্জ্বলার দুঃখ হচ্ছে খুবই, কিন্তু আনন্দ হচ্ছে তার চেয়ে বেশী। সমীর তাকে এত ভালবাসে! এ প্রেম যে স্বর্গীয়! যে কোন নারী এ প্রেমের জন্য যে-কোন স্বর্গ তুচ্ছ মনে করতে পারে। সমীরের পাশে এসে বসলো উজ্জ্বলা, কিন্তু সমীর ওকে দেখতে পাচ্ছে না। উজ্জ্বলা তার হাতে হাত রাখলো, বুঝলোনা সমীর, ওর কপালে হাত দিল উজ্জ্বলা, মাথার চুলগুলি উল্টে দিচ্ছে। সমীর এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো কোন দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে কিনা। কিন্তু গরমকালের ভর দুপুর বেলা, ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে আসবে! সমীর উঠে দাঁড়ালো;

ও যেন ভয় পেয়েছে, এমনি সন্ত্রস্থ ভাব। উজ্জ্বলার দারুণ হাসি পাচ্ছে—বললো,—আমি সমী, আমি উজ্জ্বলা – কিন্তু শুনতে পেলনা সমীর, উঠে ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো! অস্থির হয়ে পায়চারি করছে সমীর। উজ্জ্বলা কি করে ওকে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছেনা; হঠাৎ দেখলো, সমীরের মা দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন উজ্জ্বলাকে। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন,—তোর জন্যই ও কাঁদছে মা! কিন্তু মা, তোকে শ্রাদ্ধের পিণ্ডি নিতে হবে, বাড়ী যা।

—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবো না জেঠিমা?

—না, ও শুনতে পাবেনা, তবে রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কথা বলতে পারিস।

নীরবে উজ্জ্বলা চলে এলো ঘর পানে, কিন্তু মনটুকু পড়ে রইল সমীরনের কাছেই। নাঃ, এই পৃথিবীর মত সুন্দর জায়গা আর নাই। এখানে আছে সমীর, আছে মানুষের মনে প্রেম-ভালবাসা, আছে দম্পতির মনে মিলন-মাধুর্য্য, বিরহ-সন্তাপ, আবার মিলন। আরো কত কি আছে; এ পৃথিবী কি ছেড়ে যাওয়া যায়?

কিন্তু উজ্জ্বলাকে কে যেন তীব্র ভাবে আকর্ষণ করছে বাড়ীর দিকে। তার বায়বীয় দেহ ঝুঁকে পড়ছে সেই টানে। উজ্জ্বলার গতি যেন বেড়ে উঠলো অকস্মাৎ আপনিই। খানিকটা এসেই দেখতে পেল, সেই ত্রিশূলধারী বাস্তুপুরুষ এগিয়ে আসছেন ওকে নিয়ে যাবার জন্য। ওঁর ইচ্ছার টানেই তাহলে উজ্জ্বলার গতিবেগ এমন বেড়ে গেছে! কাছে গিয়ে বল'ল—ডাকছেন প্রভু!

—হ্যাঁ মা, এসো, তোমার শ্রাদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

• হঠাৎ উজ্জ্বলা দেখলো, তার চার পাশে আরো ছয় সাতটি মেয়ে-পুরুষের প্রেত-দেহ দাঁড়িয়ে। কে এঁরা? উজ্জ্বলা চেনেনা! বিস্মিত

হয়ে তাকাচ্ছে সে, কিন্তু বাস্তুপুরুষ পরিচয় করিয়ে দিলেন—এরা তোমার শ্বশুর, দাদা শশুর, শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী মা—আজ তোমার শ্রাদ্ধে ওঁরাও পিণ্ড পাবেন, তাই এসেছেন।

—উজ্জ্বলা প্রণাম করতেই ওঁরা আশীর্ব্বাদ করে বলেন—জয় হোক মা-লক্ষ্মী! আমাদের হতভাগা বংশধর লোচন কোন দিন শ্রাদ্ধ তর্পন করেনি। তোমার কল্যাণেই আজ জল-পিণ্ড পাব মা, কত দীর্ঘ দিন থেকে ক্ষুধিত পিপাসিত আমরা। আশীর্ব্বাদ করি, উচ্চতম লোকে তোমার গতি হোক।

সবাই এসে দাঁড়ালেন উঠোনে। চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। তার নীচে চারিদিকে বিস্তর লোক; টিকিধারী পণ্ডিতেরা তর্কবিচার করছেন, মাতব্বরগণ শুনছেন, মেয়েরা কাঁদবার চেষ্টা করছে, আর ছেলেরা মজা দেখছে। উজ্জ্বলা দেখলো, লোচন এর মধ্যে কখন স্নান করে শুদ্ধ কাপড় পরেছে, আসনে বসে আচমন করবে, কিন্তু ওর হাতে এখনও বৌদির গায়ের আমিষ গন্ধ, তার সঙ্গে মদের গন্ধ মেশানো। উঃ কী নোঙরা!

—ওঁ বিষ্ণু—ওঁ বিষ্ণু,—ওঁ বিষ্ণু বললো লোচন। আশ্চর্য্য এই নাম-মাহাত্ম্য! সমস্ত মণ্ডপটা যেন কস্তুরীর ভারী গন্ধে ভরে গেল! লোচনের হাতেও পদ্মগন্ধ! শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ চলতে লাগ্‌লো; লোচন মন্ত্র সব ভুল বলছে, উচ্চারণ তো হচ্ছেই না; উজ্জ্বলারা এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো,—লোচন মাত্রপাঠ করছে ঃ—

“ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

ইস্! কী বীভৎস ব্যাপার! উজ্জ্বলা অবাক হয়ে দেখলো, লোচন ঐ মন্ত্রটী বলে জল-পিণ্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি বিদেহী আত্মা সেই এক ফোঁটা জল আর একরত্তি অন্নের জন্য কাড়াকাড়ি করছে।

কতদিন যেন ওরা খায় নি—কত কাল, কত যুগ! কোত্থেকে এলো ওরা অকস্মাৎ? ভাবতেই উজ্জ্বলা বুঝতে পারলো, ওরা সবাই তার শ্বশুরবাড়ীর লোক। উঃ কী রকম করে নিচ্ছে ঐ জল-পিণ্ড!

শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ চলতে লাগলো। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদিকে পিণ্ড দান করলো লোচন—উজ্জ্বলাকেও। উজ্জ্বলার সে পিণ্ড গ্রহণ করতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মা বললেন,—নাও মা, ও না নিলেই চলবে না। ঐ পিণ্ডটি নিয়েই তুমি আতিবাহিক দেহ ত্যাগ করে স্বর্লোকে চল।

নিরুপায় উজ্জ্বলাকে নিতে হোল পিণ্ড কিন্তু ঐ পিণ্ড গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হতে লাগলো, পৃথিবীতে আর তার কোনো কাজ নাই। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, যা ইচ্ছে করতে পারে। শরীরটা ওর এত হাল্কা আর নিরোগ মনে হচ্ছে যেন সর্ব্বমালিন্য মুক্ত হয়ে উঠেছে ও! বহুদিন রোগে ভুগে উজ্জ্বলা শরীরটাকে নিয়ে ভাল করে চলাফেরা করতে পারতো না—এখনও সেই রোগা শরীরের স্মৃতিটা ওর মনকে রুগ্ন করে রেখেছিল। কিন্তু আর নাই। উজ্জ্বলার মনে হোল—পৃথিবীর সব আধিব্যাধি মুক্ত হয়ে গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে চলেছে সে পূজা করবার জন্য!

—আয় জলা, এখানকার কাজ শেষ হোল, চলে আয়—মা ডাকলেন!

—যা তোর মার সঙ্গে।—ওতো স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে থাকবে? বাবা শুধুলেন মাকে।

—না, এখনো স্বর্গের প্রথম স্তরেই থাকতে হবে কিছুদিন ওকে। সমীরনের উপর আকর্ষণ রয়েছে যে, নইলে তৃতীয় স্তরে যেতে পারতো। বলে মা উজ্জ্বলাকে বললেন—তোর নাম জলা, চন্দ্রদেবের প্রজা তুই, আর রবিদেব তোর পিতৃমূর্ত্তি, গুরুদেব বৃহস্পতি। অষ্টমে তুলা রাশিতে থেকে

তুঙ্গী শনিদেব তোকে দুঃখ দিয়ে নির্ম্মল করে দিচ্ছেন মা, ভয় কি ? এ দুঃখ সইবার মত শক্তি তোকে দেবেন মা-দুর্গা - দেবেন গ্রহদেবতারা, দেবেন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ আদি স্বর্গ-দেবতারা ; আয় চলে আয় !

মা হাত ধরলেন ওর, কিন্তু উজ্জ্বলার মন আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো : এই পৃথিবী আজ তাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, এই পরম প্রিয় বাসভূমি, ঐ রোদন রত ভ্রাতুস্পুত্র প্রণব, ঐ যে, ওখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার প্রিয়-প্রিয়তম সমীরন ; না, এদের ছেড়ে কোথাও সে যেতে চায় না, যাবে না। কিন্তু যেতে না চাইলে কি হবে, দেহটা তার যেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রজতকণায় তৈরী হয়ে গেছে—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সে দেহ ; অতি সূক্ষ্ম-বুনুনীর একখানি ঢাকাই মসলিনের মত ঝিলমিল করছে গোটা শরীরটা ! মা ধরে আছেন, না হলে উজ্জ্বলা হয়তো বাতাসে উড়ে যেত।

কিন্তু উড়ে সে যেতো না, কারণ তার একটা অসীম শক্তি জাগছে অন্তরে। এই ইচ্ছা শক্তিটা এমন করে সে খানিক পূর্ব্বে ও অনুভব করেনি। সে যেন এই ইচ্ছাশক্তির বলে উপর দিকে উঠে যেতে পারে, অধো দিকে নামতে পারে, এমন কি, অন্য মানুষের অন্তরকে সূক্ষ্ম শক্তিশালী অনুভূতিতে অভিভূত করে দিতে পারে। হঠাৎ কেন জানি, তার খেয়াল হল, দরজার কাছে দাঁড়ানো সমীরনকে সে ডাকবে। উজ্জ্বলা ডাকলো—সমী ! আমি যাচ্ছি, আমার লেগে কেঁদনা তুমি সমী ; আমি মাঝে মাঝে এসে তোমায় দেখে যাবো।

সমীর আকাশ পানে চাইছে। উজ্জ্বলা বুঝলো তার কথাগুলো সমীরনের মনে ধাক্কা দিয়েছে, কিন্তু বোধগম্য করতে পারেনি—সমীরনের মন আত্মিক জগতের কথা শোনবার মত নিঁখুত আর সূক্ষ্ম নয়। মা বললেন,—এখন ওর সঙ্গে কথা তুই বলতে পারবি না মা, স্বপ্নে ওকে দেখা

দিয়ে কথা বলতে পারিস। জীবিত মানুষ সাধনা না করলে আত্মিকদের কথা শুনতে পায় না। *

—তোমার কথাও শুনতে পাবে না?—জলা মাকে শুধুলো।

—না; আরো উর্দ্ধলোকের আধিদেবতারা ইচ্ছাশক্তির বলে দেবতার রূপ নিয়ে কথা বলতে পারেন।

—তা হলে আমি স্বপ্নেই ওকে দেখা দিয়ে কথা বলে যাব মা, আমায় অনুমতি দাও!

মা একটুখানি ভাবলেন. পরে বললেন,—বেশ থাক, খুব সাবধানে থাকিস্! আমি রাত বারোটার সময় তোকে নিতে আসবো। তার পর বাস্তুপুরুষকে বললেন,—আপনি এই সময়টা ওকে দেখবেন দেব!

—হ্যাঁ মা, যাও তুমি—বাস্তুপুরুষ বললেন। ওঁকে প্রণাম করে উজ্জলার মা আর ঠাকুরদা চলে গেলেন। রইলেন উজ্জলার বাবা, উনি বললেন, —আমার একটু কাজ আছে প্রভু।

শ্রাদ্ধ সেরেই লোচন উপরে উঠে গেছে! খাচ্ছে বসে বসে। উজ্জ্বলার চোখের দৃষ্টি এখন ইটকাঠ পাথর ভেদ করে যেতে পারে। এ যেন রঞ্জন-রশ্মি, মাংস ফুঁড়ে হাড় দেখতে পায়। বাড়ীটার পানে তাকিয়েই উজ্জ্বলা দেখলো, বড় বৌদি লোচনকে নিয়ে সোহাগ করছে, বলছে—আহা! মুখখানি শুকিয়ে গেছে। এমন করে উপোস করা তো অভ্যেস নেই। —এসো, খাও, লক্ষ্মীটি আমার!

—উপোস! বাবার জন্মে করিনি আমি! শালার শাস্তরের আর কাজ ছিল না! এসব করে কি যে হয়! মরে গেছে, সে আবার খেতে আসবে

পশ্যন্তেবম্বিধং সিদ্ধা জীবং দিব্যেন চক্ষুষা
চব্যন্তং জায়মানঞ্চ যোনিং চানু প্রবেশিতং॥ মহা ভারত—অশ্বমেধপর্ব।

পিণ্ডি! মরে যে গেল সে কি আবার আসে বাপু! এ সব ঐ বামুন শালাদের বুজরুকি। অত অত জিনিষ পত্তর, খাট, বিছানা, বাসন-কোসন, সব দাও ঐ শালাদিকে ; হুঁ!

—যাক্‌গে, ওর দাদারা করলো কিছু খরচ। নাও বসো, বলে বৌদি কয়েকটা ভাল মিষ্টি, ফল আর দৈ-এর সরবৎ দিল লোচনকেঁ খেতে। লোচন বললো, —দৈ! বল কি রাণী আমার! শুকনো গলা দৈ দিয়ে ভেজাবো! মদ আন ভাই। মাইরী বলছি, দু'ঢোক না খেলে মরে যাব আমি।

উজ্জ্বলা দৃষ্টি ফেরালো কিন্তু কথাগুলো কাণে আসছে। ধীরে ধীরে বাইরে চলে এল উজ্জ্বলা। বড়দার দুর্ভাগ্য ভেবে মন ওর খারাপ হয়েইছিল ; বাইরে এসে দেখলো, একটা ছোট ঘরে প্রণব একলা ঘুমিয়ে গেছে, কাছে কেউ নেই। উজ্জ্বলার কান্না পেয়ে গেল। প্রণব ঘুমুচ্ছে মেঝেতে পড়েই। খেলতে খেলতে কখন ঘুমিয়ে গেছে হয়ত! কেউ দেখেনি, ছেলের মা ঘৃণ্য বিলাসিতায় মগ্ন! উঃ—উজ্জ্বলার পিতৃবংশের রক্ত প্রণবের মধ্যে ; এত অযত্নে ও কেমন করে বাঁচবে! ভাবছিল উজ্জ্বলা প্রণবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখলো, দুটো অদ্ভুৎ আকৃতির প্রেত ঘরে ঢুকছে। উজ্জ্বলাকে গ্রাহ্যই করছেনা তারা, যেন দেখতে পাচ্ছেনা। উজ্জ্বলা বললো—এই! কি দরকার এখানে তোদের ?

ওরা শুনতে পায়নি। কঙ্কালে গড়া আঙুলে বড় বড় নখ, তাই দিয়ে প্রণবের বুকটা চিরে ফেলতে উদ্যত হচ্ছে। উজ্জ্বলা ভয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো,—বাবা বাবা!

বাধা সে দেবেই, উজ্জ্বলা তার সূক্ষ্ম দেহ দিয়ে প্রণবকে আগলে শুয়ে পড়লো। তার ইচ্ছাশক্তি বলবত্তর হচ্ছে। হঠাৎ উজ্জ্বলা দেখলো, তার সূক্ষ্ম দেহখানা ভারী হয়ে মুহূর্তে প্রায় স্থূল শরীরের

কাছাকাছি এসে গেল। আর প্রেত দু'জন তাই দেখেই থেমে গেল। উজ্জ্বলা কঠোর স্বরে বললো—কি চাস তোরা? কে তোরা? চোখ দিয়ে একটা তীব্র জ্যোতি বেরুচ্ছিল উজ্জ্বলার। প্রেত দুজন তাই দেখেই পালাবার চেষ্টা করছে। জানালা গলে পালাবে ওরা, কিন্তু ওদিকে বাস্তুপুরুষ আর বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ওঁরা এসেই প্রেত দুটোকে বেশ করে কয়েক ঘা দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

—এরা কে প্রভু? কেন প্রণবকে মারতে এসেছে?

—ওরা দুষ্ট প্রেত মা, প্রণবকে মারতে পারলে এই বাড়ীতে ওরা সুখে রাজত্ব করতে পারে। প্রণবের গলায় একটা নৃসিংহ কবচ বেঁধে দিতে হবে; তুই বৈকুণ্ঠকে বলে দে তো মা!—উজ্জ্বলা বৈকুণ্ঠের কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলো, সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বাইরের উঠোনে, বৈকুণ্ঠের কাছেই। বৈকুণ্ঠ ব্রাহ্মণ ভোজন দর্শন করছিল। উজ্জ্বলা বললো, —প্রণবের কাছে যাও বৈকুণ্ঠ দা, আর ও ঘুমিয়ে গেছে, ওকে মারবার চেষ্টা করছে কয়েকটা দুষ্ট প্রেত! তুমি ওকে কাছ-ছাড়া করোনা বৈকুণ্ঠদা, আর ওর গলায় একটা নৃসিংহ কবচ.........

বলার আর কিছু দরকার হোল না, বৈকুণ্ঠ ছুটলো প্রণবের কাছে! উজ্জ্বলা অবাক হয়ে যাচ্ছে, বৈকুণ্ঠ তার কথা শুনতে পেল কেমন করে! ফিরে এসে সে শুধুলো বাস্তুপুরুষকে। উনি হেসে বলেন,—বৈকুণ্ঠ সত্যযোগী জলা, ওর অন্তর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি-স্পন্দন গ্রহণ করতে পারে। তোর কথা ওর অন্তরে সাড়া জাগিয়েছে, তাই সে-কথাগুলি ওর মনে জেগে উঠলো। ওর মানবীয় দেহ, চোখ, নাক, কাণ, এখনো তেমন সূক্ষ্ম হয়নি, নইলে তোকে ও দেখতে পেতো।

বৈকুণ্ঠ এর মধ্যে প্রণবকে কোলে তুলে নিয়েছে। উজ্জ্বলা আবার বললো, —একটা নৃসিংহ কবচ ওকে পরিয়ে দিও বৈকুণ্ঠদা, কালই দিও যেন।

*   *   *   *

সমীরের অন্তর বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ধীরে ধীরে। প্রবালদের প্রকাণ্ড ফটক ত্যাগ করে চলে এল সমীর। রাস্তাটা কিছুদূর এসেই বাঁক ফিরেছে, সেই মোড়ে একটি ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী। গৃহিণী পুণ্যশ্রী দেবী সমীরের দিদিমা হন সম্পর্কে। সমীর ঐ বাড়ীতেই ঢুকে দেখলো, পুণ্যশ্রী দেবী বারান্দায় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বসে রয়েছেন। সমীরকে দেখে বললেন,

—আয়! একি হচ্ছিস তুই সমীর! বুড়ো বাপ এখনো বেঁচে। বিবাগী হবি নাকি?

—না দিদিমা, হতে পারছি না বিবাগী। কিন্তু তুমিই বা এমন শুকনো কেন দিদিমা? অসুখ?

—হ্যাঁ ভাই, জ্বর হয়েছে। স্নান করিনি, তাই আমার তুলসী গাছে জল দেওয়া হয়নি আজ। গাছটি আমার শুকিয়ে গেছে সমীর, দেখে কান্না পাচ্ছে আমার।

—আমি জল দিয়ে দেব দিদিমা? আমিও কিন্তু স্নান করিনি।

—স্নান কর ঐ কূয়োর জলে, তারপর আমার তুলসী তলায় পূজো কর। আজ হরিবাসর, একাদশী।

সমীর আর কোন কথা না বলেই স্নান করলো, তারপর দিদিমার দেওয়া একখানা রেশমের কাপড় পরে পূজা করতে বসলো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, জৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ রোদে মঞ্চের তুলসী গাছটি সত্যি শুকিয়ে গেছে, নেতিয়ে পড়েছে একেবারে। দিদিমা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন —সারা দিন তুমি পিপাসায় রইলে ঠাকুর! কত যে অপরাধ হলো আমার!

সমীরের হাসি পাচ্ছে, তুলসী গাছে আবার ঠাকুর থাকে? যত সব আজগুবি কথা দিদিমার! কিন্তু মুখে ও কিছু বললো না, কারণ দিদিমাকে ও

ভালবাসে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। ও জানে, এ গ্রামে এমন নিষ্টাবতী পবিত্র চরিত্রের মেয়ে আর নেই। ছিলেন উজ্জলার মা, আর আছেন এই দিদিমা। সমীর মন্ত্র পাঠ করতে লাগলো, আর দিদিমা অসুস্থ শরীর নিয়ে করযোড়ে বসে রইলেন সেইখানে। অনেক গুলি ছেলে-মেয়ে দিদিমার, প্রায় সাত আটটি, তবে বড়গুলি সব মেয়ে, তারা থাকে শ্বশুর বাড়ীতে। বড়ছেলেটি স্কুলে পড়ে, ছুটির পর এসে কোথায় খেলতে বেরিয়েছে, হয়তো ফুটবল খেলতে গেছে। মা বলেছিলেন গাছে জল দিয়ে যেতে, সে গ্রাহ্য করেনি। অন্য ছেলেটার এখনও উপনয়ন হয়নি, আর স্বামী বাড়ীতে নেই, কোথায় গেছেন। দিদিমা তাই আকুল হয়ে উঠেছিলেন তুলসী গাছে জল দেবার লোক না পেয়ে। আশ্চর্য্য! এত নিষ্ঠা আর ভক্তি এরা কোথায় পায়? এই সব বাঙলা দেশের অশিক্ষিত মেয়েরা? সমীর নিজের মনেই প্রশ্ন করছিল, আর পূজা করছিল! পূজা নারায়ণের। অবশ্য নিত্য এ পূজা করতে হয়না, কিন্তু আজ একাদশীর দিনে দিদিমা সমীরকে পেয়ে করিয়ে নিচ্ছেন পূজাটা। তুলসী গাছটি জল পেয়ে আর সন্ধ্যার বাতাস পেয়ে সতেজ হয়ে উঠছে, সমীর দেখলো। বললো—এই নাও দিদিমা তোমার তুলসী ঠাকুর চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, এবার এক কাপ চা খেতে হবে।

—আয়, চা করে দি, বস! উজ্জলার শ্রাদ্ধ চুকে গেল রে?

—হুঁ, সমীর গম্ভীর মুখে কথাটা বলতে চাইলো, কিন্তু স্বরটা কান্নার মত শোনাচ্ছে। দিদিমা বললেন,— যে যাবার সে গেল সমীর! বুড়ো বাপ রয়েছে তোর। বিয়ে কর এবার, বুঝিলি?

—না দিদিমা, আর যে যা বলে বলুক, তুমি একথা বলোনা।

—কি তাহলে করবি? সন্ন্যাসী হবি নাকি? বলেই আবার বললেন,—ওসব ভেবে কিছু লাভ নাই ভাই, যার যা কর্ম্মফল তা ভুগতেই হবে।

—আমি ওসব মানিনা দিদিমা। মানুষ এই জীবনে যা পেলনা, তা পর জন্মে পাবে, আমি বিশ্বাস করিনা।

—কপাতা ইংরাজি পড়ে তোর বড্ড বাড় বেড়েছে সমীর! বলেই উনি তাকালেন উঠানের তুলসী গাছের পানে। সেখানে কি যে দেখলেন, উনিই জানেন, অকস্মাৎ গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন। সমীর হেসে উঠলো, বললো—আমায় শায়েস্তা করবার লেগে তোমার ঠাকুর এসে পড়লেন নাকি দিদিমা ?

—হাসিস না, দেখ, চেয়ে দেখ, বলেই উনি আবার যোড়হাত করলেন।

নিশ্চয় হ্যালোসিনেশন! (Hallucination) সমীর কেটলি থেকে গরমজল নিয়ে নিজেই চা তৈরী করতে করতে ভাবতে লাগলো—দিদিমার লেগে দু' এক ডোজ ওষুধ এনে দিতে হবে। কিন্তু দিদিমা বার বার প্রণাম করছেন আর বলছেন 'হরিহে দীনবন্ধু' !

চা খেতে খেতে সমীর বললো—তুমি এখনো বুড়ী হওনি দিদিমা, অত হরি হরি করছো কেন? সাজিয়ে গুজিয়ে তোমার আবার বিয়ে দেওয়া যায়। দিদিমা হাসলেন। বাস্তবিক এমন চমৎকার শরীর দেখা যায় না। আট দশটা ছেলেমেয়ে দিদিমার, কিন্তু দেখতে তাঁকে ত্রিশ বছরের বেশি মনে হয় না। উনি হেসে বললেন, – সেও ঐ তাঁরই কৃপা। শরীর খারাপ হলে ওঁর পূজো করতে পারিনে। দেখলেন তো, আজই ওঁকে জল দিতে পারিনি।

—হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি জল না দিলে ভগবান তেষ্ঠায় মরে যার নাকি দিদিমা ? এতো সব পুকুর, কূয়ো রয়েছে, দোকানে চা-সোডা-লেমনেড রয়েছে, নিদেন পক্ষে পবিত্র ডাবও তো আছে, কিনে খেতে পারেন না ?

—না ; ভক্তের দেওয়া খাবার না হলে খেয়ে ওঁর তৃপ্তি নাই। তাই

উনি ভক্তকে সৃষ্টি করেন, তাদের নিয়ে লীলা-বিলাস করেন। মা'র হাতের খাবার না খেলে কি ছেলের তৃপ্তি হয়? উনি তাই ভক্তকে খোঁজেন।

কথাটা অন্ধ ভক্তির কথা, কিম্বা হয়তো যুক্তি কিছু আছে ওর মধ্যে, কিন্তু সমীর নিজের চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললো,

—আরো তো অনেক ভক্ত আছে দিদিমা, উনি তাদের কাছে খেয়ে বেশ তাজা থাকলেন না কেন? তোমার তুলসী গাছকে তাহলে বুঝতাম!

—উনি প্রত্যেক মানুষের কাছে, প্রতি জীবের অন্তরে পৃথক মূর্ত্তিতে বাস করেন, তাই আমার গাছ আমার জল না পেয়ে শুকিয়ে গেছে।

এঁর সঙ্গে তর্ক অনর্থক, তবু সমীর বললো,—তোমার ঐ হরি যদি আমার চা'টাকে বিস্বাদ করে দিতে পারেন, তাহলে বুঝবো, তিনি আছেন।

—বিস্বাদ তিনি করেন না, সমীর, জীবনকে সুস্বাদ করে' সৎ আর সুন্দর করে' ওঁর লীলায় বিলসিত করবার লেগেই উনি ব্যাকুল হয়ে আমাদের ডাকছেন। আমাদিকে ওঁর সুরভিতে গলিয়ে মিলিয়ে নেবার জন্য ওঁর অশ্রান্ত স্নেহসমুদ্র সর্বদা টলমল করছে। ওঁর মৃগনাভি-কস্তুরী-কর্পূর সুবাসিত অঙ্গ গন্ধ একবার যে পেয়েছে......উনি আবার প্রণাম করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সমীর আশ্চর্য্য হয়ে অনুভব করলো ঘরের বাতাসে একটা অনুপম আঘ্রাণ, অতি পবিত্র একটি মৃদু সৌরভ! কস্তুরী মৃগনাভির গন্ধটাই নাকি! দিদিমা প্রণাম করছেন আর সমীর ভাবছে, তারও মনে হ্যালুসিনেশানের হাওয়া লাগলো না তো! কিম্বা কস্তুরীর কথা মনে হতেই তার গন্ধটাও অনুভূত হচ্ছে নাকি তার মনে? মনের এরকম হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

দিদিমা উঠে বললেন—বিশ্বাস কর সমীর। বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। *

উত্তরে সমীর আর কিছু বললোনা, চা খেয়ে বাড়ী চলে গেল।

ওর বাবা সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন। সমীরকে দেখে বললেন—

—আয়. বোস আমার কাছে। উনি জানেন সমীর কতখানি ব্যথা পেয়েছে অন্তরে। স্নেহশীল পিতা মা'র মত স্নেহে মানুষ করেছেন সমীরকে। আশা ছিল উজ্জলাকে পুত্রবধূ করে দিন কতক সুখে কাটিয়ে যাবেন। ভগবানের সে ইচ্ছা নয়!

সমীর নীরবে বসলো বাবার কাছে। বাবা একটু থেমে বললেন, —পৃথিবীর সব কাজ চুকে গেল ওর। পেটের ছেলেও নাই যে বৎসরান্তে একটা শ্রাদ্ধ করবে! বড় দুঃখ পেয়ে গেল মা আমার!—একটা গভীর শ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। সমীর কি আর বলবে! বাবা উজ্জলাকে কন্যার মত ভালবাসতেন, কোলে বসিয়ে পড়াতেন, কত স্তোত্র যে ওকে শিখিয়েছিলেন, কত বিদ্যা যে ওকে দান করেছিলেন, কত ব্রত, কত পূজা পাঠ, কত রকমের দেবতার কথা বলে ওর মনকে নিজের মনের মত করে গড়েছিলেন—মনে পড়ছে সমীরের। বাবার দুঃখও কম নয় উজ্জলার জন্য। যদি বেঁচে থাকতো তাহলে একটা সান্ত্বনা ছিল বাবার। ছাত্রী তাঁর রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী হয়ে বেঁচে রইল না কেন? কোথায় গেল উজ্জ্বলা? কোথায় গেল শৈশবের সেই খেলা-ধূলার মধুর দিনগুলি!

---

*নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্

—মুণ্ডকাশ্রুতি

সমীরের চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠছে। বাবা বললেন,—দুচার দিন বাড়ী থাক, তারপর যাবি ধানবাদ—নাকি ?—

—না বাবা, অনুমতি করুন, আমি সকালের ট্রেণেই যাবো।

সমীর কেন থাকতে চাইছে না, জানেন উনি। থাকতে পারছে না সমীর। এই গ্রামের প্রতি ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ওদের জীবনের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। এই উঠোনের যে-কোন স্থান খুঁজলে হয়তো এখনও উজ্জ্বলার পায়ের দাগ দেখা যাবে, হাতের ছাপ বেরিয়ে পড়বে ; কত স্মৃতি, কত মধুর স্মৃতি ! উঃ—মৃত্যু কি নিষ্ঠুর ! কিন্তু না – মৃত্যু তো নাই, নাই মৃত্যু !—জোরেই বলে উঠলেন উনি ঃ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

—ও সব কি সত্য বাবা ? আমার তো বিশ্বাস হয় না—সমীর অকস্মাৎ বলে বসলো। বাবা হাসলেন, বললেন—বিশ্বাসের কথা তো নয় বাবা, এসব অনুভবের বস্তু। তবে আমাদের সাধারণ লোকের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করার জন্যই শাস্ত্রোপদেশ। তুমি বিশ্বাস না করলে তোমাকে বিশ্বাস করানো যাবে না। ময়লা-পড়া আয়নায় তো মুখ দেখা যায় না সমীর !

—ময়লা পরিস্কার করবো কি দিয়ে ?

—জ্ঞান দিয়ে। সেই জ্ঞানের প্রথম সোপান শাস্ত্রোপদেশ ;—ন্যায়, দর্শন, বেদ, বেদান্ত যাঁরা লিখে গেছেন, তাঁরা আর যাই হোন, নেশা করতেন না নিশ্চয় ! তাহলে অত সূক্ষ্ম বিচাব বিশ্লেষণ তাঁরা করতে পারতেন না—যা দেখে আজকার এত বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়ে যায় !

—সে ঠিক, কিন্তু বাবা, মানুষ কি সত্যি মৃত্যুর পর বেঁচে থাকে ?

—হ্যাঁ, থাকে ! সেই কথা জেনেছিলেন বলেই ঋষিরা পার্থিব জীবনের ভোগ-সুখের দিকে, যন্ত্রবিজ্ঞান আর জৈব-বিজ্ঞানের দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃষ্টি দেন নি। জীবনের পর জীবন, অনন্ত জীবন-প্রবাহের কল্যাণের দিকেই তাঁরা দৃষ্টি দিয়েছিলেন, আর সেই কল্যাণের পথ আবিষ্কারও করে গেছেন।

—সে পথ কি পথ বাবা ?

—পথ অনেক, তবে সাধারণতঃ যোগের পথ ; কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ। তাঁকে জানতে হ'বে বাবা—"ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায় "। সেই জ্ঞানময়কে জানলেই সমস্ত অজ্ঞানতার নাশ হবে, জীব চিদানন্দ লাভ করে সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে মিশে যেতে পারবে ; জানতে পারবে, মৃত্যু নাই, আছে লোক থেকে লোকান্তরে অভিযান, দেবযান, ধূমনান, ঐশীযান ; যার যেমন কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, সে সেই রকম লোকে যেতে যেতে শেষে সেই পরমব্রহ্ম-লোকে যাবেই ; এই তাঁর লীলা। কত ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ; কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তারই জন্য কত কোটি কল্পধরে তপস্যা করছেন !—বাবা চুপ করলেন।

—উজ্জ্বলা কি তবে মরেনি বাবা ?

—না, তার স্থূল শরীরের মৃত্যু হয়েছে মাত্র। সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরের মৃত্যু বা বিনাশ নাই। (১) (২) আবার সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর যখন জীবাত্মা পরিত্যাগ করে তখনো তার মৃত্যু হয় না, সে অমর।

---

(১) জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।

—ছান্দোগ্যোপনিষদ।

(২) এষ চেতরানি চাণ্ডজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জাণিচা॥

ঐতরেয়োপনিষদ।

—তার শেষ পরিণতি কোথায় বাবা? চিরকাল কি ঘুরতেই থাকবে জন্মে জন্মে?

—না; শেষ পরিণতি ব্রহ্মলাভ! কিন্তু তার কর্মফল, তার সংস্কার, অভিমান, আমিত্ব, কতদিনে তাকে ততখানি তুলবে, তা কারু জানা নাই। এই জন্যেই ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করতে হয়। তিনি বিশ্বাস করিয়ে দেন, অনুভূতি জাগিয়ে দেন, জ্ঞান-প্রদীপ জ্বেলে দেন; বিশ্বাস কর সমীর!

—হাঁ বাবা! বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে। মানুষ মরলেই যদি সব ফুরিয়ে যায় তবে জীবিত আত্মীয়দের সান্ত্বনা কোথায়? তাই বিশ্বাস করছি বাবা, উজ্জ্বলা বেঁচে আছে, উর্দ্ধ, উর্দ্ধতর লোকে সে আরো আনন্দে রয়েছে, বিশ্বাস করতে ভালো লাগছে বাবা!

সমীরের চোখের টলমলে জল ঝরে পড়লো। বাবা বললেন,—হয়তো তোর কল্পনা মিথ্যা নয় সমীর! হয়তো কোন উচ্চ স্তরের দেবতা কিম্বা উজ্জ্বলাই তোর অন্তরে স্পন্দন তুলছে; সে ভাল আছে, সে সুস্থ আছে, আনন্দে আছে।

—মৃত আত্মাদের দেখা যায় না বাবা?—ছেলেমানুষের মত শুধুলো সমীর।

—যায়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রেতরা ইচ্ছা করলে পার্থিব পরমাণুকে বেগে আকর্ষণ করে দেহ ধারণ করতে পারে, আর সূক্ষ্ম দেবযান-গামী আত্মারা কারণ-শরীর দিয়ে তোমার অন্তরে তরঙ্গ তুলতে পারেন। তাঁদের দেখতে হলে সূক্ষ্ম দৃষ্টি চাই, সাধনা আর দৈবী কৃপা ছাড়া সে হয় না; আমাদের ওবাড়ীর বৌমার উপর যেন আছে সেই কৃপা।

—দিদিমার কথা বলছেন বাবা?

—হাঁ বাবা, উনি খুব উচ্চস্তরের আত্মা! গত জন্মে হয়তো সংসারে কিছু আসক্তি ছিল, কিম্বা ওঁর স্বামীর হয়তো ততখানি উচ্চগতি হয়নি,

তাই আবার জন্মেছেন ; তবে এবার উনি অনেক এগিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুলসী গাছের পানে তাকিয়ে দিদিমার প্রণাম করা আর কস্তুরীর গন্ধ পাওয়ার কথাটা বাবাকে বলবে কিনা ভাবছে সমীর।

বাবা বললেন,—মানুষের মধ্যেও দেবত্বের আবির্ভাব ঘটে সমীর, মানুষই দেবতা। যে তাঁকে জানে সেই 'তিনি' হয়ে যায়। "তত্ত্বমসি"—অর্থাৎ তুমি আমি হই—যেমন বৈষ্ণব কবির "অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই"···ঠিক তেমনি, তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে ভক্ত তাঁতেই পরিণত হয়ে যায়, স্ব স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়, চিদানন্দ লাভ করে।

সমীরের ছোট বোন ডাকলো—খাবেন না বাবা, রাত হোল।

—চল সমীর—বলে বাবা উঠলেন, সমীরও উঠলো, কিন্তু মনটা তার নানা সন্দেহ-দোলায় দুলে উঠছে। খেতেও বিশেষ কিছু পারলো না। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ভাবতে লাগলো, উজ্জ্বলাকে সে তো অনেকদিন হারিয়েছে, তার বিয়ের দিনেই, তখন তো এত কষ্ট হয় নাই, আজ কেন এত কষ্ট হচ্ছে? সে বেঁচে থাকবে কি করে পৃথিবীতে? উজ্জ্বলার লেগে মন তো তার এমন করে কোনো দিন কাঁদে নি। আজ যেন সমীরের মনে হচ্ছে, সে একাকী, সে দুর্ব্বল, সে পৃথিবীতে টিঁকে থাকবার সব শক্তি হারিয়েছে।

নীলিমার উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে উজ্জ্বলার। তার যে রাগ করা উচিৎ নয়, সে যে পার্থিব রাগ-দ্বেষ-হিংসার বাইরে চলে গেছে, একথা ভুলে গেছে উজ্জ্বলা। ভুলে গেল সে জলা, জলের মত তার নিজস্ব রূপ নাই, বর্ণ নাই, স্বাদ গন্ধ কিছু নাই, সে অখণ্ড জীবনপ্রবাহের এক বিন্দু শিশির-

কণা, স্বচ্ছ, সুন্দর, অদৃশ্য। সব ভুলে উজ্জলার মন প্রণবের দুদশায় ব্যথা-বেদনা-মথিত হয়ে উঠতে লাগলো। পার্থিব চেতনার পাঞ্চভৌতিক আকর্ষণবেগ ওর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেহটাকে ক্রমশঃ ভারী করে আনছে, আবার সেই আতিবাহিক দেহেই ফিরে যাচ্ছে উজ্জ্বলা, সেই প্রেতদেহে! উজ্জলা চমকে নিজের পানে চেয়ে দেখলো, বুঝতে পারলো, পৃথিবীর গ্লানি, বিদ্বেষ আর ঘৃণা তাকে আবার বিড়ম্বিত করছে। এসব ঘৃণা-বিদ্বেষ আর তার করা উচিত নয়। প্রণব তার কে? কেউ কারো নয়। উজ্জলা এখন জলা, সে এখন বিশ্বের অধিদেবতার আশীর্বাদে লোক থেকে লোকান্তরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, ক্ষীণ দীপালোক থেকে অসীম অনন্ত জ্যোতির্ময় আলোক-লোকে যাত্রা করেছে; সে ভক্তির মুক্তিপথ-যাত্রিনী, প্রেমের উপাসিকা। উজ্জলা বারবার মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছেনা। মনের উপর যেন তার কিছু মাত্র পরিচালন-শক্তি নাই। প্রণব কাঁদছে আর বলছে—মার কাথেদাব।

হতভাগিনী মা তার! উপরের ঘরে কোথায় এক কদর্য্য চরিত্রের মাতালের মাথা কোলে নিয়ে রঙ্গ-রসে বিভোর, আর গর্ভজাত শিশু তার 'মা মা' বলে কাঁদে! পৃথিবীর এই নীচতা উজ্জলার মনকে পৃথিবীর সব কিছুর উপর ঘৃণা ধরিয়ে দিচ্ছে, আর ততই সে এই পৃথিবীর কথাই ভাবছে। আশ্চর্য্য! উজ্জলা আবার প্রেতদেহ ধারণ করলো নাকি? উজ্জলার উর্দ্ধ গতি ব্যহত হচ্ছে, দূর-দর্শন-শক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। উর্দ্ধতর লোকের মহাযাত্রী উজ্জলা মৃন্ময়ী ধরিত্রীর সিক্ত মৃত্তিকার গন্ধে পরম আরাম অনুভব করছে। আঃ—! কি চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস! কি শ্যামল সুন্দর দূর্বাদল, লতা-বিতান, তরুশ্রেণী, চাঁপা বেলা রজনীগন্ধার মধুর সুবাস! অপরূপ! অপরূপ এই পৃথিবী, উজ্জলার কত জন্মের জন্মভূমি মা!

উজ্জলা প্রণাম করলো!

নিশ্বাসটা কেমন সহজে নেওয়া যায় এখানে! কত অনায়াসে! ঘন বায়ুর মধ্যে সাগর-জলে মাছের মতন সঞ্চরণ করা যায়; কত সুস্বাদু খাদ্য-পেয়, কত মধুর প্রেম-ভালবাসা! না, এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না উজ্জ্বলা। ওনীল ঠিকই বলেছিল—'ঐ পৃথিবী আমাদের, আমাদের শত লক্ষ কোটি বছরের জন্মভূমি। ওর থেকে ভালো জায়গা আর আমাদের নাই'—বলেছিল ওনীল। সত্যই বলেছিল।

উজ্জ্বলা ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। সে যেন এখন এই মাটির জগতের মানুষ, এমনি মনে হচ্ছে তার! মনে হচ্ছে, সে স্বপ্ন দেখছিল যে সে মরে গেছে! মরে কেন যাবে সে? ঐ তো প্রণব, বৈকুণ্ঠ, দারবানরা! ঐতো বড়দার ঘরে ডাক্তার এলেন। যাই দেখিগে।

উজ্জ্বলা ঠিক বুঝলো, সে অসুস্থ হয়ে হয়ে স্বপ্ন দেখছিল যে সে মরে গেছে। উঃ কি খারাপ স্বপ্ন! মরে গেলেই হোল নাকি অমনি! তার সমীরকে ছেড়ে, প্রণবকে ফেলে, এত বড় সুখ সম্পদ ত্যাগ করে মরতে যাবে কেন সে! মরবার বয়সও তো তার হয় নি! উজ্জ্বলা বড়দার নীচেকার ঘরে এলো। অসুখ বেড়েছে বড়দার। ডাক্তার পরীক্ষা করছেন, বললেন—

—খুব কেঁদেছিলেন নাকি? এখন কাঁদবেন না বড়বাবু।

—না-কেঁদে পারছিনা ডাক্তার। আমার বোন, বড় আদরের বোন আমার। চাঁদের আলোর মত সুন্দর, ফুলের মত নিষ্পাপ, ছোট বোনটি আমার!

বড়দা হাহাকার করে কেঁদে উঠলো আবার। ডাক্তার থামাতে পারছে না। বড়দা কাঁদছে আর বলছে—বড় অভিমান করে চলে গেলি উজ্জ্বলা, দাদার সঙ্গে একবার দেখাও করলিনা! কান্নার জন্য পেটের ব্যাথাটা বেড়ে উঠলো বড়দার।

একি ! কাঁদে কেন বড়দা ! উজ্জ্বলা তাড়াতাড়ি গিয়ে বসলো প্রবালের মাথার কাছটিতে, বললো—কেঁদোনা বড়দা, আমিতো ভাল হয়ে গেছি।

কিন্তু বড়দা শুনতে পাচ্ছে না। উজ্জ্বলা আবার চেঁচিয়ে ডাকলো, —বড়দা ! প্রবাল বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে ফুলে ফুলে। কারো কথা শুনছেনা। হঠাৎ এলো বড় বৌদি। কর্কশ কণ্ঠে বললো—বোনটী আর বোনটি ! আহাহা ! নিজে মরে গেলে তখন বোনটির লেগে কাঁদবে কে ? যত বয়স বাড়ছে, তত ছেলে মানুষ হচ্ছেন ! বুড়ো হতে বসলে, আবার খোকার মতন কাঁদো কোন লজ্জায় !

বড়দা অসহায়ের মত তাকালো বৌদির পানে। বৌদি ফের বললো,

—কি বোনই ছিল ! বজ্জাতের ধাড়ি ! অমন সুন্দর স্বোয়ামীর সঙ্গে একদিন ঘর করলো না, তার লেগে আবার কান্না ! মহাপাপ না করলে কেউ অমন খারাপ রোগে মরে না, বুঝলে ? এত বড়লোকের মেয়ে, মরলো কিনা গিয়ে আস্তাবলে, গুদাম ঘরে ! কেউ দেখতে গেল না, কেউ মুখে এক ফোঁটা জল দিল না, ঐ পাপের রোগের লেগে ! জানো ?

বৌদি গর্জ্জন করতে লাগলো। রাগে উজ্জ্বলার সর্ব্বাঙ্গ লাল হয়ে উঠছে, আর দেহটা শীতল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কার মরবার কথা বলছে এরা ? উজ্জ্বলার মরার কথা কি ? কিন্তু কেন ? উজ্জ্বলা তো দিব্যি বেঁচে রয়েছে এখানে। ভিড়ের মধ্যে এরা দেখতে পাচ্ছেনা, নাকি ; সে আবার সুস্থ হয়ে মোটাহয়ে গেছে বলে চিনতে পারছেনা ! উজ্জ্বলা ডাকলো—

—এই তো আমি রয়েছি বৌদি, অত গালাগালি দিচ্ছ কেন ? বৌদি !

কেউ শুনছে না ওর কথা। প্রবাল ধমক দিয়ে বড়বৌকে বললো—যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—যাও ! নইলে জুতো মেরে তাড়াবো !

—মরো তাহলে এইখানে ! বলে বড় বৌদি চলে গেল। অন্য দরজা

দিয়ে বৈকুণ্ঠ নিয়ে এলো প্রণবকে। প্রণব এসেই বললো—পিতিমা কৈ বাপি?

—পিতিমা? ঐ যে, ঐ স্বর্গে বাবা! ঐ যেখানে সাঁঝের তারাটি জ্বল জ্বল করছে।

আবার উবুড় হয়ে কাঁদতে লাগলো বড়দা! উজ্জলা প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে বললো—আমিতো কোথাও যাইনি বড়দা, এইতো রয়েছি তোমার কাছেই। ও বড়দা!

নাঃ, বৃথা সব। কেউ ওর কথা শুনলোনা! কি করবে উজ্জলা! নিরুপায়ের মত সেও কাঁদতে আরম্ভ করলো। কেন তার কথা কেউ শুনছেনা? সে কি এদের কেউ নয় আর? তারই জন্য কাঁদছে আর তার কথাই শুনছেনা এরা? অন্তরে কেমন একটা অসহ্য উদ্বেগ বোধ করছে উজ্জলা।

বাস্তুপুরুষ এসে দাঁড়ালেন উজ্জলার কাছে, বললেন,—এসো মা জলা, চলে এসো, এই কুৎসিত স্থানে আর তোমার থাকা উচিত নয়।

—কুৎসিৎ কি? বড়দার বসবার ঘর, বা-রে! না, বড়দা ভাল না হলে আমি যাব না।

—বড়দার জন্য মা-দুর্গার কাছে প্রার্থনা করবে মা, এসো—বলে উনি হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন উজ্জলাকে।

উজ্জলা বললো—ও ঘরটা আপনি খারাপ বল্‌লেন কেন? আমার তো কিছু খারাপ লাগছিল না!

—কারণ, তুমি আবার প্রেতিনী হয়ে উঠেছ—এই দেখ উঠোনের জ্যোৎস্নায় তোমার ছায়া পড়েছে, দেখ, তুমি কত কুৎসিৎ হয়ে গেছ আবার!

উজ্জলা ছায়াটা দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেল।—ওমা, একে?

—তোমারই প্রতিবিম্ব। সূক্ষ্ম শরীরের বাসনার বেগে তুমি পাঞ্চ-ভৌতিক মানব-দেহের অন্নময় কোষ বাদ দিয়ে বাকি চারটি কোষের রূপ ধারণ করেছ, তাই মানুষের মতন না হলেও তোমার দেহ আতি-বাহিক : প্রায় মানুষের আকার বিশিষ্ট অথচ কুৎসিৎ হয়ে উঠেছে। এ দেহ বড়ই কষ্টের মা, বড় যন্ত্রণা দায়ক। বাসনা মুক্ত হও জলা!

জলা করুণ চোখে চাইলো বাস্তুপুরুষের পানে। বললো,—কী আমি করবো দেব?

—তোমার মানব দেহের মৃত্যু হয়েছে, আছে মানুষী বাসন-কামনা, সুখ-দুঃখ। কিন্তু মা, ওসব মায়া, মোহ। তোমার দাদা, তোমার প্রণব, এসব মিথ্যে, তুমি সেই চিজ্জ্যোতির্ময়ী পরমা প্রকৃতির অংশ—তাঁতেই একদিন মিলিয়ে যাবে। তুমি যে দিনকতক মানুষ-জগতের স্বপ্ন দেখেছিলে, সে কথা ভুলে যাও মা!

—ভুলতে পারছিনা প্রভু!—জলা করুণ কাকুতি ভরা কণ্ঠে নিবেদন করলো!

—ঐ চণ্ডীমণ্ডপে জগন্মাতার অধিষ্ঠান; ঐখানে প্রার্থনা কর মা, বল—

সর্ব্ব স্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্ব শক্তি সামন্বিতে।
ভয়েভ্য ত্রাহি নো দেবি, দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

উজ্জ্বলা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে গেল। বাস্তুপুরুষ আবার বলতে লাগলেন—তুমি উচ্চতর লোকে চলে যাবে মা, এমন সাধনা সেখানে গিয়ে করবে যাতে আর না গর্ভ-কারাগারে বন্দী হতে হয়; আবার না কর্মের ভোগে কষ্ট পেতে হয়। তুমি চিৎস্বরূপা, তুমিই চিন্ময়ী, তুমিই এই বিশ্ব-বিধাত্রীর বিশ্বমূর্ত্তি, তুমি তাঁর অনন্ত বিভূতির অংশ, তাঁর বিভূতিতে লয় হয়ে যেও। এই আশীর্ব্বাদ করছি।

কথা গুলো বড় মধুর লাগছিল উজ্জ্বলার, কিন্তু চেয়ে দেখলো, বাস্তুপুরুষ কখন চলে গেছেন। কোথায় উনি গেলেন? হয়তো বড়দার কাছে, কিম্বা উনি এখানে থাকতে পারলেন না, তাই চলে গেলেন। দুঃখতো ওঁরও বড় কম হচ্ছে না! দীর্ঘ দিন এই গৃহরক্ষক হয়ে আছেন উনি, এই বাড়ীর প্রত্যেকটি অনুকণা ওঁর স্নেহপুষ্ট. ওঁরই বা দুঃখের কম কি! কিন্তু তিনি চলে গেলেন কি কারণে হঠাৎ?

. উজ্বলা দেখলো, তার ছোট বৌদি ঐ চণ্ডীমণ্ডপের এক কোনে দাঁড়িয়ে। চমৎকার রূপসজ্জা করেছে ছোট বৌদি, যেন থিয়েটার দেখতে যাবে। কিন্তু কেন? আজই শ্রাদ্ধ চুকেছে, বাড়ীতে এখনো কত গোলমাল, কত কাজ, আর ছোট বৌদি বেড়াতে যাচ্ছে! আশ্চর্য্য তো! যায় কোথায়?

ছোট বৌদি মন্দিরের পাশ দিয়ে খিড়কীর দরজার দিকে যাচ্ছে। দরজাটা খুললো খুব সন্তর্পণে, তারপর ওপাশে গেল। জলাও ওর পেছনে - পেছনে আসছে, দেখলো, ওপাশে পুকুরের বাঁধানো ঘাটের পৈঠায় বসলো গিয়ে ছোট বৌদি। জলাও অন্য একটা পৈঠায় দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো ছোট বৌদির মন খারাপ করছে, তাই এখানে বেড়াতে এসেছে ভাবছিল জলা। সেও কতবার কত দীর্ঘক্ষণ ধরে এই ঘাটে বেড়িয়েছে, সমীরের সঙ্গে খেলা করেছে, স্নান করেছে, সাঁতার কেটেছে। একবার এক সঙ্গে পানিফল তুলতে গিয়ে, ডুবজলের দলে পা-জড়িয়ে ডোবে আর কি, সমীর অনেক কষ্টে তাকে উদ্ধার করেছিল—মনে পড়ছে সেইসব কথা।

কিন্তু কে যেন আসছে চুপি চুপি! বৌদি বেশ সজাগ হযে কাপড়টা

গুছিয়ে চমৎকার একটা ভঙ্গীতে বসলো। পরক্ষণেই এলো একটি ছোকরা: জলা ওকে চেনে, গাঁয়ের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মদনগোপাল। গাঁয়েরই ছেলে, বয়স প্রায় বাইশ, ঐ ছোট বৌদির বয়সীই হবে। ও কি জন্য আসে এখানে?

—ব্যাপার কি গো, আজ এত সকাল সকাল ডাক পড়লো কেন? মদন বললো। ওর রসিকতার ভাব্‌টা ঠিক ধরতে পারছেনা জলা, কিন্তু তখনি দেখলো, বৌদির বাঁ হাতখানা তুলে নিয়ে ও চুমু খেলে। ওঃ! তা হলে ছোটবৌদিও · ছিঃ! জলার অন্তর ঘৃণায় রি রি করে উঠছে, কিন্তু ছোট বৌদি বললো—

—আজ এসোনা গোপাল, ছোট বাবু আজ বাইরে যাবেনা।

· বাঃ একলাটি কি করে রাত কাটাবো আমি! তুমি তো বেশ! তুমি থাকবে স্বামীর কোলে শুয়ে আর আমি কড়িকাঠ গুনিগে। ঐ জন্যেই তো বলে, ছোটর সঙ্গে বড়র পীরিত টেঁকেনা।—মদন অভিমান করে বললো। ওর মাথাটা কোলে টেনে নিয়ে ছোট বৌদি বেশ মধুর স্বরে বললো—তোমাকে তো আমি ছোট মনে করিনা গোপাল! সর্ব্বস্বই দিয়েছি তোমাকে। ছোট মনে করলে কি আর এমন করে তোমার লেগে বসে থাকি?

—দিয়েছ, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কষ্টও দাও খুব।

—কি করি গোপাল, বড় লোকের বাড়ী, বিস্তর লোক জন এসেছে, তাছাড়া আজ ছোটবাবু বাইরে যাবেনা, তোমাকে ঘরে নেওয়ার বিপদ আছে—বুঝছোনা?

—হুঁ, বড় আশা করেছিলাম আজ তোমার মাথাটি বুকে রেখে ঘুমুবো, কেমন চাঁদ উঠেছে দেখছো—'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান।"

—থামো, লক্ষীটি, ! কে কোথায় শুনতে পাবে। বাড়ীতে আজ বিস্তর লোক।

—অত লুকিয়ে পীরিত করতে পারিনে আমি ! এত যদি ভয় তো ডাকো কেন ভাই ? তুমি তো জান, আমি দুঃসাহসী, নইলে তোমার পেটের অসুখের চিকিৎসা করতে এসে বুকে ষ্টেথেস্কোপ্ লাগিয়ে, তোমাকে লাভ করতে পারতাম না, বুঝলে ! চল, আমি যখন এসেছি তখন ফিরে যাবনা কিছুতেই।

—আজকার মত—লক্ষীটি আমার !

—কুন্তী সূর্য্যকে স্মরণ করেছিল—তারপর সূর্য্য কি ফিরে গিয়েছিল, নন্দিতা ?

—না, আমি শুধু আজকার মত—বলছি......।

—বেশ, আর ডেকোনা—বলেই মদন তড়াক করে উঠে চলে যাচ্ছে, ছোট বৌদি ছুটে গিয়ে তার হাত ধরলো, বললো—গোপাল তুমি এত নিষ্ঠুর ! আমি যে আজ কোন উপায় করতে পারছি না গোপাল, কেন বুঝছো না তুমি ?

দুজনেই একটুক্ষণ চুপ চাপ, পরে ছোট বৌদিই বললো—বেশ, এসো এই চণ্ডীমণ্ডপের যে ঘরে পূজোর বাসন থাকে, ঐ ঘরে বসবে, চল !

উঃ—শয়তানী ! মা দুর্গার পবিত্র মন্দির অপবিত্র করবে আজ ! ভগবান ! জলা করুণ কাতর কণ্ঠে ডেকে উঠলো। মনে হচ্ছিল, একগাছা ঝাঁটা এনে ঘা কতক দিয়ে বের করে দেবে ছোট বৌদিকে। কিন্তু গা-টা ভারী হয়ে উঠছে ! রাগের জন্য কিছু একটা পরিবর্ত্তন ঘটছে জলার মধ্যে, অথচ রাগটা জলা সামলাতে পারছেনা।

—কে ? কে ওখানে ? আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো ছোট বৌদি : কে গো ওখানে ?

—তাইতো! বললো মদন,—না নন্দিতা, আজ থাক. আজ আর যাবনা, যাও তুমি।

পলক ফেলার অবসর হোলনা, মদন তিন লাফে পুকুর ঘাট ছাড়িয়ে কোথায় যে গিয়ে পড়লো, কে জানে! জলা বুঝলো, দেহ তার মানুষের দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। তাই ওরা ভয় পেয়েছে। চেঁচিয়ে বললো—

—এ সব কি হচ্ছে ছোট বৌদি! জানতাম না, তুমি এতখানি শয়তানী।

কিন্তু ছোট বৌদি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডাকলো—উষার মা, ও উষার মা!

জ্যোস্না রাত্রি, তবু উষার মা একটা আলো নিয়ে এসে পড়লো,—

—কি হলো ছোট বৌমা?

ওর বুকে জড়িয়ে কাঁপতে লাগলো ছোট বৌদি,—কাঁপতে কাঁপতে বললো—ঘাটে এসেছিলাম, দেখি কী বিকট মূর্ত্তি—উঃ, বাপরে, আমায় ধর, উষার মা, ধর।

—কে? কে দাঁড়িয়ে রয়েছে মা?

—কে আর? উজ্জ্বলা—ছুঁড়ি—না না—এখানে কিছু বলবো না। আমায় ধরে নিয়ে চল।

—তা হবে মা, অকালে অপঘাতে মরেছে, রাম রাম, রাম রাম! এসো মা, এসো!

উজ্জ্বলার হাসি পাচ্ছে খুব। ছোট বৌদিকে নিয়ে উষার মা ভেতরে ঢুকলো, জলাও গেল পিছনে। উঠানে তখন লোক জমে গেছে, শুধুচ্ছে,

—কি? ব্যাপার কি? চোর নাকি?

—না গো, চোর হলে আর ভাবনা কি ছিল! রাম রাম! ঐ যে অত খারাপ রোগে মরলো গো!

—তা হতে পারে! রোগটি তো বাবু ভাল ছিল না! গয়ায় পিণ্ডী দিতে

হবে, বুঝলে বড় বৌদি ?—বললো শৈবাল, তারপর ছোট বৌ কি কি দেখেছ তাই শুধুতে লাগলো,—বললে, একা যাও কেন ঘাটে ? কাউকে সঙ্গে নিতে পার না ? এসো, ঘরে এসো। ছোট বৌদি ছোটদার কাঁধে মাথা দিয়ে ন্যাকামী করছে, বলছে,—আর আমি তোমার অবাধ্য হবনা গো, চাকর ছাড়া আর কখনো ঘাটে আসবো না।

উঃ, অসহ্য ! উজ্জ্বলা একেবারে বাড়ীর বাইরে চলে এল তৎক্ষণাৎ।

নিজের ঘরে শুয়ে ছিল সমীরন. কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছেনা। রাত হয়তো দশ এগারোটা হবে। হাত ঘড়িটা আছে টিপয়ে ; কিন্তু দেখতে হলে আবার উঠতে হবে ; কে করে অত হাঙ্গামা ! সমীর পাশ ফিরে বালিশে মাথা গুঁজে শুলো। কত কথাই যে মনে আসছে ! কত সুখের দুঃখের কথা—কত আশা আকাঙ্খার কথা, কত বিষাদ বেদনার কথা। না, ঘুম আজ আর আসবেনা।

—উজ্জ্বলা !—সমীর আপন মনেই বলে উঠলো। বাবার কথাগুলো মনে পড়ছে,ঃ "গতাসূন গতাসূংশ্চ নাম্নু শোচন্তি পণ্ডিতা"ঃ—হ্যাঁ, যে গেছে তার জন্য পাণ্ডিতরা শোক প্রকাশ করবেন না ; করা উচিত নয় ! কিন্তু মানুষ যে শুধু পণ্ডিতই নয়, শুধু গীতাই তো সে পড়েনা ; সে তার হৃদয় দিয়ে এই মৃত্যুশীল ধরণীকে ভালোবাসে, ভালোবাসে প্রেম ভালোবাসার পাত্রীকে, ভালোবাসে সুখকে এবং দুঃখকেও। সুখের অন্ত হলে মানুষ কষ্ট পায়, দুঃখের অন্ত হলেও কি কষ্ট পায় না ? পায়। উজ্জ্বলাকে জীবনে না পাওয়ার দুঃখ অনেক, আজ আর সে দুঃখ হয়তো নেই, উজ্জ্বলা গতাসূ ; কিন্তু তাকে না পাওয়ার ব্যথাও তো আর রইল না ! যে চলে

গেল এই পৃথিবী ছেড়ে, তাকে পৃথিবীর মত করে না পাওয়ার জন্যঅন্তরের যে অভিমান, ক্ষোভ, বেদনা, তার অর্থ কি? হয়তো উজ্জ্বলা লোকান্তরে বেঁচে আছে। তাতে কি, লাভ সমীরের? না তাতে সমীরের কোনো লাভ হবে না।—উজ্জ্বলাকে আজ সে শুধু হারালো নয়, উজ্জ্বলার উপর মান অভিমান করার অধিকারটুকুও হারালো। উজ্জ্বলা তাকে ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে, তার সেই তিরস্কারের রক্তিম আস্বাদটুকুও আর সমীরের অন্তরে লাগবার উপায় নাই। ভাববার উপায় নাই - যে উজ্জ্বলা তার উপর অভিমান করেছে। উজ্জ্বলা নাই।

না, নাই বলে উজ্জ্বলাকে নাস্তি করে দেবে না সমীর। বাবার কথাই সত্য হোক! আছে, উজ্জ্বলা আছে, এ লোকে না থাক্, দূর দূর নীহারিকা লোকে তার পূজার ঘরে আছে, হয়তো আসবে, না হয় সমীরকেই ডেকে পাঠাবে। সে যদি না থাকে, তবে সমীর বেঁচে থাকবে কি করে? না, তার চেয়ে সমীর বিশ্বাস করবে, উজ্জ্বলা বেঁচেই আছে—আছে ঊর্দ্ধলোকে, প্রবাসে। সমীর সেইখানে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে। পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে ধার্মিক পিতা মাতার ঔরসে জন্মেছে সে, তার প্রাক্তন কর্ম হয়তো খারাপ ছিল, তাই এ-জন্মে উজ্জ্বলাকে পেল না, কিন্তু পাবে, যত জন্ম পরে হোক, পাবে সে তাকে, নইলে বৃথাই এই গ্রহতারা সমন্বিত নিয়মানুবর্তিত বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা করেছে মানুষ; বৃথাই তাঁকে খুঁজবার জন্য সাধু সন্ন্যাসীরা বন গুহা আশ্রয় করে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করে। বৃথাই ঋষিদের লেখা বেদ, পুরাণ, উপনিষদ,—সব তাহলে মিথ্যা! কিন্তু কিছুই মিথ্যা নয়। হে বিশ্বদেব, বলে দাও, এই লোকের পরে লোক আছে। গ্রহের পর গ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ডের পর অসংখ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে, কালের পরে অখণ্ড কাল, অনন্ত মহাকাল আছে, যে কালের করুণা-সাগরে আমার উজ্জ্বলা আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে! বলো

হে বিশ্বের অধিদেবতা, জীব অনন্ত,জীবন অনন্ত, সৃষ্টি অন্তহীন প্রবাহের স্পন্দন-তরঙ্গ।* "অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানেতাদৃশানন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডানি (১) জ্বলন্তি। আমি এই পার্থিব দেহ মুক্ত আত্মা, তোমার প্রতিবিম্ব কিম্বা তুমিই আমি, আমি এই দেহ পরিত্যাগ করতে পারলেই তোমার স্বরূপ সত্ত্বা লাভ করবো, আমি উজ্জলার কাছে যেতে পারবো, তাকে দেখতে পাব, আমি তার দেব-দেহ কোলে নিয়ে তোমার নামগান করে, লোক লোকান্তরে তোমার সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে বেড়াবো।

কৈ! কিছু তো তুমি বললেনা? কোন অনুভূতিই জাগলোনা আমার,—তবে কি সব মিথ্যাই! মিছেই আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আত্মার অমরত্ব স্বীকার করবার জন্য গীতার শ্লোক আওড়াই? দেখলেই তো হয়। মৃত্যু কি এত অনাকাঙ্ক্ষানীয়? একদিন তো মরতে হবেই, আজই বা মরে দেখলো! হ্যাঁ সমীর মরেই দেখবে, মৃত্যুর পরে কি আছে, কোথায় যায় মানুষ, কিম্বা চিতাতেই তার সমাপ্তি। সমীর উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। অন্তরে একটা অদ্ভুত স্পন্দন অনুভব করছে সমীর, কে যেন বলছে, মরো, মরলেই এখনি উজ্জলাকে দেখতে পাবে, আমাদের দেখতে পারে, আমারা তোমার বন্ধু। মরো!

সামান্য একখানা ছুরির দরকার এই নশ্বর দেহটাকে নষ্ট করবার জন্য কিন্তু তাও যে নেই সমীরের ঘরে। এক দানা আফিম, এক টুক্‌রো তুঁতে, না, কিছু নেই। মরবে কি করে সমীর? হা-হাঃ করে কোথায়

* সংখ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশেষাং ন কদাচন — দেবীভাগবৎ

(১) মহানারায়ণ উপনিষদ্

যেন কে হাসছে, বলছে—ভয় পাচ্ছ কেন? মরণ তো একটা স্পোর্ট একটা খেলা, মরলে এ দেহটায় আর বাঁচতে পারবেনা, কিন্তু আরও জোরালো, সুন্দর, নীরোগ দেহ, পাবে, এই দেখ ঠিক এমনি সুস্থ দেহ।

কে কথা বলছে? সমীর কান দিয়ে সে কথা শুনছে তো! নাকি অন্তরের অতিন্দ্রিয় কর্ণে কথা বলছে কেউ! হাঃ হাঃ হাঃ আবার হাসি! সমীর বাইরে চেয়ে দেখলো, বাড়ীর পিছনের বুড়ো কাঁটাল গাছটায় একটি মেয়ে, বয়স বাইশ তেইশ, হাতে এক গাছা দড়ি নিয়ে গাছের ডালে বাঁধছে আর সমীরকে বলছে,—এই দেখ, কত সোজা উপায়। তোমার ঐ হোল্ডলের চামড়ার ফিতেটা নিয়ে এসো, এসে এইখানে ঝুলে পড়, দশ মিনিটও লাগবেনা, উজ্জ্বলাকে দেখতে পাবে।

আশ্চর্য্য হয়ে গেল সমীর, কথাগুলো ও দিব্যি শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কান দিয়ে শুনছে না, শুনছে অন্তরের অতিন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তি দিয়ে। বাহিরে সুন্দর জোৎস্না, সমীর অন্য জানালার পানে চাইল,—ও কি ও! খানেক হাত দূরে একটা সরকারী ইন্দারা আছে, তার বাধানো মাথায় দাঁড়িয়ে একটা যুবক গলায় মস্ত একখানা পাথর বেঁধে ঝাঁপদিল কূয়োর মধ্যে, শব্দ উঠলো ঝপাৎ! আহা! মরে যাবে লোকটা! সমীর চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু কে যেন কোথায় হাসছে, বলছে—হিঃ হিঃ হিঃ কত সোজা উপায় দেখছোনা! এসো, তোমার উজ্জ্বলাকে এখনি দেখতে পাবে, কুচ্ছিৎ রোগে ব্যাধিতে ভরা ঐ দেহটানা ফেলে দাও বুঝলে সমীর?

সমীর স্বপ্ন দেখছে, না জেগে আছে বুঝতে পারছে না, স্বপ্নই দেখছে হয়তো, কিন্তু ও তো শুয়ে নাই, আছে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। ধানবাদ থেকে আনা বিছানার হোল্ডোলটার উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমীর। স্বপ্ন কি করে হবে? হোলডলের চামড়ার ফিতেটা টান

দিয়ে খুলে নিল সমীর. মৃত্যু সত্যি একটা স্পোর্ট, খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে যুদ্ধ চলছে, এওতো একটা খেলা! কতলোক জীবন দিয়ে ঐ খেলায় মেতেছে, মরণের মহা মহোৎসবে লেগেছে তারা। মৃত্যু তো প্রতি ক্ষণেই ঘটছে পৃথিবীতে। সমীরও দেখবে, মরে সে কোথায় যায়। আর উজ্জ্বলাকে যখন সে ইহ জীবনে পেলই না, তখন পৃথিবীর এই জীবনে দরকারই বা কি তার?

আশ্চর্য্য একটা অনুপ্রেরণা জাগছে সমীরের মনে। চামড়ার ফিতাটাকে ও কড়ি কাঠে বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগলো; উঁচু কড়িকাঠ, নাগাল পাচ্ছেনা, টিপয়টার উপর দাঁড়িয়ে টেনে ঠিক জায়গায় আনেছে।

* * * *

ঘর থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বলা তার ছোট বৌদির কাণ্ডটার কথাই ভাবছিল, একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। এখান থেকে দিদিমাদের বাড়ী খুব কাছে। হঠাৎ উজ্জ্বলা দেখতে পেল, সুদূর আকাশ থেকে একটি নীলাভ জ্যোতিরেখা নেমে আসছে দিদিমার বাড়ীর আকাশে। একটা মৃদু সৌরভে সমস্ত বায়ুমণ্ডল পূর্ণ হয়ে উঠলো; সে গন্ধ পৃথিবীর নয়, অতিন্দ্রিয়ের অনুভূতিগম্য একটি সূক্ষ্ম-সত্ত্বা। জলা আশ্চর্য্য হয়ে গেল. কি ওটি? কে উনি? নির্নিমেষ চোখে দেখছিল জলা। নীলাভ জ্যোতির আয়তন অতিক্ষুদ্র, তার উজ্জল জ্যোতিটাই বড় দেখাচ্ছিল, কিন্তু জলা দেখতে পেল যেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী একজন অপূর্ব্ব দর্শন পরম লাবণ্যময় পুরুষ বিদ্যুৎবেগে নেমে আসছেন। কোথায় আসছেন উনি? দিদিমার ঘরেই নাকি? দেখতে হবে, ভেবে উজ্জ্বলা ঐ পথেই যাচ্ছে, হঠাৎ নজর পড়লো, অশত্থ গাছটার ওদিকে দু'জন অতি কদর্য্য মূর্ত্তির অসুর, ঠিক বইএ আঁকা রাক্ষসের ছবির মত চেহারা।

ভয়ে কেঁপে উঠলো জলা। অসুর দুজন তারই পানে তাকাচ্ছে,

জ্বলন্ত চোখ তাদের, অতি ভয়ানক দেখাচ্ছে ; কোন দিকে পালাবে ঠিক করতে পারছে না জলা। ওদের একজন বললো,—এই ছুঁড়ি, এদিকে আয়। আয় বলছি, ছুটে আসছে জলাকে ধরতে।

কোন দিকে পালাবে জলা ? দিদিমার বাড়ীর দিকে যাবার পথটা ওদের একজন আগলে দাঁড়ালো, আর একজন আসছে জলাকে ধরতে। কি কুৎসিৎ দুর্গন্ধ ওর গায়ে! জলা প্রাণপণ বেগে দৌড়ালো, কোন দিকে যাচ্ছে ঠিক নাই ; ও কিছুতেই চার পাঁচ হাতের বেশী উপর আকাশের দিকে উঠতে পারছেনা। হোল কি তার! সে না চন্দ্রলোকে গিয়েছিল ? সেই সূক্ষ্ম শরীর, সেই তীব্র গতিবেগ কোথায় তার ? অসুরটা জলাকে প্রায় ধরে ধরে, জলা একটা নালা ডিঙিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়লো, প্রেতটা বলছে—সুখে থাকবি, খুব সুখে রাখবো, গাইরি বলছি, আয়!

প্রেতটা ওকে ধরতেই আসছে। জলাও কি প্রেতিনী হয়ে গেছে নাকি ? হ্যাঁ তার দেহ তো এমন কদর্য্য আর ভারী ছিলনা। হায়! হায়! কেন সে ছোট বৌদি আর মদনকে ভয় দেখাতে গিয়েছিল ? ছোট বৌদি নষ্ট হলে কি তার বয়ে যাবে ? ছোট বা বড় বৌদির নষ্টামিতে তো জলার কিছু এসে যায় না। যে খারাপ হবার সে তার প্রাক্তন আর ইহ জীবনের কর্মানুযায়ী ফল পাবেই। জলা কেন গেল ওকে ভয় দেখাতে ? জলার মনের রাগ, দ্বেষ, হিংসা, বাসনার প্রবল আকর্ষণ তাকে প্রেতিনীতে পরিবর্ত্তিত করেছে। প্রাণপণে ছুটছে আর ভাবছে জলা, দুঃখে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে ; আর ছুটতে পারছেনা সে ; আকুল আর্ত্তস্বরে কেঁদে উঠলো—মা, মাগো! কিন্তু দাঁড়ালে চলেনা। জলা ছুটছে আর বলছে "ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ ত্বমেব গতির্দেবি নিস্তার নৌকা, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি" ছুটছে আর বলছে।

পিছনে তাকাবার সময় নেই, কিন্তু জলা অনুভব করলো, প্রেতটা অনেক তফাতে পড়ে গেছে, কারণ তার গতি এখন শুধু দ্রুত নয়, আকাশের উচ্চ মার্গে সে উঠে যাচ্ছে এখন। নীচে চেয়ে দেখলো, তাদের গ্রামের শ্মশানের আকাশে সে এসে পড়েছে। বুড়ো অশথ গাছটার তলায় কারা যেন। কেউ আবার মরলো, পেড়োতে এসেছে হয়তো। ক্লান্ত জলা একটু বিশ্রাম করবার জন্য গাছের উঁচু ডালের নরম পাতার উপর ঠিক রঙিন একটি প্রজাপতির মত বসলো এসে। ও বুঝেছে, তার শরীর আবার উর্দ্ধলোকের দেবপিণ্ডতে পরিণত হয়েছে ; সে দেহ আর পার্থিব ক্ষিতি তত্ত্বের দর্শনীয় নয়। নির্ভয়ে বসে জলা নীচের দিকে চাইল, দেখলো, নীচের লোকগুলো প্রেত, মানুষ নয়। ওরা আপনার আনন্দে হাসছে, খেলা করছে, মারামারি করছে, খাচ্ছে অতি নোংরা বস্তু, মরা মাছের কাঁটা, গুগলীর খোসা, সাপের খোলোস।

জলা চেয়ে দেখে শিউরে উঠলো। তাকেও এখনি এই জঘন্য জায়গায় আসতে হোত। মা মহাশক্তি রক্ষা করেছেন। কড়যোড়ে জলা আবার প্রণাম করলো মা দুর্গার উদ্দেশে। কিন্তু শুনতে পাচ্ছে, ঐ নীচের একজন বলছে,—জানিস্, আঁজ একটা সঙ্গী আঁসবে আমাদের, বেঁশ ভাঁলো পৈরেত ; আত্মহত্যে কঁরছে, কাল তার মাংসটা খেতে পাওয়া যাবে।

—ধুৎ! আত্মহত্যার পেরেত গুলো নিজের মাংস নিজেই খেয়ে নেয় ; কি দারুণ খিদে যে পায় ওদের! একটা ফোঁটা মাংসের আশা করিস্ না। কে আসছে কে রঁ্যা ?

—সমীরন! ওকে আনতে গেছে মানুদা আর গোলাপী ; এই রাত দুপুরেই এসে পড়বে।

—ও, তাই নাকি? সমীরনকে পেলে তো ভারী সুবিধে হবে

অমন পণ্ডিতের ব্যাটা, ও যদি দলে আসে তো একবার তালচিংড়ির ভূত শালাদের দেখে নি।

জলা শুনতে পেল কথা গুলো। ভয়ে গা ওর শিউরে উঠছে, সমী আত্মহত্যা করবে? কেন? কিসের জন্য? যেমন করে হোক ওকে বারণ কর্ত্তে হবে। জলা আর মুহূর্ত্ত দেরী করলো না। ত্বরিতে আকাশ পথে এসে দাঁড়ালো সমীরনের ঘরের টবিলের কাছে। হ্যাঁ, সত্যি সমীরন টিপয়ে চড়ে কড়িকাঠে চামড়ার ফিতে বাঁধবার চেষ্টা করছে। ব্যাকুল হয়ে জলা বললো—ওকি? কি করছো সমী? তাড়াতাড়ি ফিতেটা কেড়ে নিতে গেল সমীরের হাত থেকে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না; ওর হাতখানা ঠিক যেন চালের-ফুটো-দিয়ে আসা একটি আলোর রেখার মত। সমীরের স্থূল শরীর আর ফিতে ওর হাত থেকে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। কি করবে জলা? কি করে সমীরকে রক্ষা করবে? জলা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করলো—সমী, আত্মহত্যা মহাপাপ, এ কাজ করোনা সমী! কিন্তু কৈ? সমী কিছুই শুনছে না। কিছুক্ষণ আগের সেই প্রেত-দেহটা থাকলে হয়তো জলা দেখা দিতে পরতো সমীরকে। কি উপায় হবে? জলার মন এক অসহ্য ব্যাকুলতায় হাহাকার করে উঠছে। তার সমী তারই সম্মুখে আত্মহত্যা করছে, আর জলা কিছু করতে পারছে না।

—এই যে, এই দেখ, কিছু কষ্ট নেই, বললো সেই কাঁটাল গাছের মেয়েটা। ও দিকে সেই কূয়োর প্রেতটা ঝাঁপ দিচ্ছে জলে, বলছে, দেখ সমীর, কত সহজে মরতে পারা যায়, দেখ!

—ও মা, না না না, জলা চীৎকার করে উঠলো,—এ রকম মরণ বড় কষ্টের সমী, এতে তোমার সূক্ষ্ম আত্মা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে, তুমি প্রেত হয়ে ঘুরতে থাকবে, সমী! সমী!

কিন্তু সমী বেশ নিশ্চিন্ত, দৃঢ় সঙ্কল্প, ফিতেটা কড়ি কাঠে বাঁধছে সে, এবার গলায় পরাবে। জলা ভীষণ চীৎকার করে উঠলো,—খবরদার সমী ! মা—ওমা········

জলার কাছে এসে দাঁড়ালেন সমীরের মা। কাঁদছেন। জলা বললো—কি করবো জ্যেঠাইমা ? বাঁচাও, ওকে বাঁচাও, ওযে আত্মহত্যা করছে জ্যেঠাইমা !

—আমার সে ক্ষমতা নেই মা জলা, আমি ওর মনে প্রেরণার স্পন্দন তুলতে পারবো না। তোর কথাও ও এখন ভাবছে না, তবু তুই আরো উঁচু শ্রেণীর আত্মা ; তুই ওর মনে ভালো কথা জাগাবার চেষ্টা কর, আমি বাইরের ঐ শয়তান প্রেত দুটোকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি। উনি চলে গেলেন !

সমীর ফিতের ফাঁসটা ঠিক করছে। জলা তার সূক্ষ্ম শরীরের সবশেষ শক্তি দিয়েও এক চুল নড়াতে পারলে না সেই স্থূল ফিতে। কিন্তু তার মনের অসীম শক্তি আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকছে। সমীর যেন একটু থামলো। উৎসাহিত হয়ে জলা চিন্তা করতে লাগলো, সে যেন তাদের খিড়কীর পুকুরের জলে ডুবে যাচ্ছে, আর সমী, তাকে টেনে তুলছে। জলার চিন্তা প্রগাঢ় হয়ে উঠলো। অনেক কষ্টে সমীর তুললো উজ্জ্বলাকে, ডাঙ্গায় এনে বললো—জল খেয়েছিস ?

—হুঁ ! বললো—উজ্জলা।

—আয়, বমি কর—বললো সমীর। উজ্জ্বলা হাসিতে ফেটে পড়ছে, বমি কেন করতে যাবে সে ! জল দু' ঢোক খেয়েছে তো কি হয়েছে ! ঠিক যেমন ঘটনাটি ঘটেছিল।

আশ্চর্য্য হয়ে জলা দেখলো, সমীর থেমেছে, হাতের ফিতেটা গলায় না লাগিয়ে কি যেন ভাবছে। জলা আরো দৃঢ় ভাবে চিন্তা করতে লাগলো.

তাকে জল থেকে তুলে সমীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এত ক্লান্ত যেন নড়তে পারছেনা। আস্তে এসে বাঁধানো ঘাটের উপর শুয়ে পড়লো; উজ্জ্বলা এসে বসলো তার কাছটিতে।—সত্যি, সমীর ফিতেটা কড়িকাঠ থেকে খুলে নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুলো। ঐ বিছানাটাকেই জলা ঘাটের পৈঠারূপে চিন্তা করছিল। সমীর শুলো, জলাও এগিয়ে এল তার কাছে। সমীর চোখ বুজে আছে, ক্লান্ত খুবই, যেন হাঁপাচ্ছে! কিন্তু ঘুম আসছে ওর—ঘুমাও সমীর ঘুমাও! জলা পাশে বসে চিন্তা করতে লাগলো। ঘুমিয়েই গেল সমীর।

জলা আবার চিন্তা করতে লাগলো, সমীর যেন উঠে বসে তার সঙ্গে কথা বলছে, কত রকমের ছেলেবেলার গল্প, কত আনন্দময় স্মৃতির কথা। জলা দেখলো, সমীরের দেহ থেকে একটা ছায়াময় দেহ আস্তে বেরিয়ে আসছে। প্রাণ-মন-জ্ঞান-আনন্দময় কোষে গঠিত ছায়াদেহ, রঙ্ মোটে, উজ্জ্বল নয়। কিন্তু চোখের জ্যোতি ভারি সুন্দর। জলা মুগ্ধ হয়ে বললো,—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে সমী তোমায়! এই সুন্দর দেহটাকে নষ্ট করতে যাচ্ছিলে? তোমার মত বোকা আর নাই।

—কিন্তু তোমার কাছে যেতে পারতাম যে জলা! সমীর জবাব দিল।

—না সমী, আত্মহত্যা মহাপাপ। তোমাকে যে নির্দ্দিষ্ট দিনের জীবন এই পৃথিবীতে ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে, সুখে দুঃখে তাই ভোগ করবে তুমি, আর যে স্বাধীন ইচ্ছাটুকু তোমায় দিয়েছেন ঈশ্বর, তাই দিয়ে তাঁর প্রীতিকর কাজই করবে। তোমার খুসীর খেয়াল ভগবানের রাজ্যে অচল; সেখানে সব নিয়মানুবর্ত্তী ব্যবস্থা।

—কিন্তু তোমাকে তো পেলাম না উজ্জ্বলা? তুমি যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে।

—কেন পাবেনা ? আমি তো মরি নাই ! মৃত্যু নাই। আমার স্থূল দেহের মরণ হয়েছে, তাতে কি ? আমি আছি, এই তো রয়েছি। কত দূর নীহারিকাপুঞ্জে আমি যেতে পারি, আবার তোমার কাছেও আসতে পারি। লক্ষীটি, তুমি পুরুষ মানুষ, বই পড়ে সব জেনে নিও, দেখবে, ঋষিরা সব লিখে গেছেন, সব কিছুর মীমাংসা করে দিয়েছেন।

—জেনে কি লাভ উজ্জ্বলা ! ও সব জেনে কি হবে আর ?

—ছিঃ সমী, একথা তোমার মুখে মানায় না। জ্ঞানের থেকে বড় কিছু নাই। বিশ্বের যিনি সর্ব্বস্ব, তিনি জ্ঞানময়, চৈতন্যময় তাকে জানতেই হবে। কর্ম ভক্তি জ্ঞান দিয়ে তাকে জানাই মানব ধর্ম। তোমার স্বাধীন ইচ্ছাটুকু দিয়ে তাঁর প্রীতিকর কাজ কর, সেইটাই তাঁহার পুজা ; প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান লাভের শক্তি দেবেন। আত্মহত্যা করে ফাঁকি দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া চলেনা, সমী !

—তিনি কি সত্যি আছেন ?

—হ্যাঁ, তিনি আছেন, তাই তুমি আছ, আমি আছি, এই বিশ্ব তাঁতেই বিধৃত। তাই আমাদেরও বিনাশ নাই। তিনি অব্যয় এবং অবিনশ্বর। শ্রীভগবান বজ্র নির্ঘোষে বলছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

আত্মা অমর, অবিনশ্বর, দেহ-মুক্তআত্মা আরো বেগশালী, আরো শক্তিমান। কিন্তু সমী, দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্য তোমাকে তো দেহ দেওয়া হয়নি ; দেহের কাজ শেষ না করে দেহ ত্যাগ করা চলে না ; তাতে তিনি দুঃখ পাবেন আর তোমার ব্যভিচারী গতি লাভ হবে, সে বড় ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক। এরকম করলে তোমাকে ঐ সব কুৎসিৎ কদর্য্য নিম্ন-

শ্রেণীর প্রেতের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হবে, নরকে যেতে হবে,—বুঝলে ? সমী

—কিন্তু তোমার অভাবে এখানেই তো আমার নরক ভোগ করতে হবে উজ্জ্বল !

—কেন ; আমার অভাব কোথায় ? আমি তো রয়েছি। তোমার মত ডাল, ভাত খেতে অবশ্য পারবো না, তবে তোমার চেয়ে ভালো জগতে আছি। আর তুমিই বা কদিন থাকবে এখানে ? বড় জোর পঞ্চাশ বছর। অখণ্ড কালের তুলনায় সে কিছুই নয়। আমরা, তুমি, আমি সবাই সেই অখণ্ড কালস্রোতের যাত্রী। তোমার সময় হলে আমি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো সমী !

—কিন্তু উজ্জ্বল !

—না, কোন কিন্তু নাই, তুমি থাকো এইখানে ; দেহ দিয়ে ঈশ্বরের কাজ করে চল, ঊর্দ্ধগতি লাভ করবার শক্তি অর্জন কর। আজ আমি যাই সমী, আবার আসবো ; আজ সোমবার, ঠিক পরের সোমবারেই আসবো।

—আমি ধানবাদে চলে যাবো উজ্জ্বল !

—বেশ তো, যাবে, আমি এখন যেখানে খুশী যেতে পারি। ধানবাদেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো গিয়ে ; যাই আজ, ঘুমাও লক্ষিটি, ঘুমাও।

*　　*　　*　　*

পদ্ম গন্ধের মত সৌরভে ঘরখানা ভরে উঠলো। জলা পিছনে তাকিয়ে দেখলো, তার মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সমীরের সঙ্গে ওর কথা শীগ্রি শেষ করতে ইঙ্গিত করলেন। কথা শেষ হতেই হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলেন।

—সমীর আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল. মা, কী সর্বনাশ যে হোত এখুনি !

—জানি মা, আমি দেখছিলাম, তুই সমীরকে সৎ প্রেরণা দিতে পারিস্ কিনা। দেখলাম, সমীরের উপর তোর ভালবাসা নিষ্কাম, এই ভালবাসাই একদিন শুদ্ধ প্রেমে রূপান্তরিত হবে, সেদিন তার নাম হবে প্রেম, যা লাভ হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়।

জলা চুপ করে রইল একটুক্ষণ, তারপর ব্যগ্র হয়ে বললো,

—আবার সমীর তো কিছু করে বসবেনা মা ? আমরা যে চলে যাচ্ছি ?

—না ; সমীর বুদ্ধিমান, ঘুম ভেঙেই নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে লজ্জায় পড়বে। চল মা, এবার তোকে বহুদূরে যেতে হবে.—বলেই মা তার হাত ধরে ঊর্দ্ধ আকাশে উঠে চললেন। আলোক-শিখার মত তাঁর দেহ, গতিও তদনুরূপ।

—দিদিমাকে একবার দেখে যেতে ইচ্ছে করছে মা ! বড় ভালবাসেন উনি আমায়।

—আয়, দেখ এইখান থেকেই।

জলা নীচের দিকে চেয়ে দেখলো, গরমের দিন, তাই তুলসী তলায় মাতুর বিছিয়ে ছোট মেয়েটিকে কোলের কাছে নিয়ে দিদিমা ঘুমুচ্ছেন। কী সুন্দর তাঁর ঘুমন্ত মুখশ্রী ! দেবীর মত মনে হচ্ছে।

—উনি কি সত্যি মানুষ মা, নাকি দেবী !

দেবীই, তবে মানুষের জগতে ওঁর কিছু কর্মফল ছিল, তাই আসতে হয়েছে ; এই জন্মেই সে ভোগ শেষ হয়ে যাবে ওঁর। তারপর ঊর্দ্ধতর লোকে যাবেন।

—তুমি কোন লোক ছিলে মা ?--জলা প্রশ্নটা করেই আবার বললো, আমি তোমার কাছেই থাকবো তো ?

—আমাকে স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে থাকতে হয় মা। তুই কিন্তু প্রথম স্তরে থাকবি। তোর এখনো পৃথিবীর অনেক আকর্ষণ রয়েছে। আমিও তোর বাবার জন্য স্বর্লোকের পঞ্চম স্তরে যেতে পারিনা।

—বাবার জন্য তোমাকে তাহলে ঐখানেই থাকতে হবে মা? কত দিন থাকতে হবে?

—ঠিক নাই মা, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি কর্তা, সেটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।—না মা, ভুল বলছি। তিনি করুণাময়। তাঁর শুভ ইচ্ছা সব সময়েই রয়েছে, কিন্তু তিনিও নিয়মবদ্ধ। তাই সেটা নির্ভর করে তোর বাবার সৎ কর্মের উপর, আর সাধনার উপর,- বলে মা নিজের গতি অকস্মাৎ বাড়িয়ে দিলেন। জলা সাধ্যভোরি ছুটেও ওঁকে ধরতে পারছেনা। চেঁচিয়ে বললো,—মা, দাঁড়াও, আমি পারছিনা যেতে।

—আয় পিছনে—বলে মা ক্রমাগত চলতে লাগলেন। ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধতর আকাশ, ঘন মেঘ পুঞ্জ ছাড়িয়ে পার্থিব ধূলিকণার মালিন্য মুক্ত হয়ে আকাশ যেখানে শুধু নির্মল বায়ুতে নিবিড় নীলিম, মা সেই ঊর্দ্ধলোকে উঠে যাচ্ছেন। নীচে তাকাবার সময় নাই জলার, মা দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে যাবেন। ভয়ে সে যত দূর সম্ভব তার গতি বাড়াবার চেষ্টা করছে; কিন্তু দেখতে পেল, চন্দ্রদেবের প্রচণ্ড আকর্ষণে পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর, নদী, তড়াগ উদ্বেল আকুল হয়ে উজানে উঠছে। আর শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোৎস্না-ধারায় অগণিত সূক্ষ্ম আত্মা মহাকাশ থেকে পৃথিবীর আকাশে পড়ছে গিয়ে। আকর্ষণ আর বিকর্ষণ এক সময়েই চলেছে চন্দ্রদেবের। জলা অবাক হয়ে দেখছে, গতি তার খানিকটা মন্দীভূত হয়ে এসেছে, অকস্মাৎ দেখতে পেল অত্যুজ্জ্বল মুক্তার মত একটি সূক্ষ্ম জ্যোতিরেখা তার সর্ব্বশরীরে এসে পড়লো আর সেই জ্যোতিরেখা অবলম্বন করে জলা অতিবেগে উপর

দিকে উঠতে লাগলো। এখন সে বুঝতে পারলো, পৃথিবীর আকর্ষণ আর চন্দ্রের বিকর্ষণের প্রভাবে তার গতি হ্রাস হচ্ছিল। কে ঐ মুক্তালোক-দাতা, যিনি নিজের জ্যোতিপ্রভাবে তাকে রক্ষা করলেন? কে ইনি! জলা ভাবছে আর উপর দিকে উঠছে, তীব্র সে গতি, বহু বহু উর্দ্ধে একটি পরমোজ্জ্বল গ্রহ থেকে আসছে সেই জ্যোতিটি, জলা যেতে যেতে বার বার ঐ গ্রহকে নমস্কার করতে লাগলো।

কয়েক মুহূর্তেই সে মা'র কাছে গিয়ে উপস্থিত হোল। মা ওর জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কাছে আসতেই বললেন—দেবগুরু বৃহস্পতি তোকে রক্ষা করেছেন মা, প্রণাম কর। জলা আবার করযোড়ে প্রণাম করে বললো,—আমি কি কোন বিপদে পড়েছিলাম মা?

—হ্যাঁ, তুই আবার সমীরের কথা ভেবে উতলা হয়ে উঠেছিলি আর ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীতে চন্দ্রের জোয়ার আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর উপর মোহ থাকলে চন্দ্রদেবের রশ্মি তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় মা, সাবধান হোস! সমীরকে ভালোবাসিস, কিন্তু সমীরের জন্য পৃথিবীতে জন্মে আর কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে উর্দ্ধলোকে থেকে তার জন্যে প্রার্থনা কর, নিজের আত্মার উন্নতি কর, তারও উন্নতি হবে।

জলা অত্যন্ত বিস্মিত হোল মার কথা শুনে। সত্যি সে মা'র সঙ্গে কথা বলতে বলতে সমীরের কথা ভাবছিল,—হয়তো সমী জেগেছে, হয়তো আবার একটা কিছু কাণ্ড করে বসেছে, এই ভেবে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তখন। মা তো ঠিকই জানতে পেরেছেন। তাই বললো—

—সত্যি ভাবছিলাম মা আবার যদি কিছু করে বসে!

—না; ওটা সাময়িক বিকার মানুষের। আগে যারা আত্মহত্যা করে মরেছে, তাদের নিকৃষ্ট আত্মারা সুবিধা পেলেই অন্য মানুষের

মনে আত্মহত্যার প্রেরণা সঞ্চালন করে। ওকে পৃথিবীর ডাক্তারী শাস্ত্রে তাই একটা রোগ বিশেষ বলেছে।

—আবার যদি তারা এসে ওকে ঐ সব করতে বলে মা? জলা ভয়ে ভয়ে বললো।

—ওর নিজের মা রয়েয়েছেন. তিনি দেখবেন ; তার পরে যাতে ওরা কিছু করতে না পারে তার জন্যে তো তুই অনেক শাস্ত্র কথা শুনিয়ে এলি মা।

—হ্যাঁ মা, আশ্চর্য্য! আমি ওসব কথা নিজেই তো জানতাম কি করে যে ওকে বললাম?

মা মৃদু হেসে বললেন, আমি তোর মনের ভেতর ঐ কথাং বলে দিচ্ছিলাম জলা. ওসব কথা আপ্তবাক্য। আর এই সূক্ষ্ম জগতে স্থূল ভাষায় কথা বলার পরিশ্রম করতে হয়না। বলবার কথা মনোময় কোষে জেগে উঠলেই ইচ্ছাদ্বারা অন্যের মনোময় কোষে জেগে ওঠে। বহুদূর থেকেও তাই কথা বলা যায় এই আত্মিক জগতে।

ওরা চলছিল, উজ্জলা দেখলো, অত্যুজ্জ্বল মুক্তারশ্মিটি চন্দ্রলোক পার হয়ে আরো উর্দ্ধলোকে চলে গেছে। মাকে শুধুলো,—ঐ লোকে কারা বাস করে মা?

—ওখানে বাস করবার মত যাঁদের কর্ম, জলা। যোগী, ঋষি, সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি তাঁরা।

—আরো উপরে লোক আছে মা?

—অনেক, অনন্ত। তবে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ লোক হচ্ছে ধ্রুবলোকে। তুই প্রেম সাধনায় একদিন না একদিন যেতে পারবি সেখানে মা, আশীর্বাদ করি।

—তুমি যেতে পার মা?

—না মা, আমার অতখানি উন্নতি হয়নি। আবার হয়তো স্বর্গভোগ শেষ করে আমাকে পৃথিবীতেই যেতে হবে, হয়তো এবার নিতান্ত গরীবের ঘরে জন্মে নিজকে আরো শুদ্ধ, আরো নির্মল করতে হবে। তোর অনেক জন্মের প্রাক্তন কর্ম সঞ্চিত আছে, তাই হয়তো তুই যেতে পারবি। ধ্রুবলোকে তোর ঠাঁই হবে।

মার কথা শুনে জলা অবাক হয়ে গেল। মা'র চেয়ে অনেক বেশী বার তার জন্ম হয়েছে নাকি? সে নাকি মা'র থেকে বয়সে বড়? অদ্ভুৎ ালী তো!

—আমি তোমার আগে থেকে পৃথিবীতে যাতায়াত করছি মা?

—আগে পরে কিছু নাই মা, এখানে কাল নিরবছিন্ন। তুইও বহুবার গেছিস, আমিও বহুবার গিয়েছি, কত শতবার, তার হিসাব রাখেন তোর আমার যিনি নিয়ন্তা। আয় মা, আজ এসব কথা থাক। অন্য একদিন তোকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্য ঐ দেবগুরু বৃহস্পতির কাছেই নিয়ে যাব। আজ এখানেই বিশ্রাম কর। এই তোর ঘর। প্রথম স্বর্গ এর নাম। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের এটা তৃতীয় লোক।

জলা দেখলো, সে এক আশ্চর্য্য সুন্দর জায়গায় এসে পড়েছে। তার দৃশ্য বর্ণনা করবার ভাষা ওর জোগাচ্ছেনা। খালি দেখছে, জমাট জ্যোস্নার মত সেখানকার মাটি, জমিতে পেঁজা তূলোর আঁশের চেয়েও নরম ঘাস, দূর দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, দিকচক্রে নিবিড় শ্যাম বনরেখা দেখা যায়। ছোট্ট একটি নদী, জলটির বর্ণ গৈরিক, হাজার তরঙ্গ তুলে ছন্দে ছন্দে বয়ে যাচ্ছে। আর সেই ছন্দে নৃত্যশীল কতকগুলি রূপসী তরুণী ওকে অপূর্ব-দর্শন ফুল নিয়ে অভ্যর্থনা করতে আসছে। কি চমৎকার উৎসববেশ যে ধরেছে ওরা! জলাকে দেখামাত্র যেন তাদের আনন্দ হাজারগুণ বেড়ে গেল। গান গাইতে গাইতে ওরা এসে ওকে ঘিরে ফেললো।

—ইস্! তুই কি মোটা হয়েছিস জলা!—মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়ে বললো একটি মেয়ে।

—খুব খাচ্ছিলি বুঝি পৃথিবীতে গিয়ে? শঙ্খের মালা পরিয়ে অন্য একটি মেয়ে বললো।

—আমরা ভেবেছিলাম—বিরহে শুকিয়ে যাবি, এসে দেখছি উল্টো! অন্য মেয়েটি বলে প্রবাল মালা দিল।

জলা এদের চেনে হয়তো, কিন্তু মনে করতে পারছেনা; কত দীর্ঘদিন পরে যেন আজ বাপের বাড়ী এসেছে জলা; ছেলেবেলার সাথীদের f পারছেনা, থথমত খেয়ে বললো,

—চিনতে পারছিনা তো ভাই?

—ওম্মা, একেবারে চিনতেই পারলিনা, বাঃ, বলে পদ্মফুলের মত ফু মালা দিল চতুর্থ মেয়েটি।

—থাক্ থাক্। বিরহিনীকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই! অপরাজিতার মত ফুলের মালা পরিয়ে দিল পঞ্চমটি।

—বিরহিনী না আর কিছু! দেখছিসনা কি রকম মোটা হয়েছে,—আয় বলে ষষ্ঠ মেয়েটি জলার গলায় অদ্ভুত এক জ্যোতির্ময় মালা পরিয়ে দিল। জলা দেখলো, এরা সবাই বিংশ বর্ষীয়া তরুণী, সবাই তার বয়সী, আর অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু জলা কিছুতেই মনে করতে পারছে না, কে এরা, কখন তার সঙ্গে আলাপ হোল এদের!

—তোকে ওরা ভাল বাসে মা। বহু বহু জন্ম ধরে ওরা তোর সাথী। আজ তুই আসবি জেনে অভিনন্দন দিতে এসেছে; ভেবে দেখ, চিনতে পারবি। আমি আজ যাই।

বলতেই ওরা সবাই প্রণাম করলো মা'কে। মা একটি উজ্জ্বল আলোক-বিন্দুর মত ঊর্দ্ধাকাশে বিলীন হয়ে গেলেন মুহূর্তে! জলা

এবার, একজনকে চিনেছে। বললো—তুই আশা, নারে? আর তুই, দাঁড়া, নামটা কি যেন মিনতি, আর তোর নাম প্রণতি। ওরা হাসছে খুব। বললো বাপরে বাপ। এমন ভুল কেউ করে জলা? সব উল্টে পাল্টে বলছিস!

—না, ঠিক বলবো আমি, তোর নাম বন্দনা, তোর নাম আলপনা, আর তোর নাম উপাসনা, কেমন?

ওরা খুব হাসছে খিল খিল করে। একজন হাসতে হাসতে বললো, লোপ পেয়ে গেছে, জলা। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিচ্ছিস! বুঝলো, নামগুলো সে ঠিকই বলছে, তবে যার যা নাম তা ঠিক মত বলতে পারেনি, প্রণতিকে মিনতি বলেছে, উপাসনাকে আলপনা বলে ডেকেছে। মৃদু হেসে বললো—তোদের চেহারা অনেক বদলে গেছে ভাই, ঠিক ঠিক চেনা যায় না।

—না, এখানে কারও চেহারা বদলায়না, বদলেছিস তুই, যত ইচ্ছে খেয়েছিস মৃত্যুলোকে আর সব স্মৃতি চাপা পড়ে গেছে, যত মোটা হয়েছিস।

—খাব কিরে। ওখানে আমার খুব খারাপ ব্যারাম হয়েছিল। শুকিয়ে শুকিয়ে মরেছি আমি।

—তাতে কি! সে তো অন্নময় কোষের কথা! ও কোষ এখানে আসতে পারে না। তুই ওখানকার বাসনা-বিষ খুব বেশী করে খেয়েছিস, তাই এত মোটা হয়েছিস।

—তা হবে, বলে জলা চুপ করে রইল। সমীরের কথাটাই মনে পড়ে গেল ওর।

আনন্দে গান গাইতে গাইতে ওরা ছয়জন জলাকে নদীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। আশা বললো—ওদেশে স্মৃতিশক্তি এত কমে যায় নাকি জলা? এই কমাসে সব ভুলে গেছিস?

—ক' মাস! বলিস কি লো! কত বছর হয়ে গেল, আমি গেছি এখান থেকে।

—সে তোর পৃথিবীর হিসাবে, আমাদের হিসাবে মাস তিন, না কি লো উপাসনা? উপাসনা এদের মধ্যে সব থেকে সুন্দর আর খুব ধীর,। সে হেসে বললে—শো তিনেক বছর হোল তোর পৃথিবীর হিসাবে। আমাদের এখানের হিসাবে তিন মাসও হয় নি। মাত্র সাত আট জন্ম তো পার করে এলি এবার। এবার তো দেখা হয়েছিল মীনের সঙ্গে?

—হয়েছিল দু এক দিন। ওর ওখানকার নাম সমীরন। কাল রাত্রেই দেখে এলাম, আবার যাব সোমবার।

—বাবি! ওখানকার বিষাক্ত বাষ্পে কি করে তুই বেঁচে ছিলি জলা? আমি তো এক দণ্ড টিকতে পারিনে, বাপরে! কি কুৎসিৎ জায়গা! সাতটা জন্ম খামোকা ঘুরলি তুই ঐ নরককুণ্ডে! আর আসিসনে জলা, মীনকেতনকে পাওয়া তোর বরাতে নেই।

—ছিঃ! ওসব বলিস না ভাই ওকে। মীনকেতনকে না পেলে ও বাঁচবে কেমন করে? —বললো আশা। পাবিরে জলা, তবে ও বড় দূর গ্রহের লোক, ধরা ভারি কষ্টকর ওকে; তোর সাধ্যের অতীত সাধনা করতে হবে। আয়, জলে নেমে স্নান করি সবাই।

ওরা ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। কিন্তু জলার মন বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। মীনকেতনকে তো সে সত্যি পেলনা। কত দিন, কত বছর, কত জন্ম যেন সে পৃথিবীতে কাটিয়ে এলো। মীনকেতনকে চোখের দেখাও সব সময় দেখতে পায়নি। দুঃখে কান্না পেয়ে গেল জলার। কিন্তু উপাসনা এসে ওর হাত ধরে আদর করে বললো,

—কাঁদিসনা জলা, সাধনায় সিদ্ধি একদিন হবেই। মীন নিশ্চয় আসবে এখানে—আয়!

—জলে নেমে স্নান করছে জলা। সবাই ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে আশা বললো - তোর আর কি এমন দুঃক্ষু জলা ? আমার আলো-কে আমি আজ তিন দিব্য বৎসর পাইনি ; তবু তো আশায় বসে আছি তোর আর কটা দিনের বিরহ ?

জলার ভালো করে সব কথা মনে পড়ছে না এখনো ; তার যেন খুব অসুখ করেছিল, ভাল হয়েও স্মৃতিটুকু ফিরে পাচ্ছে না, এমনি মনে হচ্ছে। শুধুলো ওদের—ঠিক মত সব কথা মনে করতে পারছিনা কেন লো

—সাতবার তোকে পৃথিবীর নানা জায়গায় জন্মাতে হয়েছে এই যাত্রায়। সাতবারের গর্ভযন্ত্রনা, যোনির পেষণ আর পৃথিবীর আধি ব্যাধিতে সব ভুলে বসে আছিস।

জলার মনে পড়েছে একটু একটু। উঃ কত যে কষ্ট পেয়েছে জলা এবার মর্ত্তলোকে গিয়ে! গর্ভাশয়ের মধ্যে থাকতে হোত, একটুকু নড়বার জায়গা ছিল না। আবার প্রত্যেকবার বেরুবার সময় সে কি নিদারুণ সঙ্কীর্ণ পথ, মাথার খুলি যেন চেপ্টে যেত। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তো জলা, ভুলে যেত তার সব ভাবনা চিন্তা। এমনি করে সাতবার জন্মেছে আর মরেছে এর মধ্যে একবারও এখানে আসেনি! গতবারে যখন মীনকেতনের সঙ্গে স্বর্গসুখ ভোগ করে জলা হঠাৎ একদিন ভোগ-কর্মক্ষয়ের পরে পৃথিবীতে পতিত হয়েছিল, সেদিন জন্মেছিল গিয়ে ইউরোপে ; মীন তখনও স্বর্গে। তার স্বর্গভোগ শেষ হয়নি, তাই জলাকে সেই মানুষ-জন্মটা কুমারীই থাকতে হয়েছিল, তার পরের জন্মেও মীনের সঙ্গে দেখা হোলনা। মীন তখনও পৃথিবীতে যেতে পারেনি। তৃতীয় জন্মে এতটুকু যখন মীন তখন জলা তাকে দেখেছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য একটা জাহাজে এক গুজরাটি মেয়ের কোলে। সেই জাহাজেই জলা ডুবে মরেছিল। কিন্তু মীন আর তার মা বেঁচে গিয়েছিল। চতুর্থ জন্মে·····

—ওসব এখন ভাবিস না জলা, আয় স্নান করে চল, পূজো করবি, বলে সঙ্গিনীরা ও:কে তাগাদা দিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু জলার মন যেন কোন্ দূর অতীত জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে।

প্রায় দুটো বাজে; বিছানার উপর ধড় মড় করে উঠে বসলো সমীর। কী অদ্ভুৎ স্বপ্ন! সে নাকি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা স্বপ্নে, না জাগরণে? ঠিক করতে পারছেনা সমীর, অথচ সে এখনো বিছানায় বসে রয়েছে, কিন্তু হোল্ড-অলের এই চামড়ার ফিতেটা তার হাতে কেমন করে এল, আর ঐ টিপয়টা মেঝের মাঝখানে বসালো কে? তবে কি সত্যই সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, গিয়েছিল সে আত্মহত্যা করতে। সমীর সভয়ে তাকালো বাইরের কাঁটাল গাছটার পানে, যেখানে সে একটা মেয়েকে গলায় দড়ি দিতে দেখেছে; নাঃ—কেউ তো নাই; কুয়োটার দিকেও তাকালো, সেখানেও কেউ নাই। তা হলে এটা স্বপ্ন, কিন্তু এমন অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখলো কেমন করে? স্বপ্নে আজ উজ্জ্বলাকেও দেখেছে—সেই ছোট বেলাকার উজ্জ্বলা, চাঁপা রঙ এর পিঠের উপর এক পিঠ চুল আর তেমনি আব্দেরে কথা; সেইদিনের সেই উজ্জ্বলা এসেছিল। সত্যি কি এসেছিল? না কি স্বপ্ন!

কত ভাল ভাল কথা বলে গেল উজ্জ্বলা, কত সুন্দর তার কথাগুলি! হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বলে গেছে আসছে সোমবার আবার সে আসবে। যদি সত্যি আসে তবে বুঝতে হবে, মৃত্যুর পর জীবন আছে; এমন কি, মৃত্যুটা কিছু নয়, কাপড় ছাড়ার মত মাত্র। সমীর তা হলে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হবে, সাধনা করে শক্তি লাভ করবে উজ্জ্বলার কাছে যাবার জন্যে।

কিন্তু কি সে করতে যাচ্ছিল! আত্মহত্যা কেন করতে গেলে সে? উজ্জ্বলা পৃথিবী ছেড়ে গেছে তাই বলে সে আত্মহত্যা করবে! ছিঃ ছিঃ! বুড়ো বাপের কথা তার মনে ছিলনা, ছোট্ট ভাইবোন দুটোকেও ভুলে

গিয়েছিল সমীর! কি এক অদ্ভুৎ ব্যাধিতে যেন ও আক্রান্ত হ'য়েছিল : পরিষ্কার এখন মনে প'ড়ছে সমীরের, সে আত্মহত্যাই করতে গিয়েছিল, করতে পারলে না। না, ওকে সামলে দিয়ে গেল উজ্জলা। দেবী সে, কোথায় কোন্ লোকে তার অধিষ্ঠান জানে না সমীর, কিন্তু সে বলে গেছে, বই পড়ে সমীর যেন সব জেনে নেয়। জানবে—জানতেই হবে সমীরকে।

কেমন যেন অধীর আবেগ-আকুল হয়ে উঠলো মনটা ; উঠে দরজা খুলে সমীর বাইরে এলো। জ্যোস্নাটা মেঘের আড়ালে মলিন কিন্তু, বাড়ীর উঠানে ভারি সুন্দর একটা স্নিগ্ধতা আর সুবাস। কিসের এ পুণ্য গন্ধ! উজ্জলারই অঙ্গ গন্ধ নাকি! হ্যাঁ, এমনি একটা মৃদু গন্ধ তার মাথার চুলে পাওয়া যেত, আম্লা-বাসালো দিয়ে চুল ঘষতো, তারই গন্ধ।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে বৃদ্ধ পিতা জেগে উঠেছেন। বাইরে এসে ডাকলেন,—ঘুম আসছে না বাবা, সমীর ?

—ঘুমিয়েছিলাম একটুখানি বাবা, আপনি শোন, বড্ড গরম লাগছে।

কিন্তু বাবা শুনলেন না, এসে সমীরের হাত ধরে বললেন,

বালত্বন্তু কুমারত্বঞ্চ যৌবনং বৃদ্ধতামপি
ততশ্চ মরণং তত্তদ্ধর্ম্মমাপ্নোতি মানবঃ—
এবং সংসার চক্রোঽস্মিন ভ্রাম্যতে ঘটি যন্ত্রবৎ।*

—বাবা সমীর, ঋষিরা বলেছেন, মানুষ ঠিক ঘটি-যন্ত্রের মতন এই সংসারে ঘুরছে, বাল্য, কৈশোর, যৌবন পার হয়ে বুড়ো হয়ে সে মরে, আবার জন্মায়, আবার মরে। এই সংসারে সে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আর আধিদৈবিক এই তিন রকম তাপ ভোগ করে, কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলে বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মে তার তখন। সেই সান্ত

* গরুড়পুরাণম্

আত্মা অনন্তের অনুসন্ধান করে আর তাতে গিয়ে লীন হয়। মৃত্যু তো নেই বাবা, কেন এমন করে অধীর হচ্ছিস তুই ? উজ্জলা আছে, ঐ ঊর্দ্ধলোকে রয়েছে সে, যেখানে বিশ্বের অধিদেবতার শান্তিময় আসন, সেই খানে।

--উজ্জলা এসেছিল বাবা, আমি এই মাত্র তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সেই ছোট বেলার মত ছোট্ট হয়ে এসেছিল, ; হ্যাঁ বাবা, বলেছে, আবার আসবে সে।

—তবে কেন কাঁদছিস সমীর ? উজ্জলার সঙ্গে তোর প্রেম যদি পবিত্র হয়, যদি সে প্রেম একনিষ্ঠ, অব্যভিচারী হয়, তাহলে মহা প্রেমিক ঈশ্বরের করুণা তোরা লাভ করবি ; তোদের দেখা হবে, আবার দুটিতে তেমনি খেলে বেড়াবি সমীর !

সমীরের দুচোখের জল গাল বেয়ে নামছে। বাবা ব্যাকুল হয়ে বললেন,—তোর মা তো, অনেক দিন হোল গেছে সমীর, কিন্তু কখনো আমাকে কাঁদতে দেখেছিস ? কাঁদবার তো কিছু কারণ নেই। আমি জানি, ও আগে গিয়ে গেরস্থালী গুছাচ্ছে, হয়তো এখানে এসে মাঝে মাঝে দেখেও যায় আমাদের।

—হবে বাবা, আমি আর অবিশ্বাস করছিনা ; কিন্তু বাবা, উজ্জলার বিয়ে হয়েছিল অন্যের সঙ্গে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি করে থাকতে পারে আর ?

—প্রশ্নটা বড় কঠিন সমীর, তবু যতটা পারি, তোকে বোঝাচ্ছি। শ্রীরাধার বিয়ে আয়েনের সঙ্গে হয়েছিল, তবু আয়েন তার কেউ নয়, এও কতকটা তেমনি। তোদের দৈহিক মিলন এজগতে হোলনা,—না হোক, হয়তো এর মধ্যে ঈশ্বরের অপার করুণা লুকিয়ে আছে, হয়তো এই জন্যেই তোদের মানুষী প্রেম, রূপজ এবং গুণজ প্রেম অপার্থিব নৈসর্গিক

প্রেমে পরিণতি লাভ করবে, হয়তো এই প্রেমের আগুনে তোদের আত্মাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, জ্ঞানময়, চৈতন্যময় করতে সাহায্য করবে।

—কিন্তু ঐ লোচনের কথাটা শুধুচ্ছি আমি বাবা! ও কে? ওর সঙ্গে উজ্জ্বলার কি সম্বন্ধ?

—ওর হয়তো কর্মফলের খানিকটা ভোগ সুখ বাকি ছিল এখানে; নইলে এত বড় জমিদার বাড়ীর জামাই হবার কোন যোগ্যতাই ওর নাই। আর এমন অন্যায় ভাবে ইন্দ্রিয়জ সুখ-ভোগের সুবিধা ও আর কোথাও হয়তো পেতনা। কিন্তু ওর আত্মাকে অনেক নীচে নেমে যেতে হোল বাবা, ওর উঠতে বহু হাজার বছর লাগবে। শুধু ওর নয়, এই জমিদার বাড়ীর সকলেরই; ওরা সবাই পতিত হয়ে গেল।

সমীর চুপ করে রইল। বাবা বললেন,—কাল আমার কাছে বসে মহাভারতের বনপর্ব আর ছান্দোগ্য উপনিষদ পড়িস, দেখবি, ঋষিরা মৃত্যু পারের সব কথাই বলে গেছেন।

—হ্যাঁ বাবা, পড়বো আমি, আপনি শোন গিয়ে,—বলে সমীরও নিজের ঘরের দিকে এল। ও না শুলে বাবা শোবেন না, তাই একটু বস্‌বার ইচ্ছে থাকলেও সমীর এসে শুলো। ফিন্ ফিন্ করে হাওয়া দিচ্ছে। রাত্রি-শেষের শীতল হাওয়া, সমীর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে?

সকালে উঠে সমীর গেল দিদিমার বাড়ী। দিদিমা স্নান করে তুলসী-মূলে জল দিচ্ছিলেন, সমীর দাঁড়ালো। আজ আর ওর অবিশ্বাস জাগছেনা, মনে হচ্ছে ভক্তবৎসল হরি হয়তো ভক্তের ক্ষুদ্র প্রাণে ক্ষুদ্ররূপেই দেখা দেন। কে জানে, এই তুচ্ছ তুলসী গাছে সত্যই তিনি আবির্ভূত হন কিনা!

দিদিমা পূজা শেষ করে বললেন,—এসো দাদা, তোমাকে বড্ড যেন শুকনো দেখাচ্ছে। ঘুমাও নি রাত্রে নাকি?

—তাই বলতে এলাম দিদিমা, ভারী মজার আর লজ্জার কথা ; জানো দিদিমা, কাল আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম ! এখন এমন হাসি পাচ্ছে !

—সে কিরে সমীর ! দিদিমা যেন আঁতকে উঠলেন, বললেন, ছিঃ সমীর, তোর মত লেখা-পড়া-জানা ছেলের একি কাণ্ড ! এত নির্বোধ তুই ?

—না, দিদিমা, শোন, কি যে হোল আমার, সন্ধ্যাবেলায় বাবা বলছিলেন যে, মানুষ মরেনা, শুধু দেহ পাল্টায়, তাই মনে হোল, মরলে অর্থাৎ দেহ পাল্টালে আমি নিশ্চয় উজ্জলার কাছেই যেতে পারবো ; দেখাই যাক না মরে একবার ; আবার জন্ম নিলেই হবে, এমন নির্বোধের মত ভেবেছিলাম দিদিমা ! হাঃ হাঃ হাঃ ! সমীর হাসলো, বললে আবার,—হ্যালোসিনেশন দেখছিলাম, একটা মেয়ে কাঁটাল গাছে গলায় দড়ি দিচ্ছে, আর একটা লোক কূয়োতে ঝাঁপ দিচ্ছে।

—ঐ রকম পাপ কাজ করতে গেলে পাপী প্রেতরা এসে অমনি করে দেখা দেয় সমীর ! পাপের পথে সাহায্য করবার লোকের অভাব নেই। পুণ্যের পথ কেউ দেখাতে আসে না ; মেয়েটাকে চিনতে পেরেছিলি ? না, তুই চিনবি কেমন করে ! তুই তখনও জন্মাস নি, এই গাঁয়ের একটা মেয়ে, নাম ছিল গোলাপী, অন্যায় করে সামলাতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। আর একটা লোক, নাম ছিল মান্থ, সে মরে ছিল জলে ডুবে—ঠিক তারাই তাহলে দেখা দিয়েছিল তোকে।

— কতদিন আগে মরেছে তারা ?

—তা প্রায় বিশবছর হবে, আমিই তখন এতটুকু কনেবউ, বিয়ের পরে সবে এসেছি এখানে।

—তা হলে এতকাল ওরা ভূত হয়ে আছে ?

—আরো কতকাল থাকবে,—ওদের মুক্তি হওয়া ভারী কঠিন, ওরা

বুঝতেই পারেনা যে মরেছে। কেন জানিস? শোন, প্রেতের শরীর সূক্ষ্ম বায়ু-তত্ত্বপ্রধান, কিন্তু সে শরীরে এত শক্তি আছে যে, বাসনার বেগে ওরা এই জড় প্রকৃতি থেকে উপাদান টেনে নিয়ে, প্রায় মানুষের দেহের মতই একরকম দেহ ধারণ করতে পারে, যদিও সে শরীর স্থায়ী হয়না, আর ঠিক মানুষের মতও হয় না, তবু সেও এক রকম দেহ।

—পারে তো কি হয়েছে তার?—সমীর প্রশ্ন করলো।

—যারা পৃথিবীতে দুষ্ট লোক ছিল, মরেও তারা স্বভাব, সংস্কার ছাড়তে পারেনা। দুষ্টুমি করে বেড়ায়। লোককে ভয় দেখায়, সুযোগ পেলে অনিষ্ট করে, এমন কি, কথা বলে তার প্রয়োজনীয় বস্তু চেয়ে পর্য্যন্ত নেয়। কুকুরের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, কুকুর অনেক সময় দেখতে পায় ওদের, তাই চীৎকার করে ওঠে।

—আচ্ছা দিদিমা, একটা কুকুর না হয় পুষবো,—সমীর হেসে উঠলো।

—হাসিস না সমীর, একে বলে 'যাতনা দেহ,' ঋষি বলেছেন :—

* পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ—প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্
শরীরং যাতনার্থীয়াম্ মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্॥

পাপের ফল ভোগের লেগে এই দেহ হয়। কিন্তু আত্মহত্যা করার সময় স্থূল: দেহ থেকে চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম বায়ুতত্ত্ব প্রধান দেহ বেরুতে অত্যন্ত কষ্ট পায়, তাই এক রকমের মূর্চ্ছা হয় তাদের। তারপর সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই ঘুরে বেড়ায়, যেমন মানুষের একরকম রোগ আছে, ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে বসে, হেঁটে বেড়ায়, আমরা বলি নিশির ডাক, এও ঠিক সেই রকম।

---

* মনু

—হ্যাঁ, রোগ একরকম আছে দিদিমা ; ওদেরও রোগ হয় তাহলে ?

—হ্যাঁ, ওটা ওদের দুষ্কর্মের ফল! সেই মূর্চ্ছা শ্রাদ্ধাদি না করলে ভাঙে না। ওরা পৃথিবীর মানুষের মতই ডাল-ভাত-মাছ-মাংস খেতে চায়, আরাম করতে চায়।

—বিয়েও করতে চায় ?

—চায়। শুধু তাই নয়, যে যাকে ভালবাসে তার কাছে বাসনার বেগে রূপ ধরে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু বায়ুতত্ত্ব মানুষের মত পৃথিবীর বস্তু ভোগ করতে পারে না, তাই ভয়ানক মনঃকষ্ট পায় ওরা। অবশ্য ওষুধ না খেলেও রোগ যেমন সারে, তেমনি শ্রাদ্ধ না করলেও ওদের মূর্চ্ছা-রোগ একদিন সারে। তবে দেরী হয়।

—তাই ওরা ভয় দেখাতে আসে নাকি দিদিমা ?

—হ্যাঁ, ওরা চায় ওদের আরো সঙ্গী জুটুক। সবাই মিলে……

—নরক গুলজার করবে! আচ্ছা দিদিমা, বিশ্বাসই না হয় করলাম তোমার কথা—তাহলে শোন, কাল ঘুমের সময় উজ্জ্বলা এসেছিল ; সেই ছোটবেলার মত চেহারা, আর কথা। আচ্ছা দিদিমা, ওকি সত্যি এসেছিল মনে হয় তোমার ?

—আমি অবিশ্বাস করিনে সমীর, এরকম আসে উর্দ্ধস্তরের আত্মিকরা।

—বলে গেছে, আবার এই সোমবার আসবে।

—বেশ তো, দেখ, সোমবার আসে কিনা, মনে হয়, সে আসবে।

সমীর উঠতে উঠতে বললো—শাস্ত্রে শ্রদ্ধা যদি আমার সত্যি জাগে দিদিমা, তাহলে তোমার কাছেই স্বীকার করবো সে কথা সবার আগে ; যাই এখন।

বাড়ী চলেএলো সমীর। ওর বাবার অনেক সময় লাগে সন্ধ্যাহ্নিক

করতে, তাই কর্মস্থান থেকে বাড়ী এলে সকালের চা ও দিদিমার বাড়ীতেই খেয়ে আসে। ছোট বোনটা বড্ড ছোট, মাত্র এগার বছরের। তার পড়া কামাই করিয়ে সমীর চা খেতে ইচ্ছে করেনা। ভাইটা আরো ছোট ; বাড়ীতে আর কেউ নাই! সমীরের বিয়ের জন্য অনেকেই অনেক বার আনাগোনা করছে ওর বাবার কাছে, কিন্তু সমীরের ইচ্ছা নাই জেনে বাবা সবাইকে জবাব দিয়েছেন।

তবু বৃদ্ধ আশা করেন, সমীর একদিন উজ্জ্বলাকে ভুলে অন্য কাউকে বিয়ে করবে ; কিন্তু নিজে তিনি এবিষয়ে কিছু বলেন না সমীরকে।

বাড়ী এসেই সমীর একখানি চিঠি পেল ডাকে। এসছে তার ধানবাদের অফিস থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে। সমীর ডাক্তার, সার্জারীতে ভাল হাত বলে ও মেডেল পেয়েছিল, তাই রেলে চাকরি পেয়েছে, মাইনেও পায় তিনশোর বেশী। কিন্তু এ চিঠি এসেছে খাস গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে, ওকে যুদ্ধের ডাক্তার হয়ে যেতে হবে সিলোন ; মাইনে অবশ্য অনেক বেশী পাবে এ কাজে, কিন্তু বাঙালীর ছেলে, সিলোন যেতে হবে, পড়েই মিনিট দুই চিন্তিত হয়ে রইল; তার পরই মনে হোল, ভালই হয়েছে, বহুদূর দেশে গিয়ে উজ্জ্বলার স্মৃতি খানিকটা ভুলতে পারবে। খুশী হয়েই বাবাকে বলার জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভাবতে লাগলো, দুবছর চাকরিটা থাকলেই বেশ মোটা টাকা সে রোজগার করে নেবে। বুড়ো বাবার সেবা, বোনের বিয়ে, ভাইএর পড়া, এ সব কিছুর জন্য আর ভাবতে হবে না। কিন্তু বড্ড দূর!

তা হোক, সমীর মনকে সান্ত্বনা দিল, এখানেই বা কি তার আকর্ষণ আছে যার জন্য দূরে যেতে ভয় পাবে? নিজের ঘরে হোল্ডল আর বিছানা ঠিক করতে করতে সমীর ভাবছিল। চামড়ার ফিতেটা হাতে নিতেই রাত্রের ঘটনা মনে পড়ে গেল,—কাল সে আত্মহত্যা করতে

গিয়েছিল, কারণ আর কিছু নয়, সে ভূত হয়ে উজ্জ্বলার কাছে যেতে পারবে! যত আজগুবি কথা। ভূত আবার আছে নাকি? এ দেহ ঐ চিতাতেই শেষ হবে, তারপর আর কিছু নাই,—হাসি পাচ্ছে সমীরের। এমন নির্বোধ সে হয়েছিল কেমন করে? কাল সত্যি যদি সে মরেই যেত তাহলে আজকার এই সিলোন যাবার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যেত, আর বাবা, ভাই, বোন সবাই বেশি করে কাঁদতো। এতক্ষণ তাহলে পুলিশে ভরে যেত বাড়ীখানা; তারপর সমীরের দেহটাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে পরীক্ষা করতো হয়তো তারই কোন এক বন্ধু ডাক্তার।

—কিসের চিঠি বাবা সমীর? বাবা এসে শুধুলেন।

সমীর খুব উৎসাহ দেখিয়াই সুখবরটা দিল বাবাকে। বললো,—আজই তাহলে ধানবাদ যাই বাবা।

—না, আজ থাক, কাল সকালের ট্রেনে যাবি,—সিলোন কবে যেতে হবে?

—এক সপ্তাহ পরে; বলে সমীর চিঠির ভাবার্থ বুঝিয়ে দিল বাবাকে। বললো—আপনি ভাববেন না; আমরা থাকবো যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে, আর আমরা তো যুদ্ধ করবোনা, আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করবো।

—আচ্ছা বাবা, করবে। এওতো একটা মানুষের সেবার কাজ, তাই তোমাকে ডাক্তারী শিখিয়েছিলাম। তবে আমি বুড়ো হয়েছি, কখন কি হয়!

—না বাবা, আপনার হার্ট খুব ভাল আছে, আর ব্লাড-প্রেসারও নেই; আপনি ওসব ভাবছেন কেন? আমি কিছু টাকা রোজগার করে নি বাবা।

—কর। তোর মা চেয়েছিল সমীর, তুই বড়লোক হবি,—দেখতে পেল না সে।—ব্যথাহত বাবার কণ্ঠস্বর। সমীর আর কোন কথা না

বলে মা'র বড় ছবিটার কাছে দাঁড়ালো গিয়ে। আহা, মার কত ইচ্ছাই ছিল! কত সাধ, কত আশা, উজ্জ্বলাকে নিয়ে সংসার গড়বে, ছেলে রোজগার করবে। মা কত রকমে বাড়ীখানা সাজাবে; মা অকালে চলে গেল!

না, মা যায়নি—বিশ্বাস করতে কত ভাল লাগে যে মা আছে! এই বিশ্বাস কতখানি আশা আর আশ্বাস দেয় মানুষকে! বিশ্বাস করলে ক্ষতি কি যে মানুষ মৃত্যুর পর পরও বেঁচে থাকে? না—অবিশ্বাস আর করবে না সমীর। বিশ্বাস করবে, মানবাত্মা জন্মের পর জন্ম বেঁচে থাকে। মৃত্যুটা শুধু প্রবাস যাত্রার মত।

* * * *

আপনার ঘরে একখানা নরম আসনে বসে ভাবছিল জলা,—এই পৃথিবীর কথাই ভাবছিল। ছোট তার কুটীরখানি স্ফটিক দিয়ে গড়া, চারিদিকের স্বচ্ছ দেওয়ালে বাইরের দৃশ্যের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে মনে হচ্ছে, একটি সুন্দর দৃশ্য-চিত্রের মধ্যে সেও যেন একটি আঁকা ছবি, নিজেকে দেখে ওর তাই মনে হচ্ছে। সম্মুখে সেই গৈরিক-স্রোতা নদী ছন্দে ছন্দে বয়ে চলেছে। কোথা থেকে একটি সুমধুর সুর-ঝঙ্কার ভেসে আসছে। বহিঃপ্রকৃতি পীতাভ আলোতে ঝলমল।

কিন্তু জলা একলাটি বসে আছে; ওর সেই ছয়জন সঙ্গী, যারা ওকে এত আদর করে অভ্যর্থনা করলো, জন্ম-জন্মান্তরের কত কথা শুনালো, তারা কেউই এখানকার অধিবাসিনী নয়, সবাই তারা স্বর্লোকের চতুর্থ আর পঞ্চম স্তরে বাস করে। সাত জন্ম আগে জলাও ছিল তাদের সঙ্গে, তার পর সে ষষ্ঠ সপ্তম স্তরে উঠে গিয়েছিল, সেইখানে তার স্বর্গ ভোগ

শেষ হলে ওকে আবার পৃথিবীতে যেতে হয়—সে আজ প্রায় তিনশো বছরের কথা। অবশ্য তারও আগে জলার অনেক জন্মের কথা মনে হচ্ছে।র

স্বর্গভোগ শেষ হয়ে যায়, তারপর আবার সেই পৃথিবী। মাতা ধরিত্রী সন্তানকে আশ্রয় দিতে কোন দিন বিমুখ হন না। কৃমি হয়ে হোক, কীট হয়ে হোক, বৃক্ষ, লতা, কুকুর, শেয়াল, মানুষ যে-রূপেই হোক, পৃথিবীতে গেলে মা বসুন্ধরা তখুনি কোল বাড়িয়ে দেবেন। এমন মা আর হয় না। এ মা'র কথা কি ভোলা যায়! জলা জননী ধরিত্রীর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলো।

তার সঙ্গীরা চলে গেছে উচ্চতর স্বর্গে; বলে গেছে, মাঝে মাঝে আসবে বেড়াতে। জলাও অবশ্য যেতে পারে। কিন্তু সমীরন পৃথিবীতে রয়েছে, জলা অত উচ্চলোকে উঠে গেলে সমীরের কাছে যাতায়াত করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠবে, কারণ উচ্চতর লোকের দেবপিণ্ডধারী দেহ পৃথিবীর বাতাস সইতে পারেনা; বড় কষ্ট হয়। তা ছাড়া, সমীরের প্রতি আকর্ষণ ওকে উঠতেও দিচ্ছে না। আর উঠেই বা লাভ কি? স্বর্গটা এমন কিছু ভাল জায়গা বলে মনে হচ্ছে না জলার; এখানেও সুখ আছে, দুঃখ আছে, বিরহ আছে, সন্তাপ আছে, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, মায়া, মমতা সবই আছে; তা ছাড়া সব থেকে বেশি ভয়ের কথা যে স্বর্গ ভোগ শেষ হলেই আবার 'ধূমযান' গতি প্রাপ্ত আত্মাকে অনাবৃত্তি বা আবৃত্তিদায়িনী শুক্লা বা কৃষ্ণা গতিতে পৃথিবীতেই ফিরতে হবে। (১) (২) কাজেই দিন কয়েকে

---

১) নারমস্থ পৃষ্ঠে তে সুকৃতোঽনুভুত্ব ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি —শ্রুতি।

২)* তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি— গীতা।

জন্য ঐ সব দিব্যভোগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পিতৃলোক, ভূবঃলোক, বা স্বঃলোকের মোহ ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জলা অনেক বিষয় জানেনা, কিন্তু বহু জন্মের কথা ওর এখন একটু একটু মনে পড়ে। ও একবার শুনেছিল, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড চৌদ্দটি সূক্ষ্ম লোকে ভাগ করা আছে, তার সাতটি উর্দ্ধলোক আর সাতটি অধঃলাক, একেই বলে চৌদ্দভুবন। জীবের কর্ম অনুসারে উর্দ্ধ বা অধঃলোকে দেবযান বা ধূমযান গতি হয়। দেবযান গতিতে জীব ষষ্ঠ সপ্তম লোকে উঠতে পারে; সেখানে যেতে পারলে আর পৃথিবীতে ফিরতে হয় না, তাই জলা ঠিক করলো, যেমন করে হোক সে ষষ্ঠ সপ্তম লোকেই যাবে, অনর্থক চতুর্থ পঞ্চম লোকে গিয়ে দিন কয়েক স্বর্গভোগ করবার তার কিছু দরকার নাই। ঐ সব সূক্ষ্ম লোকের বিচিত্র ভোগের কথা অবশ্য আশা, উপাসনা, আলপনা ওকে বলেছিল, আর অনেক প্রলোভনও দেখিয়েছিল, কিন্তু জলা যেতে রাজি হয়নি। ওরা বলে গেছে, ওখানে নাকি:

"সুসুখ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা,
ক্ষুৎ পিপাসাশ্রমো নাস্তি ন জরা নচ পাতকম্॥ (৩)

মানে, বাতাস সর্বদা সেখানে সুগন্ধি, সেখানে খিদে তেষ্টার যন্ত্রণা নেই, রোগ ব্যাধি নাই, জরা বার্দ্ধক্যও নাই, চির যৌবন নিয়ে সবাই প্রচুর ভোগ-বিলাসে কাল কাটায়। শুনে অবশ্য খুব লোভ হবার কথা ওখানে যাবার লেগে। কিন্তু প্রকৃতি সর্ব্বত্র ত্রিগুণময়ী। সত্ত, রজ, তমো গুণ সেখানেও আছে, তাই তাপ দুঃখ সেখানেও বড় কম নাই। কারণ সবাই তো একই রকম পুণ্য কাজ করেনা, কাজেই স্বর্গেও সুখের বিভিন্নতা হয়।

---

(৩) মহাভারত বনপর্ব।

তার লেগে পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ জাগে এবং সেখানে সুখ যেমন তীব্র, দুঃখও তেমনি তীব্র। পৃথিবীর থেকে বেশি তীব্র। (৪) তা ছাড়া ভোগ সমাপ্তি হলেই তো পতন ঘটবে; তবে আর এ সুখের দরকার কি? জলা বসে বসে এই সব ভাবছিল, হঠাৎ দেখতে পেল, আকাশের পাতাভ আলো উজ্জ্বল সোনার রঙএ পরিবর্ত্তিত হয়েছে, আর জানালার বাইরে একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বিশাল হিরণ্ময় পর্ব্বত, হয়তো এইই মেরু পর্ব্বত; তাতে কি বিচিত্র সুন্দর সব উদ্যান, বৃক্ষ-বাটিকা, দেবগৃহ রয়েছে। আহা! কী চমৎকার! সাধ্য, দেবতা, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা আদি কত সুন্দর সুন্দর দেহধারী জীব যে ওখানে বেড়াচ্ছে, দেখতে দেখতে জলা অবাক মেনে গেল। সর্ব্বত্র দেবযান যাতায়াত করছে। দেবযান আলোকের রথ। জলা দেখতে পেল, ওখানে যারা বেড়াচ্ছেন তাদের যেন ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, জরা নাই। ওঁদের শরীর ওদেরই কর্ম্মের তেজ দিয়ে তৈরী; বাপমার কাছ থেকে শরীর নিতে হয় না ওঁদের; তাছাড়া ওঁরা ইচ্ছামাত্র অমনি তেজোময় দিব্য শরীর বা দিব্য লোক সৃষ্টি করতে পারেন; ঈর্ষা, শোক, পরিশ্রমের দুঃখ—কিছুই নাই ওঁদের, ওঁদের মোহ নাই, আকর্ষণও নাই—ওঁরা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ! কী চমৎকার ঐ জায়গাটি! ওর পূর্ব্বদিকে আরো জ্যোতির্ময় আরো সুন্দর কি যেন রয়েছে, কিন্তু জলা অতদূর দেখতে পাচ্ছেনা। হয়তো ওটি ব্রহ্মলোক!

---

(৪) স্বর্গেপি দুঃখমতুলং যদারোহন কালতঃ।
প্রভৃত্যহং পতিষ্যামি ইত্যেতদ্ ধৃতি বর্ত্ততে॥
নারকংশ্চৈব সংপ্রেক্ষ্য মহাদ্দুঃখমবাপ্যতে
এবং গতিমহং গন্তেত্যহার্নিশ মনির্বৃতঃ।— গরুড়পুরাণম্।

কাকে শুধুবে জলা। কেউ নাই ওর কাছাকাছি। নদীর ধারে এই ছোট কুটীরটিতে ওকে একলা থাকতে দেওয়া হয়েছে। জলার মনে বড় কষ্ট হতে লাগলো। এমন একা একা কি করে সে থাকবে? কতদিন থাকতে হবে, তাই বা কে জানে?

অকস্মাৎ জলা দেখতে পেল একটি নীলাভ জ্যোতিবিন্দু যেন উৰ্দ্ধগগন থেকে অতি দ্রুত নেমে আসছে এই দিকেই। তার আলোতে জলার ঘরের পীতাভ আকাশ একটা আশ্চর্য্য বর্ণে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। আর অতি পবিত্র অগুরু গন্ধে আশ-পাশের বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আলোক-বিন্দুটি ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো, আরো নিকটে এল, জলা দেখতে পেল—পরম রূপবান একজন পঞ্চাশৎ বৎসরের স্মিত বদন প্রৌঢ় তার এই আশ্রমের দিকেই আসছেন। বসে আর থাকতে পারলোনা জলা। পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দেবার জন্য ভৃঙ্গার ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে এল, দেবতাও এসে আবির্ভূত হলেন ওর কুটীরে।

জলা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে করযোড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, উনি আশির্ব্বাণী উচ্চারণ করলেন দেবভাষায়। তারপর আসন গ্রহণ করে মধুর কণ্ঠে বললেন,—পৃথিবীতে আমি তোমার পিতৃপুরুষদের মন্ত্রদান করেছিলেম মা, মনে পড়ে তোমার?

জলা এবার চিনতে পেরেছে। ইনি কাশীতে থাকতেন। জলা যখন খুব ছোট তখন দু'তিনবার দেখেছিল এঁকে তাদের চণ্ডীপুরের বাড়ীতে, কিন্তু তখন ইনি এমন জ্যোতির্ময় আর এতো রূপবান ছিলেন কিনা, মনে পড়ছেনা জলার।

—চিনতে পেরেছি প্রভু, খুব ছোট বেলায় দেখেছিলাম ভবদীয় শ্রীচরণ।—জলা বললো।

প্রসন্ন হেসে উনি বললেন,—পৃথিবীতে তুমি অদীক্ষিতা রয়ে গেছ মা,

তাই তোমার মা আর তোমার ঠাকুরদা বারবার আমাকে বলছেন, তোমাকে দীক্ষা দিতে হবে। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী, শুভ যোগ, আজ তোমায় আমি দীক্ষা দেব এইখানে, তারপর মন্ত্র জপ করে তুমি উর্দ্ধতন লোকে যেতে পারবে।

জলা এই করুণাময় পিতৃগুরুর কথা শুনে আনন্দে অভিভূত হয়ে বললো, —অশেষ করুণা প্রভু!

—না মা, আমার কর্ত্তব্য। ভেবেছিলাম, তোমার শ্বশুর-কুলের গুরুই তোমাকে দীক্ষা দেবেন, তাই তোমার পৃথিবীর মৃত্যুকালে আমি যাইনি। কিন্তু দেখলাম, তোমার শ্বশুর-বংশ বহুদিন গুরু-করণ ত্যাগ করেছেন, কাজেই আমি তোমায় দীক্ষা না দিলে আমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি হবে।

জলা আর একবার প্রণাম করে বললো—আমি ধন্য হলাম দেব! আপনি এখন কোন লোকে অবস্থান করেন জানতে পারি কি? ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওখানে কি আপনি থাকেন?

—না জলা, ওখানে তোমার অন্য পিতৃপুরুষগণ থাকেন, তাই তোমার চোখে ওঁরা প্রতিভাত হচ্ছেন। আমি আরো অনেক দূরে থাকি মা, ঐ পঞ্চম স্বর্গ, ষষ্ঠ স্বর্গ ছাড়িয়েও, অনেক, অনন্ত লোক রয়েছে। তারপর ব্রহ্মলোক, ঐ যে দেখতে পাচ্ছ তেজোময় ব্রহ্মজ্যোতি, ওখানে পবিত্র মূর্ত্তি ঋষিরা বাস করেন, ওখানের দেবতাদের নাম ঋভু, তাঁরা এই স্বর্গের দেবতাদেরও পূজনীয়, তাঁরা প্রভাময় আর ইচ্ছাময়। কোন তাপ, শোক, মাৎসর্য্য নাই ওখানে,—অমৃতত্বেও তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁদের কোন রকম আকৃতি নাই মা, সে শরীর দিব্য, ভাষায় তা বলা যায় না—কল্পান্তেও তাঁদের পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের এইটিই ত্রয়স্ত্রিংশৎ লোক; দেবযান গতিতে ওখানে যেতে হয়। আচ্ছা মা, পরে তোমাকে এ বিষয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেব।

জলা কৃতার্থ হয়ে গেল যেন। ইনি যেন জলার পরম বান্ধব, সাহস পেয়ে তাই বললো,—এই স্বর্গলোকে তো জীব পূর্ব্ব কর্মের ফলটুকু ভোগ করে আবার অধঃপতিত হয় দেব, এখানে তো কোন নবীন কর্মের অনুষ্ঠান নাই।" (১)

—হ্যাঁ মা, সে কথা সত্য। জীব এই স্বর্গে শুধু ভোগ করতেই আসে আর ভোগ শেষ হলে রজোগুণাক্রান্ত হয়ে মোহগ্রস্ত হয়, এই জন্যই জ্ঞানীরা কখনো স্বর্গ প্রার্থনা করেন না। কারণ এ ভোগ পরিণামে দুঃখপ্রদ। কর্মক্ষয় হলেই চন্দ্রলোকে ফিরে যেতে হবে, আর সেখানকার জলময় শরীর বিগলিত হলেই পৃথিবীতে গিয়ে পতিত হতে হবে, তারপর আবার ব্রীহি, যব ওষধির মধ্য দিয়ে পিতার শুক্রগত হয়ে মাতৃগর্ভে যেতে হবে, আবার জন্মগ্রহণ করে সেই মৃত্যুলোকে আসতে হবে—একেই বলে ধূমযান গতি। কিন্তু এছাড়া দেবযান গতি আছে মা, সে গতিতে জীব উচ্চতম গতি পায়, যেখান থেকে আর ফিরতে হয় না; শেষে সপ্তম লোকে গিয়ে মুক্তি পায়, ছান্দগ্য উপনিষদ বলেছেন :—

"যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভব ন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমানপক্ষমাপূর্য্যমানপক্ষাণ্যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাংস্তান। মাসেভ্যঃ সংবৎরং সংবৎসরাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽ-মানবঃ স এনং ব্রহ্ম গময়ত্যোষ দেবযানঃ পন্থা।" পুণ্যাত্মাদের দেহাবসানে, সূর্য্যদ্বার পন্থাদ্বারা এই দেবযান গতি হয়। এই গতিতে জীব অর্চ্চি অভিমানী, দিবসাভিমানী, আপূর্য্যমান পক্ষ, ষন্মাস দেবলোক, সংবৎসর

---

(১) কৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে।

—মহাভারত—বনপর্ব্ব।

দেবলোক, আদিত্য দেবলোক, চন্দ্রমা দেবলোক অতিক্রম করে বিদ্যুৎ দেবলোকে চলে যান, সেখানে এক অমানব পুরুষ তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান, এই সপ্তম লোক এখান থেকে আর ফিরতে হয় না।

ওখানে জ্ঞানের সাধনা করে সাধক ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ করেন, তারপর নির্ব্বাণ মুক্তি হয়ে যায় তাঁর।

—ষষ্ঠ লোকে কারা আছেন দেব? জবা প্রশ্ন করলো আনন্দের সঙ্গে।

—সগুণ পঞ্চোপাসনায় যাঁরা ইষ্টমূর্ত্তির আরাধনা করে সমাধিলাভ করেন আর সেই ইষ্ট চিন্তায় তন্ময় হয়ে যান, তাঁরা সেই দেবতার লোকে সালোক্য বা সামীপ্য মুক্তি পান, —একে ষষ্ঠলোক বলে; যেমন শিবলোক, বিষ্ণুলোক, শক্তিলোক, এসব ষষ্ঠলোকে রয়েছে। শিব, বিষ্ণু বা শক্তি ভক্ত সাধক এইখানে গিয়ে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকতে পারেন। মহাপ্রলয়ে যখন শিব, বিষ্ণু, বা শক্তি পরমব্রহ্মে লীন হন তখন সেই ভক্তও ইষ্ট দেবতার সঙ্গে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

—এ গতিতে আর কোন বিপৎপাত নেই তো প্রভু? জবা আবার প্রশ্ন করলো করযোড়ে।

—না, মা, তবে পৃথিবীতে প্রেম ভক্তি, জ্ঞান সাধনার পরেও হয়তো কারো কারো অপূর্ণ প্রারব্ধ কর্ম থেকে যায়, আর তার জন্য পরাজ্ঞান লাভ হতে দেরী হয়। তাঁরা দেবীলোকের মণি দ্বীপে থাকেন (১), না চাইতেই প্রারব্ধের জন্য নানা রকম ভোগ তাঁদের নিতে হয়। তারপর প্রারব্ধ শেষ হলে পরব্রহ্মের জ্ঞান-জ্যোতি আপনি তাঁদের অন্তরে বিকশিত হয়। কত দিনে ব্রহ্মলোক পাবেন, শ্রুতি এবিষয়ে বলছেন—

(১) ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণি দ্বীপং স গচ্ছতি॥—দেবীভাগবৎ

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।

পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশান্তি পরং পদম্॥ (২)

মানে, ভক্ত ঐ লোকে ইষ্টদেবতার সান্নিধ্যে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সুখে বাস করেন, তারপর ইষ্ট মূর্ত্তির সঙ্গে পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান ; দেবযান গতির এই নিঃশ্রেয়স লাভ। মুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হয়েছে—

"বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥

এই দেবযান পথে অব্যয় অমৃত লোকে গমন হয়, এই দুই গতি সহজ গতি, আর শুক্লাগতি বলে বিখ্যাত। তা ছাড়া আর এক রকম গতি আছে মা, তার নাম ঐশী গতি, সে গতির কথা তোমাকে আর একদিন বলবো, আজ শুধু জেনে রাখ, যে, দেবযান শুধু পুণ্যগতি। কিন্তু ধূমযান গতি পাপ পুণ্যের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তাই ধূমযান পথে পিতৃলোক. নরলোক বা প্রেত লোকে যেতে পারা যায় কিন্তু দেবযান গতি জ্যোতির পথ ; জ্যোতিমার্গ ঊর্দ্ধগামী, তাই জীবের সব সময়ই বলা উচিত— 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' আমায় জ্যোতিমার্গে নিয়ে চল, আমায় ঊর্দ্ধগতি দাও।

উজ্জ্বলা আনন্দে নিশ্চুপে বসেছিল, এতক্ষণে বললো,

—দীক্ষা নেওয়ার পর আমি কি দেবযান গতি পেতে পারি দেব ?

—হ্যাঁ মা, তোমার দেবযান গতি পূর্ব্বেই পাওয়া উচিৎ ছিল। তোমার সল্প পরিসর এই মানুষ-জন্মে বিশেষ কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করতে পার নি। কিন্তু তুমি প্রেম সাধনা করেছ, প্রিয়তমের জন্য আত্মবিলোপ করেছ, আত্মসুখ ত্যাগ করে তুমি মহাশক্তির আশ্রয়ে এসে নিজেকে তাঁর চরণপদ্মে সমর্পণ করে প্রার্থনা করছে "আবিরাবির্ম এধি" এসো,

(২) মুণ্ডক শ্রুতি।

'আমার সম্মুখে অবিভূ্ত হও মা, আমায় অসৎ থেকে সৎ এ নিয়ে চল,” এই আত্মসমর্পণ তোমাকে দেবযান গতি দান করতো। কিন্তু তুমি মর-জগতের অর্দ্ধাঙ্গের জন্য মনঃপীড়া পাচ্ছ, তাই সল্পকালের জন্য ধূমযান গতি পেতে হোল তোমায়।

—তা হলে সেই মনঃপীড়া তো আমার এখনও রয়েছে প্রভু! জলা ভয়ে ভয়ে বললো।

—হ্যাঁ রয়েছে, কিন্তু থাকবে না। তুমি সমীরের হিতার্থে অনেক দুঃখ সয়েছ, অনেক চেষ্টা করেছ, তোমারই পুণ্যবলে সমীর মীন লগ্নে জন্মেছে, উচ্চগৃহ কর্কটস্থ বৃহস্পতি তার তনু রক্ষা করছেন, প্রসন্ন নবম দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন, তবু তার কর্মফল মা, সে নীচস্থ মঙ্গলের কুদৃষ্টিতে পড়েছে, তাই হঠাৎ সেদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ঐ নির্ব্বোধ এখনও বিশ্বাস করে না যে সে কত নগণ্য, কত ক্ষুদ্র। আধুনিক পৃথিবীর কয়েকটা তুচ্ছ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখে সে মনে করে, ঈশ্বর বলে কিছু নাই, জীবের ধ্বংস হয় তার চিতায়, আর মৃত্যুর পর থাকে ছাই, আর কার্বন-অক্সিজেন! কিন্তু এ ভুল তার ভাঙবে; তবে ওকে আরো কিছু দিন দুঃখ পেতে হবে মা!

—অমন বাপের ছেলে ....জলা অতি দুঃখে বললো কথাটা।

—ওর প্রাক্তন মা, নইলে তোমার মতন দেবপিণ্ডধারী মেয়ে এত জন্ম ওর জন্যে ব্যয় করলে, তবুও ওর তো বিশেষ কোন উন্নতি হোল না। আচ্ছা মা জলা, আজ আর বেশী সময় নেই, চলো, তোমায় দীক্ষা দেব।

জলা পরমানন্দে পুষ্প চয়ন করলো, সমস্ত আয়োজন করলো, তারপর গুরুদেবের কাছে বসে মন্ত্র গ্রহণ করলো,—পবিত্র শক্তি মন্ত্র। সর্বশরীর যেন একটা অনৈসর্গিক বিদ্যুৎ-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে ওর। অঙ্গের প্রতি জ্যোতিকণায় আনন্দ শিহরণ জাগছে। সে কি বিপুল

আনন্দ, জলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে না তো? এতো আনন্দের বেগ ও সইবে কেমন করে? গুরুদেব প্রসন্ন হেসে বললেন—তুমি শক্তির অংশ মা; তুমিই শক্তি, একমনে চিন্তা কর, জপ কর, দেখবে, তুমি তাতেই পরিণত হয়ে যাবে; আবার তাঁর পাদপদ্মের পূজারিণী হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁরই সঙ্গে লীলা করবে, সেই আনন্দ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সইবার মত শক্তি তিনিই দেবেন তোমায়। আশীর্ব্বাদ করি মা, তোমার দিব্য গতিতে ইষ্ট লাভ হোক।

গুরুদেব চলে যাচ্ছেন, জলা আবার সর্ব্বাঙ্গ নত করে প্রণাম করে বললো,

—বড় একা বোধ হয়, প্রভু, মাঝে মাঝে শ্রীচরণ দর্শন পাই যেন।

—আচ্ছা মা, স্মরণ ককলেই আসবো আমি, তবে বিনা প্রয়োজনে ডেকোনা। ওখানেও সাধনা উপাসনা করতে হয়, সময় কম। তাছাড়া তুমি এখন স্বর্লোকের চতুর্থ স্তর এবং আর কিছুদিন পরে পঞ্চমস্তর অবধি যেতে পারবে, কাজেই অপ্সরোলোক গন্ধর্বলোক, কিন্নর লোকে বেড়াতে যেও, তা ছাড়া তোমার সখীরাও আসবেন; আসি মা আজ। বলে উনি পূর্বের নীলাভ আলোকবিন্দুর মত ঊর্দ্ধাকাশে উঠে গেলেন।

জলা বারম্বার নতজানু হয়ে প্রণাম করলো ওঁর উদ্দেশে, তারপর উঠে অনুভব করলো, অপূর্ব এক জ্যোতির্ময় দেহ সে লাভ করেছে; সে জ্যোতি পৃথিবীর কোন আলোর সঙ্গেই মেলেনা। জলা বুঝলো, তার সূর্য্য-পথে দেবযান গতি লাভ হলো এবার। আবার প্রণাম করলো জলা।

* * *

আনন্দ-আবেগটা সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো জলার। গুরুদেব ঊর্দ্ধাকাশে বিলীন হয়ে গেছেন কতক্ষণ, জলা তবু ঐ দিক প্যানে চেয়েছিল। মনে হচ্ছিল, সেও ঐ আলোক পথের যাত্রী, অনন্ত লোকে লোকান্তরে অন্তহীন তারও যাত্রা, কত দূর গ্রহে, উপগ্রহে, কত দূর

নীহারিকা পুঞ্জে, কত দূরতম কারণ-সমুদ্রে সেও যাবে, বৈচিত্রময়ী প্রকৃতির কত রূপ, কত বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করবে, অনন্ত লীলাময়ের অসীম লীলার স্পন্দনে নৃত্য করবে আনন্দে, তার তুলনায় কত তুচ্ছ ঐ ধরণীর মায়া-মোহঘেরা দু'দিনের নশ্বর সুখভোগ, কতই বা তুচ্ছ এই স্বর্গলোকের নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-বিলাস! ঐ ভূমার পথে, ঐ অনন্তের অনুসন্ধানে যাত্রা-করার যে আনন্দ, তার, স্মরণেই জলার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছে, সে আনন্দ লাভ করলে জলার চৈতন্য হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নইলে আমিত্বের অহঙ্কার থেকে মুক্তি কোথায়? ঐ অহঙ্কারই তো বুদ্ধির মূলে থেকে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভ্রম-জন্মায়, ওকে হত-চৈতন্য করতে হবে; না, ওকে শেখাতে হবে যে 'আমি'অন্য কেউ নই,"আমি তিনিই"।

জলা গভীর ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছে, হঠাৎ কলকাকলি ভেসে এল কানে। তার যেন ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল অসময়ে, এমনি একটা ক্ষুব্ধতা মনকে পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু এসে উপস্থিত হলো ওর বান্ধবী আশা আর উপাসনা, সঙ্গে আর দু'টি মেয়ে, নাম প্রীতি আর স্নেহ। এতো সুন্দর এই নবাগত মেয়ে দুটির চেহারা যে জলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিকারের সৃষ্টির মধ্যেও তার উপমা খুঁজে পেলনা। নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের। ওরা মধুরতম হাসি দিয়ে জলাকে জড়িয়ে ধরে বললো—

—জীব নিজেকেই ভুলে থাকে, তা বন্ধু বান্ধবকে ভুলবে, বেশী কি কথা?

—কেন এমন কথা বলছো ভাই? আমি কি চিনি তোমাদের?

—বারে-বা! কত যুগ যুগান্তর ধরে আমরা তোমার কাছে রয়েছি। এখন বলো, চেনো কিনা? মানে, এখন তুমি ভক্তি আর প্রেমকে খুঁজছো, বেশ, আমরা তাহলে·········

ব্যাকুল হয়ে জলা দুহাতে ওদের জড়িয়ে ধরে বললো.—রক্ষ্যে করো ভাই, তোমাদের না পেলে ভক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে কে? আর প্রেম দেবীকে চিনবো কি করে? ওরা হাসলো, বললো.—তোমায় ভালবাসি জলা, তোমায় ছেড়ে যাব কোথায়? তবে, তুমি আজ কাল ভক্তি আর প্রেমের খোঁজে ফিরছো, দেখছি। তাই ভাবলাম, দেখে আসি একবার, তাঁদের পেতে তোমার কত দেরী।

—এসো ভাই, বসো, আজ আমার বড় সৌভাগ্যের দিন। আমার দীক্ষা লাভ হয়েছে।

—জানি! এখন ব্রাহ্মণ ভোজন না হোক, সখী ভোজন করাও।

ভোজনের আয়োজন স্বর্গের ও-স্তরে সুপ্রচুর, জলা অতি সামান্য মাত্র গ্রহণ করে; কারণ সে উচ্চ লোকের আত্মা ছিল, আবার উচ্চলোকে যাবে, তাই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এদের জন্য পরিচারিকাকে ডাক দিল।

সবাই হেসে উঠলো ওরা, শুধু আশা নামে মেয়েটি হাসলো না, ওর মুখখানা বড্ড করুণ। উপাসনা বললো—থাম জলা, আমরা কেউ খেতে আসিনি। তোর এখানকার খাবার আমাদেরই মুখে রোচেনা, তা ওরা তো পঞ্চম লোকের বাসিন্দা. ওরা খাবে কি করে? থাক, আজ সোমবার, পৃথিবীতে তোকে যেতে হবে না?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো রাত্রে, এখন পৃথিবীতে বেলা দু'টার বেশী নয়।

—হোক না, চল। প্রীতিদেবী আর স্নেহদেবী যাচ্ছেন, আশার যাবার দরকার আছে। আমিও যাই, ওকে একবার দেখে আসি।

—কোথায় তোর উনি? জলা হেসেই প্রশ্ন করলো। স্নেহ দেবী বললেন,—চলনা দেখবি, ওর উনি আছেন বিন্ধ্যচলের এক বামুনের বাড়ীতে, বয়স মোটে সাড়ে তিন। সবাই হাসছে, কিন্তু আশার মুখ অত্যন্ত মলিন।

—তোর কি হয়েছে ভাই আশা ? জলা ওর চিবুকে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলো।

—চল, দেখবি। আশা অনন্ত, তাই আমার কিছু হতে নাই ভাই ; আশা করেই তিনটে পুরো দিব্য বছর কেটে গেল, কিছুই তো হোলনা ! আশা কাঁদতে কাঁদতে বললো। জলা কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু আশা উঠে বললো,—আর বেশী সময় নেই, যাই আমি। ও আগেই বেরিয়ে পড়লো, পেছনে ওরা চারজন। আশার সঙ্গ নিতে বেশী দেরী হলো না ওদের। আশা কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলছেনা, নীরবে চলেছে। জলা বুঝতে পারছেনা ব্যাপারটা। সূর্য্যরশ্মির সমান ওদের গতি, তবুও কি অসীম দূরত্ব বোধ হচ্ছে জলার। যেন কত দূর ! পৃথিবীর আকাশে পৌছেই জলা দেখলো,. হরিদ্বার। দূরে পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া নীল আকাশের ভেতর আরো নিবিড় নীল। লঘু মেঘ ভেদ করে ওরা বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মধ্যে এসে পড়লো ; তারপর স্বচ্ছ আকাশ দেখা গেল ; নীচে মাতা ধরিত্রীর শ্যামলাঞ্চল বিছানো। প্রশস্ত কোল পেতে মা যেন অপেক্ষা করছেন সন্তানের ফেরবার জন্য। দূরে মন্দিরের দিকে ফিরে প্রণাম করলো ওরা। আশা কাঁদছে আর বলছে,—কত দিন, কতকাল আর আমি এমন করে কাঁদবো প্রভু ! আমি আর পারিনা, আমার আশা আর রাখতে পারছিনা আমি।

সবাই মিলে আশাকে ধরে নিয়ে আসতে হচ্ছে, হাহাকার করে কাঁদছে আশা। ওকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না।

কোন রকমে আশাকে ধরে ওরা একটি ছোট গ্রামে এসে পৌছালো। গ্রামের প্রান্তে ছো একটা কুঁড়ে, একজন বুড়ো ঘুমুচ্ছে, আর একজন বুড়ী কাঁথা শেলাই করছে। একটি সধবা বৌ ঘরের কাজ

কর্ম করে বেড়াচ্ছে। আশা দেখে বললো,—এরা জানে না কী সর্ব্বনাশ হবে ওদের আজ !

বাড়ীটা দেখলেই বোঝা যায়, গোয়ালা বাড়ী। গরুর গোহাল, খড় জাব দেবার জায়গা, গরু বাঁধবার খুঁটো ইত্যাদি রয়েছে অনেক। কিন্তু যাকে এরা খুঁজতে এসেছে সে নাই। প্রীতি দেবী বললো, আমি জানতাম নেই, তবু আশা ওর শ্বশুর বাড়ীটা শেষ বারের মত দেখে নিক, ভেবে কিছু বলিনি। হাসলো প্রীতি। আশা কাঁদছিল, স্নেহ দেবী ওকে ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললো, চল, বাথানে যাই। পর মুহূর্ত্তে ওরা একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের উপর এসে দাঁড়ালো, দেখলো, মস্ত বড় একটা গাছের ছায়াতে ছুটি ছেলে, আট-দশ বছর হবে তাদের বয়স, ঘুমুচ্ছে, আর তিনটে ছেলে কড়ি নিয়ে অনেকটা দূরে খেলা করছে অন্য একটা গাছের ছায়ায়, একটা ছেলে মস্ত বড় একটা মোষের পিঠে চড়ে দেখছে এদের খেলা। যে ছেলে ছুটো ঘুমুচ্ছে তাদেরই একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আশা। আহা! কি তার কান্না, দেখে জলার বড় কষ্ট হতে লাগলো। শুধুলো,—

—ব্যপার কি আশা ? আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনা।

—একশ' আট জন্ম হোল ওকে আমি হারিয়েছি জলা, কত জায়গায় কতবার ও জন্ম নিল পৃথিবীতে। পৃথিবী কর্মভূমি, সেখানে বেঁচে থেকে কর্ম করে ও যে উন্নতি লাভ করে উর্দ্ধগতি লাভ করবে, তার সুযোগ পাচ্ছেনা। কোনো বার জলে ডুবে, কোনো বার গাড়ী চাপা পড়ে, কোনো বার বন্দুকের গুলিতে, কোন বার আগুনে পুড়ে ও পৃথিবীর দেহ বদলেছে। এবার সাপে কামড়াবে— ঐ দেখ !

আশা হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললো,—ওকে অনেক কষ্টে আমি গঙ্গাগর্ভের এই পুণ্য মৃত্তিকায় জন্মাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, যদি

বেঁচে থেকে কোন দিন সাধু সন্ন্যাসীর সংযোগে এসে শ্রীশ্রীভগবানকে দেখতে চায় তো কিছু পুণ্য সঞ্চিত হতে পারবে। কিন্তু সব মিথ্যা হোল!

জলা এবং অন্য সবাই দেখতে পেল, গাছটার কোটর থেকে একটি কালো রঙের সাপ বেরিয়ে আসছে! কালরূপী মৃত্যু, বুঝতে বাকি রইলো না কারু। আশা তার অদৃশ্য শরীর দিয়ে ছেলেটির সারা দেহ ঘিরে কাঁদছে। জলা বললো——জাগিয়ে দে না ভাই! উঠে সাপটাকে তাড়িয়ে দিক।

—প্রাক্তন, হেসে বললো প্রীতি দেবী।— এজন্মেও ওর অপঘাতমৃত্যু হবে।

এর মধ্যে সাপটি এগিয়ে এসেছে ছেলেটার কাছে। জ্যৈষ্ঠের দুপুর বেলা, গরমে ঘামছিল ছেলে দুটোই। ওদের সুন্দর গায়ে শিশির বিন্দুর মত ঘাম ঝিলমিল করছে। সাপটি এসে বুকের খাঁজের ঘাম চাটতে লাগলো। ছেলেটার গা হয়তো শির শির করে উঠেছে, ঘুমের ঘোরেই বাঁহাত দিয়ে একটা ঝটকা মারলো সাপটার গায়ে; সঙ্গে সঙ্গে—ফোঁস! বাহুমূলে ছোবল মেরে সাপটা সোঁ সোঁ করে চলে যাচ্ছে,। যন্ত্রণায়—মাগো! বলে উঠে বসলো ছেলেটা, বেশ দেখতে মুখখানা, কিন্তু বিকৃত হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। চীৎকার করে ও সঙ্গীদের ডাক দিল—সাপ হ্যায়রে, এ ভেইয়া, জলদী আও,—নেতিয়ে পড়লো। ডাক শুনেই ছেলেগুলো সবাই ছুটে এল খেলা ফেলে, কিন্তু ওকে বয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া তাদের অসাধ্য। একজন ছুটলো বাড়ীতে খবর দিতে—আর একজন রোজা ডাকতে। আশা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে কাঁদচে, জলার মনে বড় ব্যথা জাগছে সে কান্নায়। প্রীতি আর স্নেহ আশাকে কোলে চেপে ধরে রেখেছে। উপাসনাও কাঁদতে লাগলো।

ছেলেটির মা, ঠাকুর দা, ঠাকুর মা, ছুটতে ছুটতে এল, রোজাও এল একটু পরে। কিন্তু কিছুই করতে পারলো না তারা; আধ ঘণ্টার

মধ্যেই ছেলেটার মৃত্যু হোল। মরেছে অর্থাৎ ওর পার্থিব দেহের অন্নময় কোষগুলি পচতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তার দেহ থেকে আত্মা বের হচ্ছে না।

জলা অবাক হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আশা জানে, এই রকম আকস্মিক্ মৃত্যু ঘটলে জীবাত্মা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, বুঝতেই পারেনা যে সে মরেছে। জলা আরেকবার এই কথা শুনেছিল, জিজ্ঞাসা করলো,—সে মূর্চ্ছা ভাঙবে কি করে আশা?

—শ্রাদ্ধ-তর্পণ এই সব ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করলে ভাঙে। কিন্তু এই মুখ্যুরা কি ওসব করবে?

—তা ছাড়া আর এক ভয় আছে আশা, উপাসনা বললো, তুই থাক এখানে নইলে ওর দেহটা নিয়ে গিয়ে কেউ যদি শব-সাধনা করে, তা হলে ওর মুক্তির বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

আশা আরও কাঁদতে লাগলো এই কথা শুনে। ছেলেটার মা, বাবা, ঠাকুরদা এবং গাঁয়ের আরো অনেক লোক কাঁদচে, চেঁচাচ্ছে, কথা বলছে; আশার কান্না তারা শুনতে পাচ্ছে না।

প্রায় দণ্ডদুই পরে যেন ঘুম ভাঙলো এমনি ভাবে ছেলেটার দেহ থেকে আস্তে একটা ধূমময় দেহ উঠে আসছে। জমাট ধোঁয়ায় যেন তৈরী দেহখানা, রঙ নীলচে। আশা উঠে বসে দেখতে লাগলো। ধোঁয়ার দেহ খানা উঠেই অবাক হয়ে চাইলে তার মা, বাবা, ঠাকুরদা আর বাকী লোক গুলোর পানে—বললো—

—আরে! কাঁহে রোতা হ্যায় মাই, ক্যা হুয়া? আশ্চর্য্য হয়ে ও প্রশ্ন করছে। কিন্তু কেউ ওরা তার কথা শুনতে পাচ্ছেনা, কাঁদছে। এদিকে, বেলা বেশী নাই আর; গরু মোষগুলি এখানে সেখানে চরে বেড়াচ্ছিল। ছেলেটা সেই দিকে চেয়ে ছুটলো গরু মোষগুলোকে ঘরে নিয়ে যাবার

লেগে ; যেন ও বেঁচেই আছে ! আশাও ছুটলো পিছনে। কিন্তু আশার অতি সূক্ষ্মদেহ ও দেখতেই পাচ্ছে না। গরুগুলোকে বাড়ী অবধি তাড়িয়ে নিয়ে গেল ছেলেটা, তারপর আবার ফিরে এল এখানেই ; বললো,—কাহে রোতা হ্যায় সব ? এ মায়ি ?—কেউ শুনচে না। ব্যাকুল হয়ে ছেলেটা বলল—তুম লোক সব বুড়বক বন্ গিয়া দেখতা ! বলেই সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ঐ গাছেই ঝোলান একটা দড়িতে বসে দোল খেতে আরম্ভ করলো। যেমন করে গরু চরাবার সময় প্রতিদিন ওরা দোল খায়। আশা কাছে গিয়ে ডাকলো,—আলো, শুনছো ? আমার সঙ্গে যাবে এবার, এসো।

ও দোল খাচ্ছে ; কথাতো শুনলোই না, দেখতেও পেলনা আশাকে বা ওদের কারুকেই। আশা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে, কিছুতেই সরে যেতে চাইছে না। এরাও আশাকে ছেড়ে যেতে পারছেনা। অকস্মাৎ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো। ঊর্দ্ধ আকাশে অপূর্ব্ব এক জ্যোতি বিন্দু দেখা যাচ্ছে। সে জ্যোতিতে সূর্য্যালোকের উজ্জ্বলতা আর শুভ্রতা রয়েছে অথচ প্রাখর্য্য নাই। বহু বহু দূর গগনে ঐ জ্যোতি। কিন্তু এদের সূক্ষ্ম দৈব দৃষ্টিশক্তি অত দূরের আলোকও দেখতে পায়। উপাসনা বললো অপ্সরী ! প্রীতি বললো—না—উনি হয়তো সাবিত্রী। স্নেহ বললো, হয়তো শ্রীচণ্ডীদাস বা শ্রীজয়দেব বা ঐ রকম কেউ হবেন।

—দেবতা নন, উনি কোনো দেবী বোধ হয়—প্রেমদেবী ; মহাভাবরূপা শ্রীরাধার সখী উনি, তাই বদরী নারায়ণের মন্দির দ্বারা আজ উন্মোচন হবে দেখতে যাচ্ছেন,—বললো প্রীতি।

জ্যোতি বিন্দু নিকটতর হয়ে এলো, এবার স্পষ্ট দেখা গেল, সহস্র শ্বেত শতদলের লাবণ্য দিয়ে গড়া শুভ্র পবিত্র এক দেবী প্রতিমা; হাতে তাঁর বনমালা, মৃগমদ, কস্তুরী, কুঙ্কুম দিয়ে সাজানো অর্ঘ্যপাত্র। মুখে মৃদু হাসি,

চোখে লোকাতীত জগতের প্রেম-জ্যোতি। উপাসনাই সর্ব্বাগ্রে চিনতে পারলো। বললো—মহা-সরস্বতী—প্রণাম কর।

সবাই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো। আকাশ-পথে দেবী আশীর্ব্বাদ করেই চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু আশা আকুল হয়ে কেঁদে বললো—মা, মা, আমাকে আর কত আশার কথা শুনতে হবে মা? দেবীর স্নিগ্ধ হাসিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হয়ে উঠলো, বললেন,—কি হোল আশা? পরমুহূর্ত্তেই উনি এসে দাঁড়ালেন ওদের কাছে। সবই বুঝলেন তৎক্ষণাৎ হেসেই বললেন, —কাঁদছিস কেন?

—ঐ দেখ মা, প্রেত হয়ে দোল খাচ্ছে আলো।

—না, আশা, এ স্থান মা গঙ্গার গর্ভ, আর শ্রীভগবানের মন্দিরের প্রবেশ দ্বার,—তাই এর নাম হরিদ্বার। এখানে দেহত্যাগ করলে কেউ প্রেত হয়না। যে যে-ভাবেই দেহত্যাগ করুক, এই মাটির প্রতিকণা শ্রীভগবানের পদরেণু-পূতঃ মা-গঙ্গার আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত। আজ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন; ভগবানের মন্দির দ্বার উন্মোচন করা হবে, তাই দেখতে যাচ্ছি আমি. আয়, তোরাও দেখবি। আলোকেও নিয়ে আয়।

—ও যে কোন কথা শুনতে পাচ্ছে না মা। ও মূর্চ্ছা গেছে, তুমি মূর্চ্ছা ভেঙে দাও মা ওর!

আশা ব্যাকুল হয়ে মা'র পায়ে ধরতে গেল। মা বললেন—ও মূর্চ্ছা সাময়িক! হরিদ্বারে এসে তুই কেবলই কেঁদেছিস ওর জন্য; একবার হরিনাম করলিনা, বোকা মেয়ে, ডাক একবার "বদরী বিশালা কি জয়"—বলে ডাক, তোর সব দুঃখ জুড়িয়ে যাবে।

সকলে একসঙ্গে ওরা হরিনাম করলো, ''হরে মুরারে মধুকৈটভারে……"আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! আলোর ধূমময় দেহ জ্যোতিকণায়

বিছানায় তোর ফুলশয্যা হবে উপাসনা? ছেঁড়া কাঁথা, তাতে আবার বোঁটকা গন্ধ!

—দেখনা কাণ্ড! বলে উপাসনা গিয়ে বসলো ছেলেটার মাথার কাছটিতে, বললো,—শুনছো, ওগো! ও বর, ওঠ, আমি এলাম যে!—

সাড়ে তিন বছরের একটা ছেলের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে শুনে জলার খুব হাসি পাচ্ছে, কিন্তু ও জানে, এরকম তারও হয়েছিল। উপাসনার কাছে বিদায় নিয়ে জলা চলে এল ধানবাদে।

* * * *

কাল সিলোন রওনা হতে হবে সমীরকে। সারাদিনটাই গোছগাছ করতে কেটেছে। বাড়ীর কথা, বাবার কথা, ভাই বোনদের কথা পর্য্যন্ত ভাববার অবসর পায়নি সমীর। রাত ন'টা নাগাদ গোছানো সব শেষ করে স্নান করে সে খেতে বসলো। ক্লান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ ভেঙে পড়ছে, তবু ঘুমোবার কোন লক্ষণ নাই সমীরের। মনের মধ্যে নিঃসহ একটা উৎসব যেন চলছিল ওর। নূতন দেশ দেখবে, নূতন ভাবে কর্মজীবন আরম্ভ করবে, প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করবে, তারপর একবার বিলাত যাবে; বড় ইচ্ছে ওর বিলাত যাবার। আর্থিক অনটনে হয়ে উঠেনি; এবার হয়তো ভাগ্য প্রসন্ন।

বন্ধু-বান্ধবরা খুব উৎসাহ দিচ্ছে, একজন তো গান গেয়েই শুনিয়ে দিল, যে সমীর লঙ্কায় গিয়ে রাবণ না হয়ে যায়। হাসছিল সমীর কথাটা শুনে। কিন্তু এর মধ্যে জলা ঐ খাবার ঘরের দরজায় পৌছেছে, শুনলো কথাটা। মনের মধ্যে শিউরে উঠলো সে। একটা কথা আছে—"যে যায় লঙ্কায় সেই নাকি হয় রাবণ!" দুত্তু, ওটা কথার কথা! নিজকে সান্ত্বনা দিল জলা। কিন্তু সমীরের ঘুমুতে এখনো দু'তিন ঘণ্টা দেরী হবে ততক্ষণ জলা করবে কি?

এত সকাল সকাল এসে ভাল করেনি সে। জলা সমীরের শোবার ঘরটাতে ঢুকলো, বাক্স বিছানা সব বাঁধা, লেবেল আঁটা, টেবিলের উপর টিকিট ; সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ করেছে সমীর। এখন আর ওকে সিলোন যেতে মানা করা বৃথা, শুনবেনা। জলার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সিলোন অবশ্য এমন কিছু বেশি দূর দেশ নয়, জলার কাছে তো নয়ই। তারপক্ষে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। কিন্তু ঐ যে কথাটা “যে যায় লঙ্কার ……।’ না, ওসব কিছু নয়। সমীর যেখানেই যাক্, সে তার সমীরই থাকবে। ভাবছে জলা, তবু ওর দৈবী হৃদয় যেন আশঙ্কিত হচ্ছে।

জানালা দিয়ে দূরে একটা পাহাড় দেখা যায়—বহু দূরে। তার ত্রিকোণাকার চুঁড়াটি জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশে যেন ধ্যানমৌন। ঐখানেই গিয়ে খানিক অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হোল জলার। সমীর শুয়ে ঘুমুলে সে আবার আসবে সমীরের সঙ্গে কথা বলতে। জলা ঐ পাহাড়ের মাথাতেই বসলো গিয়ে একখণ্ড পাথরে। জায়গাটা খুবই নির্জন। ছোট শাল পিয়ালের বন। কয়েকটা বুনো শূয়োর দলবেঁধে চলে গেল। জ্যোৎস্নাকে ভোরের আলো ভেবে কয়েকটা পাখী কিচির মিচির করছে। আর সব শান্ত, নিঝুম। প্রকৃতির এই মৌন রূপ বড় ভাল লাগছে জলার। এইখানে বসে যেন সারা পৃথিবীর প্রাণ-সত্বার কথা ভাবা যায়, যেন মৌন প্রকৃতি কানে কানে কথা কয় নবোঢ়া বধূর মত :

সুন্দর ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে ভাসছে। জলা গিয়েছিল ঐ চন্দ্রলোকে, দেখেছে স্বয়ং চন্দ্রদেবকেও। সেই কথাটা মনে পড়লো, আর মনে পড়লো কণার কথা, অনীলের কথা, আর সেই ছোট্ট বাড়ীটির কথা। আর একবার আজ ওখানে যাবে জলা। কণাকে দেখে যাবে তার ফিরে যাবার পথে। চোখ ফিরিয়ে জলা পৃথিবীকে দেখলো। গাছের পাতায়

পাতায় জ্যোৎস্না, মৃদু মৃদু বাতাসে ফুলের গন্ধ আর নানারকম পোকা-মাকড়ের অদ্ভুত সুর; সে সুরেও ছন্দ আছে। একমনে শুনছিল জলা দূরপানে চেয়ে। তার দৈবী দৃষ্টি বহুদূর দেখতে পায়; তাকিয়ে দেখে নিল, সমীর এখনো শোয়নি। শুতে হয়তো আরো অনেক দেরী হবে।

—হর হর ব্যোম ব্যোম, ব্যোম শঙ্কর!

কে কোথায় শিব পূজা করেছেন? কে? কোথায়? জলা এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলনা কাছে, তখন দূর পানে তাকালো। দূরে পরেশনাথ পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গ দেখা যায়। আর সেইখানেই জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী ধ্যান শেষ করে উঠছেন। জলা মুহূর্ত্ত দেরী না করে ওঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলো ভূমিলগ্ন হয়ে। চেয়ে দেখলো—কি সুন্দর সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি। বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশ, ধরবার উপায় মাত্র নেই, শুধু চুলগুলি জটা বাঁধা আর দাড়ী কাঁচা পাকা, চোখের দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য্য জ্যোতি। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলেন,—স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও মা, বসো।

জলা যোড় হাত করে বসলো ওঁর সুমুখে। বললো,—

—এখানে এসে আপনার তপস্যার বিঘ্ন করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি প্রভু। সন্ন্যাসী মধুর হেসে বললেন—তুমি ঊর্দ্ধ লোকের আত্মা মা। তোমাকে দেখলেও পুণ্য হয়। তপস্যার বিঘ্ন করবে কেন? আমি তোমায় বসে থাকতে দেখে ডাকলাম। কিন্তু মা, তুমি বিদেহী, পার্থিব ফলমূল তো...... বলেই উনি একটু ভাবলেন, পরে বললেন, অপেক্ষা কর মা, আমি গয়াতে গিয়ে তোমার নামে পিণ্ড দান করবো।

—না প্রভু! সে আর একদিন করবেন। আজ আপনার কাছে বসে একটুক্ষণ সৎকথা শুনতে চাই। প্রভু, আপনি এখনও মানব-দেহে আছেন?

—হ্যাঁ মা, মানবদেহ রক্ষা করছি ইচ্ছা করেই। দু'শো বছরের কিছু বেশী হবে এবার পৃথিবীতে এসেছিলাম; মনে হচ্ছে যেন সে-দিন।

—কেন প্রভু? এত দীর্ঘ কাল মানবদেহ রক্ষা করবার কি প্রয়োজন?

—প্রয়োজন আছে মা জলা, মানবদেহ আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেহ।

প্রারব্ধ, প্রাক্তন ছাড়াও ক্রিয়মান কর্ম এই মানব দেহেই করা যায়। স্বর্গে তো কোন নূতন কর্ম নেই মা! * সেখানে শুধু সুখ ভোগ। তাই সন্ন্যাস গ্রহণ কালে প্রতিজ্ঞা করতে হয় "ভূঃ ভূবঃ স্বর্লোক কামনা করবো না।"

—স্বর্গলোক সন্ন্যাসীরা চান না তাহলে?

—না; স্বর্গ কামনা ভোগীর। ভোগ শেষে আবার জন্ম হবে। সন্ন্যাস ব্রহ্মলাভের পথ মা, তুচ্ছ স্বর্গভোগ নিয়ে কি হবে? এই পৃথিবী কর্মভূমি; প্রবৃত্তিকে সৎ বা অসৎ পথে, সুন্দর বা অসুন্দরের আরাধনায় নিয়োজিত করার মত স্বাধীন ইচ্ছাটুকু জীব এইখানে সক্রিয় রাখতে পারে অধিক পরিমাণে, তাই কর্ম করবার জন্য মানব-দেহ দরকার। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। আজো মনে হয়, আরো শত শত বৎসর লাগবে।

—বলেন কি প্রভু! আপনার মত মহাসাধকের মুখে এই কথা!

—না মা, মহাসাধক তিনি যাঁর চরণারবিন্দের এক কণা কৃপার জন্য আমি জন্ম-জন্মান্তর কেঁদে বেড়াচ্ছি। আমার উপাস্য মহারুদ্র, এই ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের কর্ত্তা তিনি। তিনিই আমার এই মায়িক দেহেরও ধ্বংসের কর্ত্তা।

জলা বিস্মিত হয়ে বললো—কিন্তু মানব দেহ ছাড়া কি তাঁর উপাসনা হয় না প্রভু?

—হয়, কিন্তু স্বর্গে নয়! স্বর্গে এত ভোগ বিলাসের প্রলোভন আছে যে উপাসনার দিকে মন দেওয়া কঠিন। তারপর, ভোগ শেষ হলেই পতনের আশঙ্কা রয়েছে। কর্মের জন্য নরদেহই সব থেকে উৎকৃষ্ট মা। জান জলা, আমাদের সাধক কবি শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

এসব সাধকের মুখের কথা মা, আপ্ত বাক্য; ঐ দুচরণ গানেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, নরদেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্মভূমি, আবাদ করলে তাতে সোনা ফলে যায়।

---

* ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে—মহাভারত বনপর্ব্ব

আমাদের দেশের যোগীরা তাই নেতি ধৌতি করে দীর্ঘকাল শরীর ধারণ করবার ব্যবস্থা করতেন। আমার গুরুদেব সাড়ে আটশো বছর শরীর রেখেছিলেন মা।

—আপনি এই দীর্ঘকাল এখানেই আছেন প্রভু?

—হ্যাঁ, কিন্তু দীর্ঘকাল কোথায়? সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন—অখণ্ড কাল, তাকে ভাগ করে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ এই দু'শ মানব-বর্ষ কত নগণ্য মা জলা! কতটুকু কাজ হয় এতে?

—আমি মোটে তো আঠার বছর বেঁচে ছিলাম প্রভু! আমার গতি কি তা হলে?

—তুমি আরো অনেকবার অনেক বছর বেঁচেছ। তোমার চতুর্থ জন্ম আমি দেখেছি; সেবার তুমি তিরানব্বই বছর বেঁচেছিলে। আর প্রেম ভক্তিতে প্রচুর উন্নতি লাভ করেছিলে। পঞ্চম জন্মেও তোমার সত্তোর বছর পরমায়ু ছিল। তারপর ষষ্ঠ জন্মে পঁচিশ আর সপ্তম জন্মে আঠারো। কিন্তু প্রত্যেক বারই তুমি প্রেম-ভক্তির সাধনা করেছ মা। তুমি নারী, ভক্তি আর প্রেমের পথই তোমার শ্রেষ্ঠ পথ। সে পথে তুমি প্রভূত উন্নতি লাভ করেছ। উচ্চতম ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত তোমার গতি হবে মা।

—আপনি কি আমায় এতদিন থেকে চেনেন প্রভু?—জলা মহা বিস্ময়ে শুধুলো।

—হ্যাঁ মা, তুমি এবার চণ্ডীপুরে ধর্মদাস ঠাকুরের মেয়ে ছিলে। তোমার একটি ভাইপো আছে, নাম প্রণব। আমি তারই জন্য এখানে বসে আছি।

—কেন প্রভু? প্রণবকে নিয়ে কি করবেন আপনি?

—প্রণবকে নিয়ে? সাধুর সুমিষ্ট হাস্যরেখা অমৃতালোকে ভরিয়ে দিল বনভূমি। বললেন—প্রণব আমার পরমাত্মীয় মা, তাকে আমিই সন্ন্যাসে দীক্ষা দান করবো। জানো মা জলা, "গুরু মেলে লাখে লাখ, চেলা মেলে এক।" প্রণবকে দীক্ষা দেবার শক্তি আমার নেই; সে মুক্ত পুরুষ। তবু সে আমারই কাছে দীক্ষা নিতে আসবে, তার মানব দেহের সন্ন্যাসের জন্যে। তারই আসার অপেক্ষায় বসে আছি মা আমি।

জলা প্রায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল কথা শুনে। কিন্তু আত্মসম্বরণ করে বললো,

—সে আর কত দিন পরে প্রভু? কবে প্রণব সন্ন্যাস নেবে?

—বেশী দেরী নাই মা, আর সাত বছর। কিন্তু ভয় পাচ্ছ কেন মা জলা? তোমার পিতৃপুরুষেরা যাতে উন্নত গতি লাভ করেন তারই জন্য প্রণব এসেছে। বংশের কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করলে ঊর্দ্ধতন আর অধঃস্তন সাতপুরুষ উদ্ধার লাভ করে। আর যে গুরু তাকে দীক্ষা দেন, তাঁর ব্রহ্মসাক্ষাৎ লাভ হয়।

জলা চুপ করে রইল খানিক, তারপর বললো—ওর গর্ভধারিণী কিন্তু…কথাটা আর বলতে পারলোনা জলা। কিন্তু সাধু তার মনের কথা জেনেই যেন বললেন,

—তুমি নিজে নারী, তাই ভ্রষ্টাচারটা অত বড় করে দেখছো মা। ওর গর্ভধারিণীর প্রাক্তন কর্মফল ছিল। জাবালার গর্ভে সত্যকাম জন্মেছিলেন, মৎস্যগন্ধার গর্ভে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হয়, এমন আরো অনেক জন্মেছেন মা। এসব বুঝবার শক্তি তোমার তো এখনো হয়ই নাই, আমারও নাই।

রাত অনেকটা হয়েছে, জলা এবার উঠবে কিন্তু সন্ন্যাসী হেসেই বললেন

—সমীর এখনো ঘুমায় নি মা, বসো, আমি ঠিক সময় তোমায় বলে দেবো। সে কাল সিংহল যাচ্ছে, সেই আনন্দের উৎসাহে মনের কোণেও তোমার কথা ভাবছেনা আজ।

—হ্যাঁ! জলার দুঃখ হচ্ছে খুবই, কিন্তু প্রকাশ করবে কি করে এই সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর কাছে!

—দুঃখ করো না মা, সমীর এই মুহূর্ত্তে তোমার কথা ভাবছে না, কিন্তু ভাববে। তবে ওর উপর মঙ্গলের কুদৃষ্টি রয়েছে, তাই ও ডাক্তার হোল এজন্মেও। দেবগুরু বৃহস্পতির মীন গৃহে ওর জন্ম; স্বয়ং দেবগুরু পঞ্চমে কর্কট থেকে নবম দৃষ্টিতে দেখছেন ওকে। গ্রহরাজ শনি অষ্টমে, তাই ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ওকে করতে হবে। কিন্তু মঙ্গল ওকে ধন সম্পদ, ভোগ বিলাস দিয়ে যাতে ওর দৈহিক "পতন না ঘটায়, সেইটেই তুমি দেখো মা, তা হলেই হবে। অবশ্য, কর্মফল ভুগতেই হবে তবে তোমার পুণ্যে ওর মানবদেহ বেশীদিন হয়তো পৃথিবীতে থাকবে না।

জলা কথাটা তার গুরুদেবের কাছেও শুনেছিল, তাই বললো মলিন কণ্ঠে,

—ওকে রক্ষা আমি কি করতে পারবো দেব ?

—তুমি কে মা ? রক্ষা করবেন এই বিশ্বের অধিদেবতা, রক্ষা করবেন বৃহস্পতি, শনি, আদিত্য, চন্দ্রমা। তুমি আমি কেউ নয় মা। ওর প্রাক্তন আর তাঁর করুণাই সব। তবু তুমি লক্ষ্য রাখ; সাবধান কর; ওর মনে দেব-ভাব জাগাও। তোমার যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইল, হঠাৎ সাধু বললেন—আচ্ছা মা, এবার ও ঘুমিয়েছে। যাও তুমি। যখন ইচ্ছা হবে, এসো আমার কাছে।

প্রণাম করে উঠে পড়লো, জলা। তারপর এল সমীরের বিছানার কাছে। ঘুমোচ্ছে সমীর, মুখখানা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। তরুণ উজ্জ্বল বর্ণ জ্যোস্না লেগে চিক্‌মিক্ করছে; ঘেমেছে মুখখানি। উজ্জ্বলার বড্ড মায়া করতে লাগলো। বেঁচে থাকলে সে আজ এই ঘুমন্ত মুখে আঁচল দিয়ে বাতাস করে দিত। ফুলের গন্ধে ঘর খানা ভরে দিত। আরও কত কি করতো। পৃথিবীর নব-বিবাহিত দম্পতির মত কত আদরে সোহাগে সে তার জীবনের এই মহেন্দ্র ক্ষীণটিকে পূর্ণ করতে পারতো। তার অভিসার-রজনী সার্থক হয়ে উঠতো আজ। গভীর বেদনায় জলার অন্তর রিক্ত করে যেন দীর্ঘশ্বাস পড়লো। সে মৃত; কিছুই সে করতে পারছেনা আজ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো জলার—বেঁচে থেকে সে অন্যের পত্নী ছিল এবং তার বাপের বাড়ীর বাইরে এসে সে কোন দিন কুলে কলঙ্ক দিতে পারতো না, সমীরকেও আদর করা হোত না। তার চেয়ে এই ভালই হয়েছে। সমীরের পার্থিব দেহটা একটু কষ্ট পাচ্ছে, তার আর কি করা যাবে! তবু যেন দুঃখটা যাচ্ছে না জলার। সোনার পৃথিবী, সোনার মানুষ, কত সুখ, কত দুঃখ, কত আনন্দ-বেদনাকে আশ্রয় করে, ধ্রুব জেনেও পাকা পোক্ত করে নীড় বেঁধে পরস্পরের হাত ধরে জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করে! ক্লান্ত একজনকে আরেকজন কত আদরে বেষ্টন করে সাথে নিয়ে চলে! এই মৃত্যুভূমি তাই এত মধুর! পৃথিবীকে তাই স্বর্গের চেয়ে বড় মনে হয় অনেক সময়। অথচ কত তুচ্ছ, কত ক্ষণভঙ্গুর এই পার্থিব সুখ! তবু এই বৈষ্ণবী মায়া মানুষকে কেমন আশ্চর্য্য রকমে ভুলিয়ে

রাখে! হোক বৈষ্ণবী মায়া, সেই মায়ার নেশাতেই তো এত দুঃখকেও ভূলে মানুষ আনন্দে থাকে। বিয়োগ বেদনায় হাহাকার করে, আবার মিলনানন্দে গান গেয়ে ওঠে! মায়া হোক—মায়াইবা কি মন্দ! সমীরের মাথার চুলগুলি নাড়ছিল জলা। ওর দৈবী পরশ সমীর টের পাচ্ছে না। সে-দেহ অতি সূক্ষ্ম আলোকের দেহ, তার জ্যোতিটা ইচ্ছাশক্তিবলে যতদূর সম্ভব সম্বরণ করেছে জলা, এবার সমীরকে ডেকে কথা বলতে হবে। ভাবতে লাগলো "গ্রামের শ্মশানে যাবার পথে একটা মস্ত পুকুর আছে; বিস্তর পদ্মফুল ফোটে। একবার সমীর আর জলা ফুল তুলতে গিয়েছিল সেই পুকুরটায়। কলসী নিয়ে দুজনে ভেসে ভেসে ফুল তুলছে, মৃণালের কাঁটায় দুজনেরই গায়ের অনেক জায়গা ছড়ে গেছে, ক্লান্তও হয়েছে খুব। গরমের দুপুর বেলা, হঠাৎ জ্যাঠামশায়, সমীরের বাবা জানতে পেরে আসছেন ওদের ধরতে! ধরতে পারলে আর রক্ষে নেই; সমীরের পিঠের চামড়া যাবে। তাই জলা বললো—তুমি পালাও সমী, আমাকে তো মারবেন না, বকবেন; তুমি পালাও। সমীর ডাঙ্গায় উঠেছে কিন্তু জলা তখনও জলে। ওকে ফেলে সমীর পালাতে চায় না! জলার উঠতে দেরী হচ্ছে, সাঁতার কাটতে পারছে না দল ঠেলে; বড্ড ক্লান্ত। আবার বললো—পালিয়ে যাও সমী। এসে পড়লেন জ্যাঠামশায়। সমীর পালালো। ঐ পুকুরটারই একপারে ভাঙ্গা একখানা পড়ো বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো, আর জলাকে এসে ধরলেন জ্যাঠামশায়। ধরেই দুই চড়, তারপর শুধুলেন— সমীর কৈ? বল্ কোন দিকে গেল?

—পালিয়ে গেছে—বললো জলা।

—আচ্ছা। কদিন পালিয়ে থাকে দেখবো আমি! তুই আয়। বলে জলার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, সমীর তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বললো,—পালাইনি বাবা, ওকে ছেড়ে আমাকে মারুন।

জ্যাঠামশায় ওর দিকে চেয়ে রইলেন, চোখে তাঁর রাগ, বিস্ময়, আনন্দ কত কি যেন!' আর ভাববার দরকার হোল না—জলার চিন্তার ঐকান্তিকতায় ধানবাদের সেই ছোট কোয়াটার সমীরের স্বপ্নে চণ্ডীপুরের পদ্মদীঘিতে পরিণত হোল। জল থেকে উঠে আসার মতন দেহ থেকে বেরিয়ে এল সমীর, বললো,

—উজ্জ্বলা ! তোমাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে উজ্জ্বলা !

—হ্যাঁ, হবে। তোমাকে কিন্তু বড্ড মলিন আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে সমী ! অতদূরে চাকরী নাইবা নিতে ! যেওনা—ছেড়ে দাও ।এখানে তো তুমি ভালই মাইনে পাচ্ছ।

—না উজ্জ্বলা, এখানে যা মাইনে, তাতে চলছে না ; তাছাড়া মানুষের বাঁচতে হলে টাকা পয়সা একটু বেশী দরকার, যাতে ভাল ভাবেই বাঁচা যায়।

—জ্যাঠামশায় অনুমতি দিয়েছেন তো ?

—হ্যাঁ ; কাল সকাল নটার ট্রেণে যাচ্ছি।

—বেশ, এসো গিয়ে। তবে তোমার কাজটা বড্ড খারাপ সমী। সাবধানে থেকো। দূর দেশ, কেউ দেখবার রইলনা তোমায়।

—সিলোন আর এমন কি দূর উজ্জ্বলা। তুমি যাবে তো সেখানে ?

—যাব। তোমার কাছে না গিয়ে উপায় কি আমার ! শোন সমী, আমরা বহুজন্ম ছাড়াছাড়ি, তার কারণ তোমার আত্মার পতন। এবার যেন নিজকে উন্নত করবার চেষ্টা করো সমী। পাপের প্রলোভনে ভুলোনা। আমি তোমাকে উর্দ্ধ, উর্দ্ধতর লোকে নিয়ে যাব।

—অবিশ্বাস করছো উজ্জ্বলা ?

—না ; দোষ তোমার নয়, আমার ভাগ্যের, কিন্তু এবার তুমিও একটু সাবধান হয়ো।

—সাবধান কি আমি হয়নি উজ্জ্বল ?

—হও, কিন্তু তুমি বিশ্বাসই করনা যে ঈশ্বর আছেন, তাই তোমার উপরে কুগ্রহ দৃষ্টি দেয়।

—আচ্ছা উজ্জ্বল, আমার মনে থাকবে।

জলা আর বেশি কথা বলতে চাইলনা আজ। সমীর খানিক ঘুমিয়ে নিক, তাই বললো,—আমি যাচ্ছি, সিলোনেই গিয়ে দেখা করবো শিগ্রি। ও চলে এল ; কিন্তু কান্না পাচ্ছে জলার। সমীর যেন সে সমীর নয়।

মহা উৎসাহে সমীর ট্রেণে উঠলো। নূতন দেশ দেখবার আশা আর টাকা রোজগারের নেশা ছাড়াও আর একটা কি যেন মনকে সজীব করে তুলছে। কি যেন পাবে, কোন এক মহার্ঘ্য বস্তু যেন লাভ হবে ওর। রাত্রের স্বপ্নের কথাটা কিন্তু একেবারে ভুলে গিয়েছে সমীর। ট্রেণ চলছে। একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বসে সিগারেট টানছিল আর সেদিনের ইংরাজি খবরের কাগজখানা পড়ছিল সমীরন। গাড়িটায় আরো অনেক লোক রয়েছে ; নিজেদের মধ্যে কথাবর্ত্তা কইছে তারা, কিন্তু ওদের কেউই সিলোনের যাত্রী নয়, মাঝামাঝি রাস্তায় ওরা নেবে যাবে। সমীর একাই যাবে সিলোন, এদের সবার থেকে বেশীদূর যাবে, গর্ব্ববোধ হচ্ছিল ওর। বাড়ী আর কলকাতা ছাড়া একবার মাত্র সমীর দিল্লী গিয়েছিল পাঠ্যাবস্থায়, তারপর ফিরে এসে কত গল্প যে করতো উজ্জ্বলার কাছে ! যা দেখেছে তার গল্প, যা না দেখেছে তারও গল্প। উজ্জ্বলা তন্ময় হয়ে শুনতো, শুধুতো,——ইন্দ্রপ্রস্থতে ময়দানবের গড়া সেই রাজসভাটা দেখলে সমী ? খুব নাকি সুন্দর ?

—ওঃ ! সে যে কি সুন্দর ! তুই যদি সঙ্গে থাকতিস উজ্জ্বলা, দেখতে আমার আরো ভাল লাগতো তাহলে।

কত মনগড়া কথা যে বলেছিল ! কিন্তু এবার তার সিলোন ভ্রমণকাহিনী কাকে বলবে সমীর ? উজ্জ্বলা নাই। না, আছে। কাল যেন উজ্জ্বলাকে স্বপ্নে দেখেছে সমীর, হ্যাঁ, ঠিক দেখেছে। কাল সোমবার ছিল, আর প্রতিশ্রুতি মত এসেও ছিল উজ্জ্বলা। আশ্চর্য্য তো ! সত্যি সে এসেছিল ? দুৎ ! মরা লোক আবার আসতে পারে ? কিন্তু গত সোমবার এসেছিল উজ্জ্বলা, আর কাল সোমবারও ঠিকইতো তাকে স্বপ্নে দেখেছে সমীর ! আবছা মনে পড়লো, উজ্জ্বলা বলেছে, সিলোনেও সে যাবে। তাহলে মৃত্যুর পর মানুষ সত্যি বেঁচে থাকে ? উজ্জ্বলা মরেনি তাহলে !

কাগজখানায় আর মন লাগছেনা সমীরের। স্বপ্নের কথাটা ঠিক ঠিক মনে করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অনেক দিনের অনেক মনে-না-থাকা স্বপ্নের মত কালকার স্বপ্নটাও মনে পড়ছেনা, শুধু মনে হচ্ছে, উজ্জ্বলা এসেছিল।

স্বপ্ন স্বপ্নই, ওর মধ্যে সত্য খুঁজতে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়না যেন মনকে দুর্বল হতে দেবেনা সমীর। কাগজখানা আবার তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো,—"ভারত মহাসাগরে জাপানী জাহাজ ঘায়েল হয়েছে, কোহিমায় প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে। জার্মানীকে রুশ প্রায় কোণঠাসা করে এনেছে, বাংলার একটি ছোট গ্রামে খাদ্যাভাবে এক পরিবারের দুজন লোক মরেছে।" বেশ পড়ে যাচ্ছে সমীর। নানান রকমের সংবাদগুলো ওর মনের পটে কিন্তু কোন ছাপ দিচ্ছেনা। প্রায় এক কলম ছাপা লেখা পড়ে এল কিন্তু চোখ তুলে বুঝতে পারলো, সে কিছুই বোঝেনি। ব্যর্থ পরিশ্রম আর না করে হোল্ডলটায় ঠেস দিয়ে শুলো সমীর। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, শরীরটা ক্লান্ত, পারে তো একটু ঘুমিয়ে নিক। সমীর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল। মেল ট্রেণ ঝম ঝম শব্দে পথ অতিক্রম করে চলেছে। হঠাৎ সমীর অনুভব করলো—তার মাথার কাছে কে যেন বসে। সুন্দর স্নেহ-কোমল হাত দিয়ে সমীরের কপালে আদর করে ডাকছেন, —সমীর! অত দূরদেশে নাইবা যেতিস বাবা!

—কেন মা, দূর কোথায় আবার? রেলগাড়ী, এরোপ্লেন, টেলিফোন, ওয়ারলেস আজকাল পৃথিতে আর দূর কিছু রাখেনি। বলে সমীর হাসলো; তুমি তো সঙ্গে যাচ্ছ মা?

—না বাবা, আমার যাবার উপায় নাই। যাচ্ছিস যা, খুব সাবধানে থাকিস সমীর। উজ্জলা মাঝে মাঝে যাবে তোর কাছে। ও ঊর্দ্ধলোকের আত্মিক, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে।

—আত্মিক কি মা? সমীর ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করলো।

—পঞ্চকোষে গড়া দেহের ধ্বংসের পর যে আত্মা চারটি সূক্ষ্মকোষ নিয়ে বার হয়ে যায় তাকে বলে আত্মিক।

—ভূত?

—ভূত খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীর আত্মিক বাবা। তবে তারাও আত্মিক। তাদের প্রেতাত্মা বলে।

—আমি ভূত বিশ্বাস করিনা মা। তুমিতো জানো; ডাক্তারী পড়বার

মা'ত মড়ার হাড় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি! এখনো কত মড়া কেটে ছেঁটে দেখতে হয়। কৈ, তাদের তো ভূত হওয়া দেখতে পাইনা ?

—দেখা অত সোজা নয় সমীর। তাদের সূক্ষ্ম দেহ, তারা ইচ্ছে না করলে তুই দেখবি কি করে? দেখা দিতে তাদের কষ্ট হয়। উজ্জলা তোকে বড্ড ভালবাসে তাই আসে দেখা দিতে, নইলে তাকে কোনদিন স্বপ্নে দেখতিস না তুই।

—উজ্জলা এখন কোথায় থাকে মা? কত দূরে ?

—আমি ঠিক জানিনা বাবা, তবে সে বহু উর্দ্ধলোকে থাকে, আমি অতদূর যেতে পারিনে। আশা আছে, তোর বাবার পুণ্যের জোরে কিছুটা উর্দ্ধে যেতে পারবো।

—তাহলে বাবা যা বলেছিলেন সত্যি মা? উর্দ্ধলোক সত্যি আছে? মৃত্যুর পর সেখানে যেতে পারে মানুষ ?

—হ্যাঁ সমীর, সত্যি আছে। আবার অধো লোকও আছে, মানুষ যদি ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কাজ করে, তাঁর নিয়মের রাজ্যে অনিয়ম করে, তাঁর স্নেহ দয়া মায়ার দান অগ্রাহ্য করে, তাঁর দেওয়া বিবেককে অমান্য করে, তাহলে শাস্তিও পেতে হয় সেই মানুষের আত্মাকে।

—আমি বিশ্বাস করছি মা, সত্যি আমার ভাল লাগছে বিশ্বাস করতে। তাহলে সত্যি উজ্জলা এসেছিল কাল রাত্রে? ওকে কাল ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল মা!

—ও এখন দেবী, ওর দেবযান গতি লাভ হয়েছে সমীর। বহু জন্মের তপস্যার ফল ওর সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তুই ওর অনেক পরে এসেছিলি পৃথিবীতে, আর ভালো কর্মও তেমন করিস নি। এই জন্মটায় নিজেকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, শক্তিমান করে নে বাবা। তুই পুরুষ, জ্ঞানের সাধনায় তোর জন্মগত অধিকার। অবিশ্বাস করিসনা মাণিক আমার! আমি তোর মা। আমার থেকে তোর বেশী কল্যাণ করতে পারেন এই বিশ্বের যিনি জননী। উজ্জলা তাঁর অংশরূপা। ওর কাছে সাধনা কর সমীর, ও তোকে সকল সময় সাহায্য করবে। ......

ঘুম ভেঙে গেল সমীরের। স্বপ্নটার সমস্তটুকু মনে পড়ছে। এখনো যেন মা'র স্নেহস্পর্শ লেগে রয়েছে ললাটে ঃ—আহা! মা মা-মা······তুমি আছ! মরণের প্রাচীর তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান তুলতে পারেনি। জীবিতের সঙ্গে মৃতের যোগ তুমি আমায় দেখিয়ে গেলে মা, আর আমি অবিশ্বাস করবোনা।

সমীর দুহাত তুলে মার উদ্দেশে নমস্কার জানালো। গাড়ীখানা একটা বড় ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। এইখানে যাত্রীরা সবরেষ্টোরা কারে গিয়ে খাবে। কিন্তু সমীর ঘুমিয়ে গিয়েছিল, হাতমুখ ধোয়া হয়নি। উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। তোয়ালে দিয়ে মাথা গা মুছছে, আর ভাবছে, স্বপ্নটা তাহলে নিশ্চয় সত্যি! মৃতের সঙ্গে জীবিতের যোগ তাহ'লে সত্যি আছে! মা কত সুন্দর করে কথা বলে গেলেন, ঠিকই, বলেছেন মা, উজ্জ্বলা দেবী, তাকে লাভ করবার কোন যোগ্যতা অর্জন করেনি সমীর, কোন তপস্যাই করেনি উজ্জ্বলার জন্যে। উজ্জ্বলার মমতাময়ী রূপকে বিদ্রূপ করেছে সমীর। উজ্জ্বলার দান, ধ্যান, ব্রত, আরাধনাকে নিষ্ঠুর সমালোচনায় নস্যাৎ করতে চেয়েছে, তবু উজ্জ্বলা তাকে ভালবাসতো। রাজার মেয়ে উজ্জ্বলা, সোনার মেয়ে উজ্জ্বলা সমীরের জন্যে তিলে তিলে শুকিয়ে ঝরে গেল। আর অকৃতজ্ঞ সমীর বিশ্বাস করেনা যে উজ্জ্বলা এসেছিল! ছি!

নিজকে ধিকৃত করতে করতে সমীর কথঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করলো। কিন্তু ঠিক করলো, আত্মায় অবিশ্বাস সে আর করবেনা। আর জীবনে ভাল কাজও কিছু সে করবার চেষ্টা করবে এবার থেকে। দু' এক পয়সা দান, কিম্বা বিনা পয়সায় গরীবের চিকিৎসা, অথবা··········দেখা যাবে আরো কিছু যদি করার থাকে।

বড্ড দূর রাস্তা, বিরক্ত ধরে যায়। রাত্রে ভাল ঘুম হলোনা সমীরের। পরদিন বেশ অসুস্থতা বোধ করতে লাগলো। দূর ছাই! না এলেই ভালো হোত এতদূর। আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এই কিচ্‌কিন্ধ্যার মুলুকে কি মানুষ আসে! তারপর যেতে হবে লঙ্কায়, কিনা, রাক্ষসের দেশে!

কিন্তু এখন আর অতসব ভাবনা বৃথা। যথাসময়ে সমীর এসে লঙ্কায় অর্থাৎ বর্ত্তমান সিলোনে পৌঁছুল। মনের অবস্থা ওর মোটেই ভাল ছিলনা, কিন্তু হাঁসপাতালের গেটে ওকে অভ্যর্থনা করলো—একটি মেয়ে। চমৎকার মেয়ে একটি! সমীরের সারা দেহ-মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো এক লহমায়। মনের শুকনো গাঁছে ফুল ফুটে গেল যেন অকস্মাৎ। মেয়েটি ইংরাজিতে অভিবাদন জানিয়ে বললো—আসুন! প্রত্যভিবাদন করে সমীর ঢুকলো ওর সঙ্গে হাঁসপাতালে। কথায় কথায় আলাপ আলোচনা, পথের কষ্টের কথা, বাঙলা দেশের আবহাওয়ার কথা, তারপর সমীরের বাড়ীর লোকজনের কথা এসে গেল। মেয়েটি শুধুলো, —আপনি বিবাহিত নিশ্চয়?

—না। সমীর 'না' বলতে গর্ব্ব অনুভব করছে। মেয়েদের কাছে অবিবাহিতের দাম বেশী। সমীর জানে।

—ওঃ, আমাকে এখানে সব বলছিল কি যে, ভারতবর্ষে নাকি খোকা খুকীর বিয়ে হয়। নইলে আপনিতো মুশাই ছেলে মানুষ; বিয়ের বয়সই হয়নি।

—বয়স হয়তো হয়েছে, আই এম টুয়েন্টি ফাইভ।

—ধেৎ! ও আবার একটা বয়স নাকি! অমাদের ওখানে চল্লিশের লোক যুবক।

—হ্যাঁ, ওসব শীতের দেশ! কিন্তু এদেশে সকাল সকাল বিয়ে না করলে পস্তাতে হয়। এখনকার লোক বুড়ো হয়ে যায়, তখন বিয়ের কোন আস্বাদ থাকেনা।

—আপনি তাহলে বিয়ে করেননি কেন? মেয়েটি হাসছে আর বলছে।

—কারণ বিয়ে যাকে করবো তাকে খুঁজে পাইনি, হাসছে সমীরও।

—ও, তাই নাকি! আচ্ছা আমি খুঁজে দেব। চলুন, কিছু খাওয়া যাক।

ওরা দুজনে একটা খাবার জায়গার দিকে এগুলো। সমীর ভাবছে 'অশ্বথমা হত ইতি গজ" করে কথাটা সে সত্যই বলেছে ওকে। আর মেয়েটি ভাবছে—সমীরের তাকেই পছন্দ হয়েছে বলেই বললো, 'খুঁজে পাই নি'। আচ্ছা এবার তো পেয়েছে! করুক না বিয়ে, দেখা যাক।

কিন্তু মেয়েটি যে খুব সুন্দর, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। পশ্চিম গোলার্দ্ধের সাদা রঙ, মাঝারি সাইজের মেয়ে, চুল যথেষ্ট আর মুখের হাঁ-টি বেশ বড় আর পরিষ্কার। মসৃণ ঝকঝকে ছোট দাঁত। ছোট গোল চোখ, নাকের ডগায় একটা খাঁজ। বুক পিঠ খুব পুরন্ত আর শ্রোণীদেশ স্থূল, হাসতে পারে খুব। কথাও বলে বেশ অনর্গল ; মেয়েটি তীক্ষ্ণধী।

কিন্তু সমীরের ওকে খুব ভাল লাগলো। এতো ভালো লাগছে যে মনে হচ্ছে, কত জন্মের যেন পরিচিত আত্মীয় ; যেন এক সঙ্গে কত কাল ধরে খাওয়া শোওয়া বসা চলে আসছে। সমীর বললো,

—তোমাকে পেয়ে যেন মনে হচ্ছে কত দিনের হারানো বন্ধু পেলাম। তুমি না থাকলে কোথায় যে যেতাম ! এদেশের লোক চিনিনা, কথা বুঝিনা , মুস্কিল হোত তা হলে।

—আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে ডাক্তার সাব, যেন কত দিনের তুমি আমার চেনা—একেই বলে এফিনিটি, না ?

—হাঁ, এসো খাও ! তোমার কোয়াটার কোথায় ?

—ঐ যে, ওপাশে। হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডেই থাকতে হয় আমাদের। তোমাকেও এই দিকের কোয়াটারে থাকতে হবে। এসব তো টেম্পররী কোয়াটার। অসুবিধা হবে তোমার ?

না, আর হলেই বা করছি কি ? কাজে যখন যোগ দিলাম তখন সইয়ে নিতেই হবে।

—গুড ! ভালোছেলের মত কথা বলছো। তোমাদের বাঙালীরা শুনেছি বড্ড নাদুসনুদুস, মায়ের আঁচল ধরা গোপাল। কিন্তু তুমি দেখছি খুব ডেয়ারিং বয়।

হাসলো সমীর ; বললে—মায়ের আঁচল ধরে থাকবার দিন কি আছে আর ? এখন বেঁচে থাকবার জন্য সাধনা করতে হয়, জীবনকে বড় হবার স্কোপ দিতে হয়।

—রাইট ! তোমায় দেখে বাঙালী জাত সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেল আমার ! অল রাইট ! তোমার কাছে তোমার দেশের গল্প শুনবো আমি ; বলবে তো ? ..

—সানন্দে। তোমার মতন শ্রোতা পেলে আমি বর্তে যাব—বলে সমীর হাসলো !

খাওয়া শেষ করে দু'জনে একটা ছায়াশীতল গাছের কাছে বসলো গিয়ে। মেয়েটি সিগারেট ধরাবে, সমীরের দিকে চেয়ে বললো—খাওনা ?

—হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস ! সমীর একটা নিয়ে নিজেও ধরালো ; ওরটাও ধরিয়ে দিল। কিন্তু সিগারেট খাওয়া ভাল অভ্যাস নেই সমীরের। অথচ সে বীর বাঙালী ; সিগারেট টানার মতন অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপারে না বলে নিজেকে হেয় করবে না। সমীর প্রাণপণে কাশি চেপে টানতে লাগলো। ভাগ্যিস মেয়েদের নরম সিগারেট, নইলে সমীরের অবস্থা কি হোত কে জানে ! ধোঁয়া ছেড়ে মেয়েটি বললো—তোমার বরাত ভালো। কাজ খুব কমে গেছে। সিঙ্গাপুর থেকে এসে আমরা নাইবার খাবার সময় পেতাম না এখানে। এখন তো বসে আড্ডা দেওয়া যায় বেশ।

—ভালই। অল্প কাজের মধ্যে দিন কতক অভ্যাস করে নিলে সুবিধে হবে আমার।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি রয়েছি তোমায় সাহায্য করবার জন্য। আমাকে সব সময়ই তোমার বান্ধবী বলে মনে করো।

—নিশ্চয়ই, অশেষ ধন্যবাদ। তুমি না থাকলে এখানে এসে আমি ভেসে যেতাম।

—এবার ভেসে যাবেনা তো ? হাসছে মেয়েটা।

—না ; নৌকায় নোঙ্গর ফেলা হয়ে গেছে।

এত সহজে, এত অনায়াসে কারো সঙ্গে এতো বেশী ভাব হতে পারে, বিশেষতঃ কোন মেয়ের সঙ্গে, জানতো না সমীর কিন্তু হোল। বেশ ভালই বন্ধুত্ব জমে উঠলো ওদের। হাসতে হাসতে মেয়েটা বললো—নোঙ্গর ফেলেছ তাহলে ? হাসলো সমীরও কথাটার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না। মেয়েটিও বোধহয় উত্তর পাবার দরকার মনে করেনি। উঠে দাঁড়ালো অকস্মাৎ। ওর উথলিত যৌবনশ্রীর অত্যুগ্র উজ্জ্বলতা চোখে লাগলো সমীরের। আবার বার বার চেয়ে দেখলো।

—চলো ! একবার রুগীগুলো দেখি গিয়ে। বলে মেয়েটি এগুলো। সমীরও চলেছে পিছনে—দেহের পিছনে যেমন ছায়া যায়, তেমনি। প্রকাণ্ড হাঁসপাতাল। অসংখ্য রুগী, অসংখ্য ডাক্তার, নার্সও রয়েছে, আয়োজনের অবশ্য কোন ত্রুটি নাই। সব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, প্রত্যেকটি রুগীকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। মানুষের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সাহায্য পাচ্ছে সব রুগীই। তবু মরছে, অল্প নয় অনেকেই মরছে। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে আর্ত্তনাদ করছে কেউ, কেউবা বিকৃত মুখে নীরবে সইছে যন্ত্রণা। কারো যন্ত্রণায় জ্ঞান নেই, কাউকে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

কিন্তু ঐ অজ্ঞান লোকগুলোর পীড়িত আত্মা যন্ত্রণা পাচ্ছে কি ? না, ডাক্তার সমীর জানে, যন্ত্রণা যতই বেশী হোক, অজ্ঞান করে রাখলে রুগী সে যন্ত্রণা টের পায় না। তাহলে কোথায় আত্মা ? আত্মা থাকলে রুগীকে অজ্ঞান করা সম্ভব হোত না ; কিম্বা অজ্ঞান হয়েও সে চেঁচাতো ; অতএব আত্মা নেই ; দেহই সব,

—হ্যা—নিজের মনেই হেসে উঠলো সমীর আস্তে, কিন্তু সে হাসিও শুনতে পেল মেয়েটি। ও তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখেছে সমীরের উপর, হাসতে দেখে বললে,

—হাসলে যে ডাক্তার ? হাসির কি পেলে, আহা, বড় কষ্ট পাচ্ছে ওরা।

না, তার জন্য না। সমীর বিব্রত বোধ করলো, মেয়েটি ওকে নিষ্ঠুর ঠাওরেছে নাকি ? বললো—একটা কথা মনে পড়ে হাসি পেয়ে গেল।

কি কথা ? আমি শুনতে পারি না ?

—হ্যাঁ, আমাদের দেশের লোক বিশ্বাস করে যে, মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা নাকি দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকে। যত আজগুবি !

সে তো আমাদের শাস্ত্রেও বলে যে মানুষ মরে গেলে তার আত্মা 'ডে অব জাজ্‌মেণ্টের' দিন অবধি বসে থাকবে কবরে।

—ঐ সব গাঁজাখুরি গল্প তুমি বিশ্বাস করো ? সমীর সগর্ব্বে তাকালো, যেন সে বিশ্বাস না করায় খুবই বাহাদুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মেয়েটি ওকে নিরাশ করে দিয়ে বললো—হ্যাঁ, বাইবেলের কথা বিশ্বাস করবো না ? নিশ্চয় করি।

—পুঁস্‌ ! এই বিজ্ঞানের যুগে ওসব গাঁজাখুরি কথা বোলোনা—বুঝলে ?

—অন্য কাউকে তো বলিনি। বলছি তোমাকে, বলছি যে অন্তরের খুব গভীর একটা জায়গায় যেন বিশ্বাস জিনিষটা থাকে, ওকে চোখ রাঙিয়ে তাড়ানো যায় না, হেসে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। বিজ্ঞানের ছুরিতে খুনও করা যায় না।

—কেন ? সমীর প্রশ্নটা করেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

—কারণ ওটা সংস্কার, ওকে যতই তুমি চাপা দিয়ে রাখ, ঠিক সময় ও জেগে উঠে ওর কাজ করে নেবে তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে।

তাহলে কি তোমার মত, মানুষ মরার পর বেঁচে থাকে ?

—মানুষ থাকেনা, তার আত্মা থাকে। কিন্তু থাকলোই বা ওরা, তুমি ভুতের ভয় করছো নাকি ? হাসতে লাগলো মেয়েটা, হেসে আবার বললো, —হাঁসপাতালে সত্যি ভূত থাকে, সত্যি—দেখবে ?

--ন্যটি গার্ল ! চলো, দেখাও কোথায় ভূত ?

বলে সমীর ওকে অন্য একটা কামরায় টেনে নিয়ে গেল। সেখানে ডাক্তারদের বিশ্রাম করবার জন্য আসন পাতা আছে। মেয়েটা এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে, সমীর ইনফেটুয়েটেড, মোহগ্রস্ত ! ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপলো মেয়েটা।

* * *

নিজের ঘরে পর হয়ে উঠেছে প্রবলের জীবনটা। দিনে দিনে তার অসুখ বেড়ে উঠছে ; ডাক্তারেরা বলেন, ঐ জিনিসটা একটু কমান আর দিন কতক চেঞ্জে ঘুরে আসুন ! শৈবাল বলে, যাওনা দাদা, ভুবনেশ্বরের বাড়ীটায় থেকে এসো দিন কতক। বড় বৌ নীলিমাও বলে ঐ কথা ; কিন্তু তার সঙ্গে যোগ করে, ছোট ছেলে আমার, কেমন করে যে আমি যাই ওঁর সঙ্গে।

কিন্তু লোচন একদিন এলো আর সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললো চেঞ্জে যাবার। যশিডিতে একখানা বাড়ী আছে এদের, সেইখানেই যাওয়া সুবিধে। কাছেও হবে, আর জায়গাটাও বেশ স্বাস্থ্যকর। লোচন ওদের অভিভাবক হয়ে যাবে যশিডি। ছোটবাবু শৈবাল মাঝে মধ্যে গিয়ে বড়দাকে দেখে আসবে— ঠিক হোল।

বড় বৌএর আপত্তির কারণ এবার দেখা গেল না। হোক না তার ছেলে ছোট, ঠাকুরজামাই যখন রয়েছেন, আপদে বিপদে তিনি ভালই দেখতে পারবেন। অতএব প্রবাল, প্রণব, নীলিমা লোচনের সঙ্গে একদিন প্রথম শ্রেণীর একটা রেলের কামরায় চড়ে যশিডিতে গিয়ে নামলো। উজ্জ্বলার মৃত্যু সেদিন ঠিক একমাস পূর্ণ হয়েছে।

মাসিক শ্রাদ্ধটা করবার কথা প্রবাল বলেছিল, কিন্তু লোচন বললো, দেওঘরে গিয়েই পিণ্ডদান করবে; আর না হয় একেবারে গয়াতে গিয়ে সব কাজ চুকিয়ে দেবে। প্রবাল এর পর আর কিছু বললো না।

যশিডিকে ঠিক সহর বলা চলে না, আবার পাড়াগাঁও নয়। যে রাস্তাটা বরাবর যশিডি ষ্টেশন থেকে দেওঘর চলে গেছে, তার পূর্ব্বদিকে দোতালা বাড়ী, সামনে এবং পিছনে অনেকখানা জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সে জমিতে বেল, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপ ছাড়াও কলমের আম, পেয়ারা ইত্যাদি গাছ আছে অনেক। প্রবালের বাবা ধর্ম্মদাস বাবু এই বাড়ী করিয়েছিলেন। আশা ছিল, শেষ বয়সে এখানে এসে থাকবেন আর নিত্য বৈদ্যনাথ ধাম গিয়ে পূজা করে আসবেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা সব সময় সফল হয় না। ধর্ম-সাধনা আর শেষ জীবন যাপনের জন্য যে বাড়ী তৈরী হ'য়েছিল, সেই বাড়ীতেই মানব-সমাজের কদর্য্যতম নাটক অভিনীত হ'তে লাগলো। মৃত জমিদার ধর্ম্মদাস ঠাকুরের আত্মা এখানে সেই দৃশ্য দেখেন আর ভাবেন, তাঁর মুহূর্ত্তের স্খলন মহারুদ্র এখনো মার্জনা করেন নি। ভাবেন আর কাঁদেন আর অদূরবর্ত্তী বৈদ্যনাথ ধামের উদ্দেশে নতি জানিয়ে বলেন,—কৃপাকর শঙ্কর, এবার এই দৃশ্য দেখা থেকে আমায় অব্যাহতি দাও!

কিন্তু ধর্মদাসের আত্মাই শুধু দেখছে না, ঐ বাড়ীটা দেখবার জন্য দু'জন মালী থাকতো ওখানে, তা ছাড়া জন তিনেক ঝি, চাকর এসেছে এদের সঙ্গে, তারাও দেখছে। অতবড় সম্পত্তির মালিক বড় বাবুর যত্নের অবশ্য কোন ত্রুটী নাই, কিন্তু সবই প্রায় চাকর ঝির হাতে। বড় বৌ যে আসে না, তা নয়, আসে, কাছে বসে, কথাও বলে, কিন্তু না বসলে যেন ভাল হ'তো।

প্রবাল আর কিছু না হোক, লেখাপড়া খানিকটা শিখেছিল। জমিদারের ছেলের যেটা প্রায়ই হয় না; বুদ্ধিও ওর কম ছিল না। লোচনের সঙ্গে বড় বৌ নীলিমার ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্বের কথা বাড়ীতেই ও জানতো, কিন্তু সে বাড়ী বিশাল, তাই কথাটা বিশ্বাসের দৃষ্টিতে এবং দৃষ্টির বিশ্বাসে সমর্থিত হয় নি। এখানে ছোট বাড়ী আর লোকজন কম, তা ছাড়া জমিদারীর অন্য লোকজনের ভিড় নাই। তাই তার দৃষ্টি সজাগ আর মন রিক্ত। কাজেই নীলিমার আদরের ভাণ আর সেবার প্রাচুর্য্যের মধ্যে অন্তরের ফাঁকিটাও বেশই অনুভব করছিল কয়েকদিন থেকে। কিন্তু সেদিন অবস্থা চরমে উঠলো।

তুপুর বেলা প্রবাল একা ঘরে শুয়ে ছিল। নীলিমা এসময় নাকি রামায়ণ পড়ে উপরের ঘরে। দোতালায় উঠতে প্রবালের কষ্ট হয়। অথচ সকাল বিকাল মাঠে একটু বেড়াতে বলেছেন ডাক্তার। তাই ওকে এক তালার ঘরেই রাখা হয়েছে। প্রবালের কাছে যে চাকরটা সব সময় থাকে, সে ঘুমিয়েছিল। প্রবাল কিছু খেতে চায়, বড্ড খিদে পেয়েছে ওর; চাকরটাকে ডাক দেবে কি না ভাবছে। শরীরের অবস্থার সঙ্গে মনও বদলে যায়। ঘুমুচ্ছে বেচারা চাকরটা। থাক, ডাকতে ইচ্ছে হোল না; কারো কোন কষ্টের কারণ আর হবে না প্রবাল, কাউকে তুঃখ দেবে না। প্রবাল আস্তে বেরিয়ে দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। চার পাঁচখানা ঘর দোতালায়; কিন্তু কৈ, রামায়ণ পড়ার সুর তো শোনা যাচ্ছে না! প্রবাল বারান্দা পার হয়ে এপাশের কোণার ঘরটার দরজায় এসে দেখলো, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কে শুয়ে আছে, জানে না প্রবাল, কারণ, সে নীচের তলায় থাকে বলে অন্য সকলেও নীচের তলায় থাকে। শুধু পূজার জন্য নীলিমা উপরের একটা ঘর পরিষ্কার ক'রে নিয়েছে; এই তার জানা ছিল। তাহ'লে নীলিমাই হয়তো রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছে। ডাকবে কি না ভাবতে ভাবতে বারান্দায় রাখা একখানা চেয়ারে বসলো প্রবাল। সিঁড়ি ভেঙে বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

বসে আছে প্রবাল ; দূরে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় ; মধ্যাহ্নের প্রখর রোদে প্রান্তরে মরীচিকা দেখা যাচ্ছে, তাই দেখতে লাগলো। কিন্তু ঈশ্বর হয়তো সেদিন ওর শাস্তির জন্য অমোঘ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ; তাই ক্ষিদেটা খুবই যন্ত্রণা দিচ্ছে, আর কিছু খেলে ব্যথাটাও কম থাকে। প্রবাল আবার উঠে দরজার কাছে গিয়ে ডাক দেবে, হঠাৎ মনে হোল, একটা চাপা হাসির আওয়াজ যেন গুমরাচ্ছে ঘরে ; তাহলে জেগে আছে বড় বৌ ; রামায়ণ পড়তে পড়তে হাসছে! না ডেকে প্রবাল দরজায় একটা মৃদু ধাক্কা দিল। ঘরের ভেতর থেকেই বড় বৌ বলল—কে ?

—কিছু না, বাতাস—বলে অন্য একটা কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যেই উত্তর দিল। প্রবাল চিনলো, সে স্বর লোচনের। প্রবালের শরীরের রক্তটা যেন তীব্র বিষের দাহনে ঝিম্ ঝিম্ করছে। অসাড় হয়ে আসছে কিন্তু সামলে নিল। হ্যাঁ, বাতাসই। বাতাস ভেবেই ওরা নিশ্চিন্ত থাক! প্রবাল নিজের হৃদস্পন্দনটাকে অতিকষ্টে সামলে পা টিপে টিপে নেমে এল নিজের ঘরে ; তার চাকরটাকে ঠেলে জাগিয়ে বললো—প্রণব কোথায় রয়েছে রে ?

—খোকা বাবু তো উষির কাছে থাকে, ডাকবো হুজুর ?

—না, তুই আমার লেগে কিছু খাবার যোগাড় কর।

চাকরটা উঠলো তৎক্ষণাৎ! কারণ এখানে শুয়ে ঘুমুবার জন্য ওকে মাইনে দেওয়া হয় না, খাড়া জেগে থেকে বড় বাবুর তদ্বির করার জন্যই রাখা হয়েছে। ওর অপরাধ গুরুতর, বুঝেই খাবার তৈরী করতে ছুটলো, কিন্তু ওকে কিছু করতে হোল না, নেমে এল স্বয়ং বড় বৌ নীলিমা। এসে বললো,

—খিদে পেয়েছে ? খুব তো ভাল লক্ষণ! খিদে পেলে আর ভাবনা কি ? দুদিনেই সেরে যাবে। হাওয়া বদলের মতন চিকিচ্ছে কি আছে ? বলেই পরম যত্নে কি একটা বিলাতি খাদ্য তৈরী করতে লেগে গেল।

খাবার ইচ্ছা প্রবালের আর নাই ; সে তার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল নীলিমার সারা দেহখানা ; অভিজ্ঞ গোয়েন্দার চেয়েও সে দৃষ্টি প্রখর, বললো—লোচন কোথায় বড় বৌ ? বাড়ীতে আছে ?

—হুঁ ; ছিল তো বাড়ীতেই। ঘুমুচ্ছে হয়তো কোথাও। ডেকে দেব না কি ?

—না, প্রণব কৈ ?

—উষার কাছে ঘুমুচ্ছে। যা রোদ আর গরম হাওয়া, ওকে আমি দুপুরে উপরে নিয়ে যাই না, বড় গরম উপরে ; খাও, আর একটু চিনি দেব কিনা দেখতো ?

—রামু ! প্রণবকে আনতে বল আমার কাছে।

—ঘুমুচ্ছে, উঠুক, উঠলে নিজেই আসবে। খেয়ে নাও লক্ষীটি, জুড়িয়ে যাবে ; আজ কত দিন পরে তুমি যে খিদে পেয়েছে বললে, উঃ ! কত দিন খেতে চাওনি !—স্নেহ যেন বড় বৌএর চোখ ফেটে বেরুচ্ছে !

প্রবালের মনে হোল, কার্পেটের উপরে রাখা চটি জোড়াটা তুলে এই নির্লজ্জ নারীকে আগাপাস্তালা পিটিয়ে বের করে দেয়। কিন্তু না, এই শয়তানী তার একমাত্র বংশধর প্রণবের জননী। প্রবাল আবার বললো—

—প্রণবকে তুলে নিয়ে এসো আমার কাছে—যাও।

সাতপুরুষের জমিদার-পুত্রের জন্মগত হুকুমের কণ্ঠস্বর। নীলিমা কেঁপে উঠলো। সে আদেশ উপেক্ষা করার শক্তি নীলিমার নাই।

কিন্তু সামলে নিচ্ছে প্রবাল নিজেকে, ওর পেটের ব্যথাটা বাড়তে আরম্ভ করেছে। নীলিমা চাকরটাকে বললো, খোকাকে তুলে নিয়ে আয়, যা চট্‌করে। তারপরই নীলিমা চেয়ে দেখলো প্রবালের যন্ত্রণা-কাতর মুখের পানে ; পরমাত্মীয়ের মতন স্নেহ ভরা গলায় বললো—মেজাজ খারাপ করোনা লক্ষীটি, অসুখ বাড়বে এখুনি। খাও, খেয়ে নাও এটুকু।

—হুঁ ! বলে প্রবাল দাঁড়িয়ে উঠে ঘরের মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলো। যন্ত্রণা বেশী হলে ও এইরকম পায়চারী করে, নীলিমা জানে, কিন্তু পাপীর মন সদাই সশঙ্কিত। নীলিমার মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যেন একটা সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বললো,

—ব্যথা বেড়ে উঠবে এখনি, শোও, শুয়ে পড়, আমি চামচেতে করে খাইয়ে দিই।

গ্রাহ্য করলো না প্রবাল ওর কথাটা। ওপাশের বড় টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর ড্রয়ার থেকে সেই বিষ ওষুধের শিশিটা বের করে একটা বড়ির জায়গায় তিনটে বড়ি গিলে ফেললো। ব্যস! ব্যথা দুমিনিটের মধ্যেই কমে যাবে।

—ওকি, ওকি, করলে কি গো! নীলিমা চীৎকার করে উঠলো।

প্রবাল শুধু বললো—যাও, যাও এঘর থেকে!

প্রণবকে নিয়ে এলো চাকরটা। ঘুম ভেঙে উঠেছে প্রণব। বড় বড় চোখ দুটিতে কাজল পরা, মনে হচ্ছে যেন শিশির ধোয়া পদ্ম পাপড়ি। এসেই বাবার গলা জড়িয়ে বললো—ভয় কলছে বাবা? আমি লইছি, ভয় কিসেল?

—না বাবা, তুমি রয়েছ, ভয় কেন করবো? বলে প্রবাল ছেলেকে নিয়ে নিজের খাটে এল; নীলিমা এখনো দাঁড়িয়ে। আর একবার চোখের কোণে তাকিয়ে প্রবাল বললো—তুমি আমার ছেলের মা, তাই তোমার সম্মান আমি নষ্ট করলাম না, কিন্তু তুমি চলে যাও এখান থেকে।

নিজের জন্য তৈরী করা খাবারটুকু প্রবাল ছেলেকে খাইয়ে দিল, বললো আস্তে—আমি আর ওর হাতে খাবনা মানিক, কিন্তু ও তোর মা; তুই যেন ওকে মাপ করিস।

বড় বড় চোখ দিয়ে মুক্তা বিন্দুর মত জল পড়ে গেল প্রবালের। কিন্তু আশ্চর্য্য তার ধৈর্য্য। ছেলের বুকে মাথা গুঁজে চোখের জল লুকিয়ে সে চাকরকে হুকুম করলো—সবাইকে এঘর থেকে যেতে বল! এখন যেন এঘরে কেউ না আসে। প্রণবের সঙ্গে আমি খেলা করবো।

হুকুম অবিলম্বে পালিত হওয়া চাই, জানে নীলিমা। তবু সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—হোল কি তোমার হঠাৎ? বলে নিজের কল্পিত বিস্ময়টা প্রকাশ করতে চাইছে। কিন্তু প্রবাল ওর কথার জবাব না দিয়ে চাকরটাকেই বললো, —যেতে বল সবাইকে এখুনি।

—আচ্ছা, যাচ্ছি—বলে নীলিমা চলেই গেল, হয়তো ভেবে রাখলো, সময়ান্তরে এমন করে তাকে চলে যেতে বলার জন্য অনুযোগ অভিযোগ

করবে। কিন্তু পাপীর মনে ভয়ও বড় কম থাকে না, কিছু একটা গুরুতর সন্দেহ যে প্রবালের জেগেছে, এটা বুঝতে তার দেরী লাগলো না। তবে প্রবাল যে দোতালায় উঠেছিল ঐ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে, এটা অবশ্য সে কল্পনা করেনি।

উপরের ঘরে এসে নীলিমা চুপে চুপে সব বললো লোচনকে। শুনে লোচন প্রথম অবশ্য খুবই ঘাবড়ে গেল এবং বললে,—তা হলে কি ও তখন উপরেই এসেছিল নাকি? সেই যে শব্দটা তখন শুনলে! কিন্তু এসেছিল তো অমন চুপে চুপে চলে গেল কেন? দরজা খুললেই তো বামাল শুদ্ধ ধরা পড়ে যেতো! হাসলো লোচন কিন্তু নীলিমা রেগে বললো—হেসোনা। বেশ বিপদের কথা, বুঝলে?

বিপদের কথা নিশ্চয়ই কিন্তু লোচনের কি? বিপদ নীলিমার। লোচন এখুনি ট্রেণ ধরে কলকাতায় চলে যাবে। তারপর মেনকা, না হয় আর কারো বাড়ী গিয়ে নিশ্চিন্তে কয়েক ঢোক মদ গিলে তুরিয়ানন্দ লাভ করবে! নীলিমা পড়বে মুস্কিলে, বিশেষ করে ওর আবার মা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

উপরে বাথরুমে মেথর যাবার জন্য বাইরের দিকে একটা লোহার পুরনো স্পাইরেল সিঁড়ি—লোচন সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগান পার হয়ে বাইরে চলে গেল বাজারে। দু'টো পেঁপে, এক ঠোঙা কালোজাম আর গোটা কয়েক পাতি নেবু নিয়ে ফিরে এল সদরের পথে, এমন ভাবে ফিরে এল যেন প্রবাল দেখে বুঝতে পারে যে সে বাড়ী ছিল না, বাজারে গিয়েছিল। কিন্তু যাকে বোঝাবার জন্য এত আয়োজন, সে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে ছেলের সঙ্গে খেলা করছে. "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে· ····" কথাগুলো শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে। লোচন দরজার কাছে এসে শুনলো খানিক, তারপর ডাকলো —দরজা খোলহে, ও প্রবাল, শুনচো!

—না! জবাব দিয়ে প্রবাল আবার 'আগডুম বাগডুম' খেলতে লাগলো। লোচন ফের বললো—কয়েকটা কালোজাম নিয়ে এলাম হে, বেশ মিষ্টি। খাওনা দুটো!

—না, ওকে চলে যেতে বলতো রে! যে কেউ আমায় ডাকতে আসবে, তাড়িয়ে দিস—শেষের হুকুমটা হোল চাকরটাকে। লোচন বুঝলো, প্রবাল আজ শুধু

সন্দেহ করেছে নয়, তারও বেশী, হয়তো দরজার ফাঁকে কিছু দেখেওছে। কিন্তু লোচনের মত ঘুঘু ছেলে এত অল্পতে ঘাবড়ায় না। এক মিনিট ভেবে মতলব ঠিক করে ফেললো। তারপর ভেতরে গিয়ে বড় বৌএর সঙ্গে কিছু পরামর্শ করে চাকরদের ডাকাডাকি সুরু করে দিল। তার বাক্স বিছানা গুছিয়ে দিতে হবে। আজই সন্ধ্যা ছটার ট্রেণে তার কলকাতায় না গেলেই নয়।

বড় বৌ ঘণ্টা দুই পরে আবার এল প্রবালের বন্ধ দরজার কাছে। কিন্তু প্রবাল ঘুমিয়ে গেছে ভেতরেই, ওদিকের বারান্দায় চাকরটার সঙ্গে ছেলেটা খেলা করছে।

একটার জায়গায় তিনটে বড়ি খেয়েছে প্রবাল, বড় বৌ দেখেছে। কিন্তু ওরকম আরো দু'একবার প্রবাল খেয়েছে আগে। যন্ত্রণা বেশী হোলে খায় ও। ওর জন্যে ভয়ের কিছু নাই। ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক। নীলিমা আবার ভিতরে গিয়ে ভাবতে লাগলো—লোচন যাক কলকাতা। প্রবালের মন থেকে সন্দেহটা তাহলে হাল্কা হয়ে যাবে,ইত্যাদি কথাই ভাবছে নীলিমা। লোচন এসে বললো,—উঠেছে ? না ? তাহলে তো মুস্কিল হোল ! মরে গেলে কিন্তু তোমাকে আমাকে বাদ দেবেনা পুলিশ। তুমি এমন আহম্মক নীলু ; শিশিটা হাত থেকে কেড়ে নিতে পারলে না ? ধেৎ, এই বুদ্ধি নিয়ে পর পুরুষের ····

—কে জানে, আমি যেন বুদ্ধি হারা হয়ে গিয়েছিলাম। যা ধমক দিল !

—উল্টে তুমিও একটা ধমক দিলেনা কেন ? করতো কি ও ? হাতেনাতে তো ধরেনি।

নীলিমা চুপ করে রইল। দু'জনেই ভাবছে। প্রবাল যদি বিষের বড়ি খেয়ে মরেই যায় তো কি তাদের অবস্থা হবে ! কিন্তু পাপীকে কোনো অদৃশ্য শয়তান যেন সবসময় রক্ষা করে ; পাপের মাত্রাটা বেশি করবার জন্য বহু বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। তাই ঠিক পাঁচটার সময় প্রবাল দরজা খুলে ডাক দিল.

প্রণব। এক গেলাস জল দাও তো বাপ্ আমায়।

ওর ফর্সা পাণ্ডুর গালের উপর চোখের জলের একটা রেখা আঁকা হয়ে গেছে, দেখলো নীলিমা প্রণব অবশ্য জল দিতে পারবেনা, নীলিমাই দিচ্ছে।

কিন্তু প্রবাল বললো—থাক বড় বৌ। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবেনা। নিজেই সরাই থেকে জল ঢেলে খেলো প্রবাল। নীলিমা ভয়ে ভয়ে বললো—

—আমি কি করেছি কি যে এতো.........

—কৈ? কিছু করেছ, এমন কথা তো বলিনি আমি। করবে কি আবার?

প্রবাল বাইরের বাগানের ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মিনিট কয় পরে লোচন এসে বললো—হঠাৎ একটা দরকার পড়ে গেছে হে, কলকাতায় যেতে হচ্ছে, ভাবনা নাই; দিন কতক পরেই ফিরবো—।

—কেন হে, লোচন, আমি তো কিছু বলিনি তোমায়! আমার দিন ফুরিয়েছে ভাই, যার যা প্রাণ চায় করো গিয়ে, আমায় শান্তিতে মরতে দাও। কারো কোনো রকম আনন্দের ব্যাঘাত আর ঘটাবো না আমি। যাও, ভেতরে যাও।

—না হে, দরকার আছে কলকাতায়। ওরকম করে কথা বলছো কেন তুমি?

—রুগী মানুষের মাথার সব সময় ঠিক থাকে না ভাই, কিছু মনে করো না।

—না না, মনে আর কি করবো! অসুখ হোলে মানুষের ওরকম হয়। আচ্ছা, আসি আমি।

ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে উঠলো লোচন। প্রবাল শুধু হাসলো একটু। লোচনের গাড়ীখানা অনেক দূর চলে গেলে চাকরটাকে শুধুলো,—টেলিগ্রাম করেছিস?

—হ্যাঁ হুজুর।

প্রবাল দূর আকাশের পানে চেয়ে দেখলো একবার! তার স্বর্গগত পিতৃ-পুরুষেরা হয়তো নক্ষত্র-রূপে ঐখানে বিরাজমান, তাঁরা যেন এই অধম বংশধরকে মার্জনা করেন,—প্রবাল যোড়হাত করে নমস্কার জানালো।

* * *

সেদিন জলা পৃথিবী থেকে ফেরবার পথে কয়েকটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এসেছিল, তারই কথা ভাবছিল তার সেই গৈরিকস্রোতা নদীর ঘাটে বসে। পৃথিবীর

কথা এবং নীচের ঐসব দৃশ্যের কথা ভাবতে কিন্তু ওকে মানা করে গেছেন মা। তবু জলা মনের চিন্তাটা অন্যদিকে আনতে পারছিলনা। বেশ সে বুঝতে পারছে, পৃথিবীতে সুখ, দুঃখ, আনন্দ যেমন অল্পস্থায়ী আর স্বর্গে অধিকদিন স্থায়ী, তেমনি মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারও স্বর্গে অনেক বেশী শক্তিশালী। এখানকার মনে দুঃখের বা আনন্দের বেগও পৃথিবী থেকে বেশী। মনের চিন্তাই এখানে দৃষ্টি-শক্তিকে চালিত করে, মনের ইচ্ছাই এখানে বিদেহীকে দেহ ধারণ করায় তীব্র গতিতে একলোক থেকে অন্য লোকে নিয়ে যায়। তেমনি বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও এখানে অনেক শক্তিশালী, যে শক্তির প্রভাবে এ লোকের অধিবাসীরা নিজেকে দেবতা বলে ভুল করে।

সেদিনের দেখা দৃশ্যগুলোর কথা ভাবতেই জলা আবার সেগুলো দেখতে পেলো। বহু বহু দূরে যেন ভূর্লোক, সেখানে সাতটি দ্বীপ দেখতে পাচ্ছে জলা, সাতটি নিম্নস্তরের লোক—ওদের বেষ্টন করে সাতটি সমুদ্র ; কিন্তু জলময় সমুদ্র নয়, কি যেন আলাদা আলাদা উপাদানে গড়া, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বায়ুময় বলে মনে হচ্ছে। ওখানে দেব-পিণ্ডধারী জীবও রয়েছে। ঐ সাতটি লোকের মধ্যে ভারী চমৎকার লোহার মত কালো আর শক্ত বস্তুতে তৈরী বিশাল নগর-তোরণ, সুদৃশ্য প্রাসাদ, উদ্যান ইত্যাদি ছাড়াও বড় বড় বন্দীশালা রয়েছে অসংখ্য। তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য কত যে শান্ত্রী সিপাহী তার ইয়ত্তা নাই। জলা সেদিন রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি, ওটা কোন জায়গা—কিন্তু এখানে এসেই মা'কে জিজ্ঞাসা করেছিল। মা বলেছিলেন, ওটা জম্বুদ্বীপ। ওখানে ধর্মরূপী যমের রাজধানী। যম মৃত্যু-লোকের কর্তা, রাজধানীতে থেকে তিনি ঐ সপ্তলোকের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। (১)

তার আগে এবং পরেও জলা অসংখ্য নরক লোক এবং প্রেত লোক দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু মা ওকে এর আগেই একদিন সে সব দেখিয়েছিলেন। তাই ওগুলো চিনতে ওর অসুবিধা হয়নি। আজ জলা দেখতে পেল, ঐ সুন্দর জম্বুদ্বীপের মধ্যে ধর্মরাজের বিচারশালা, সেখানে তার পিতার বিচার হচ্ছে। পিতৃদেব

(১) Occult System. দৈবীশৃঙ্খলা

করযোড়ে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। তাঁর অপরাধ তিনি বারম্বার স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা চাইছেন। কিন্তু এখানে অপরাধ অমার্জনীয়। সঞ্চিত আর ক্রিয়মান কর্ম যা কিছু মনুষ্য জন্মে করা হয়েছে, কত জন্মজন্মান্তর ধরে করা হয়েছে, অথচ ফলভোগ সমাপ্ত হয়নি, সেগুলি সব প্রারব্ধ কর্ম নামে চিত্তাকাশকে আশ্রয় করে অধিষ্ঠান করে। এর মধ্যে কোন কর্ম্মের ফল পশুযোনিতে জন্ম নেওয়া—আবার কোনোটার ফল উন্নত মানুষ যোনিতে জন্ম নেওয়া। নরকবাস ইত্যাদিও আছে। তারমধ্যে বলবান যে কর্মফল সেই অনুযায়ী সে প্রথম জন্ম পাচ্ছে। তারপর দ্বিতীয় তৃতীয় জন্মও তাকে পেতে হবে, অর্থাৎ কোন কর্মের ফলই না পাওয়া হবেনা। কাজেই—মার্জনা এখানে নাই, করুণার কোন কথা এখানে উচ্চারিত হয়না। কঠোর নিয়মানুগ ব্যবস্থা।

তবে একটা ব্যবস্থা জলার খুব ভাল লাগলো। দেখলো, খুব পাপা আত্মাও প্রবলতম কর্মফলের জন্য মানুষ-যোনিতেই জন্মাচ্ছে। তারপর পুরুষার্থ অর্থাৎ তার স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনায় এমন উচ্চ শ্রেণীর কর্ম সে করতে পারে যাতে আগের জন্মের সঞ্চিত পশুত্ব বা অন্য যোনি প্রাপ্তির সংস্কার সঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও সে আবার এই জীবনের ভালো কাজের ফলে আগামী জন্মে মানুষই হবে এবং আবার—যদি সে দ্বিতীয় জন্মেও ভালো কাজ করে' অত্যুন্নত সংস্কার লাভ করে, তবে আরো উচ্চতর মানুষ হবে; এইভাবে উন্নতি করে' সে পুরুষার্থ-বলে আগের সঞ্চিত পাপকর্ম-ফলগুলি এড়িয়ে যেতে পারে। মানুষ-যোনিতে কর্ম-স্বাতন্ত্র্য আছে, অন্য কোন যোনিতে নাই, তাই মানুষ-যোনিই শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করে' মানুষ প্রবৃত্তি-মার্গকে নিরুদ্ধ করে' নিবৃত্তিমার্গে গিয়ে পুরুষার্থ বলে ভবিষ্যৎ জীবনের পর জীবনকে ভালো করতে পারে, এমনকি, ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে পারে। তখন তার অভুক্ত ইতর যোনি লাভের কর্মফলগুলিও মহাকাশে লীন হয়ে যায়।

জলা আরো দেখলো, পশুযোনি এবং স্বর্গীয় যোনি কেবল ভোগের উপাদান যোগায়, ওখানে কর্মের স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই, কাজেই জীব পশুলোকে বা স্বর্গলোকে

কর্মের কোন সংস্কার পায়না। নূতন কর্মের সংস্কারের জন্য আবার মানুষ হতে হয়। এই জন্যই জীবকে বার বার ঘুরে আসতে হয় পৃথিবীতে। স্বর্গ-সুখ ভোগ থেকে নিজকে বিরত রেখে যদি কেউ উচ্চতর গতিলাভের জন্য ধ্যান-ধারণা-উপাসনায় আত্মনিয়োগ করে, তবে তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

জলার বাবার দণ্ডবিধান জারি হয়ে গেল; অশ্রু সজল নয়নে বাবা তার প্রেতলোকের দিকে যাচ্ছেন। দু'জন কুৎসিত দর্শন দূত তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে। এত বেগে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে যে উনি চলতে পারছেননা। দূতরা চাবুক মারছে পিঠে। জলার চোখ দিয়ে দর বিগলিত জলধারা নেমে এল। তার বাবা, অখণ্ড প্রতাপশালী জমিদার ধর্ম্মদাস ঠাকুর আজ নিঃসহায়! মানুষের ধনসম্পদের মূল্য কত তুচ্ছ, দেখছে আজ জলা। কিন্তু মনটা ওর আরো খারাপ হয়ে গেল, কেন, তা ও বুঝতে পারলোনা। তবে কি আজই দাদার কিছু একটা হবে, যার জন্য বাবাকে ওরা নিয়ে গেল? জলা আর বিলম্ব না করে উঠে পড়লো। দাদার খবরটা একবার নিয়ে আসবে। নিজের আলোর মত দেহটাকে আরো সূক্ষ্ম করবার জন্য জলা ইচ্ছাবেগ সঞ্চালিত করছে, অকস্মাৎ নীলোজ্জল রেখাবৎ একটি সূক্ষ্ম জ্যোতিরেখা এসে পড়লো ওর মাথায়। জলা তখনি বুঝতে পারলো, গুরুদেব আসছেন!

উর্দ্ধে চেয়ে দেখলো, বহু দূরে স্বচ্ছ নীল আলোকবিন্দুটী নীল পদ্মের মত ভেসে আসছে অসীম কারণ-মহাসাগরের বুকে। জলা হাতযোড় করে অপেক্ষা করতে লাগলো। পরক্ষণেই গুরুদেব এসে পৌছুলেন।

—কোথায় যাচ্ছিলে মা? গুরুদেব প্রশ্ন করলেন। জলা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললো,—প্রভু সর্বজ্ঞ, পৃথিবীতে একবার দাদাকে দেখতে যাচ্ছিলাম, আর ঐ দেখুন প্রভু, বাবাকে কি রকম করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

– হ্যাঁ মা, দেখেছি আমিও, কিন্তু কিছুই আমরা করতে পারবোনা। প্রত্যেক জীব স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করে। ওর প্রাক্তন কর্মফল ওকে ভুগতেই হবে মা, তবে তোমার বাবা দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করে সেই সংস্কারকেই প্রবল করেছে, তাই পাপের ভোগ আগেই তার হয়ে যাবে। পরে পুণ্যের ফল ভোগ

কালে তোমার মা'র সহায়তায় তার পুরুষকার তাকে সৎকাজে প্রবোধিত করবে মা, ভয় নাই। তোমার বাবা অবিলম্বে শুদ্ধি লাভ করবে।

—অনুতাপ করলে কি দুষ্কৃতির সংস্কার আগে ভোগ করতে হয় প্রভু?

—হ্যাঁ। বুঝছোনা? যারা পাপের জন্য অনুতাপ করে প্রার্থনা করে, তাদের চিত্তাকাশে সেই পাপের কাজটাই প্রবল সংস্কার হয়ে ভেসে থাকে। তাতে লাভ হয় এই যে, পুণ্যের ফলভোগ করবার সময় প্রারব্ধ পাপের ফলে নীচুদিকে আকর্ষন থাকেনা, সেসময় তাই আরো পুণ্য সঞ্চয় করতে পারে। আর যারা অনুতাপ না করে, তাদের অহঙ্কার জন্মায়, নিজের যৎসামান্য পুণ্যের কথাই চিন্তা করে সর্বদা, তাই আগেই পুণ্যের ফলটুকু ভোগ করবার সময় সঞ্চিত পাপের টানে অনেক পাপ করে বসে। তবে যাদের পুণ্যের ভাগ খুবই বেশি, তারা অবশ্য ফলভোগের সময় পুণ্য কাজই করে, তাই পাপের ভোগ আর তাদের করতে হয়না; সে সংস্কার অনন্তে লীন হয়ে যায়।

—প্রভু, আমি বুঝতে পারছিনা, এই পাপ এবং পুণ্যের মূল কোথায়? কোথায় উৎপত্তি!

—প্রকৃতি থেকে। জীবের জড় শরীর মা। প্রকৃতির সূক্ষ্ম অংশে জীবাত্মা বিম্বিত হন। তাকে কারণ শরীর বলে। ঐ কারণ শরীরই জীব-ভাবের আদি, আর ওর থেকেই স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর হয়। বেদান্ত বলেছেন "অনির্ব্বাচ্যাঽনাদ্য বিদ্যারূপা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর কারণমাত্রং স্ব স্বরূপজ্ঞানং যদস্তি তৎ কারণ শরীরম্" —কিন্তু মজা কি জানো মা; এই কারণ শরীর জন্মাবামাত্রই জীবের অহংভাব জন্মে, তখন ভোগ রাগ পেতে তার ইচ্ছা যায়, ঐ ইচ্ছাই তাকে সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল শরীর দান করে। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ বলেন,—

অন্তশরীর-আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ মনো বলং জজ্ঞে, ততঃ প্রাণো মহানণুঃ॥ ইত্যাদি

আত্মার প্রেরণাই মূল, তাতেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। আর সেই ক্রিয়া থেকেই ইন্দ্রিয় মন, বল, আর সূক্ষ্ম প্রাণের বিকাশ হয়। প্রাণের বিকাশ হলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা জাগে আর তার নিবারণের জন্য ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়। এইভাবে সব সুজাগ্র

হলেই বাগিন্দ্রিয় আর বহ্নি-দেবতার বিকাশ হয়। তখন অবিদ্যা দ্বারা উপহিত চৈতন্যে অহং ভাব জাগে, তার প্রেরণায় কারণ শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর জন্মায়।

—সে শরীরে কি কি উপাদান থাকে প্রভু?

—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ, মন আর বুদ্ধি এই সাতেরটি * নিয়ে কারণ শরীর সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে। এই উপাদানগুলিও সূক্ষ্ম! এখন বুঝে দেখ, মন নানা কিছু অনুমান এবং জল্পনা করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি সেটাকে নিশ্চয় করে দিতে পারে। কিন্তু অহঙ্কার বুদ্ধির মূলে থেকে জীবের কর্তৃত্বাভিমান জন্মিয়ে দেয়, তখন ভোগের ইচ্ছা প্রবল হয় আর সেই ইচ্ছার টানে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম দিয়ে গড়া স্থূল শরীর তাকে গ্রহণ করতে হয়। কারণ স্থূল শরীর নইলে পার্থিব ভোগ-বাসনা মেটেনা। বেদান্ত আবার বলেন, ঐ শরীর পাঁচটি কোষে গড়া। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আর আনন্দময় কোষ। একেই বলে জীবদেহ আর জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ, কারণ মানুষ স্বেচ্ছাকৃত কর্মদ্বারা প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মার্গে যেতে পারে, স্বর্গ বা নরকে যাওয়া তার পুরুষাকারের উপর নির্ভর করছে; ঐ পুরুষাকারের ফলই আগামী জন্মে ভাগ্য হয়ে দেখা দেয়।

জলার খুবই কঠিন লাগছিল বিষয়টা কিন্তু বুঝবার আগ্রহ তার অত্যধিক, তাই করযোড়ে বললো—আমাকে আরো সহজ করে বুঝিয়ে দিন।

—তুমি আপনি বুঝবে মা। বুঝবার আগ্রহ যার আছে, সত্যকে যে জানিতে চায় সে জানতে পারে। সকল সত্য পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন সেই মহাসত্য, মহা চৈতন্য; জগৎ তাঁতেই বিকসিত, বিলসিত, বিধৃত; তাঁকে জানাই শেষ জানা মা, 'ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' তাঁকে জানো, তিনি তোমার সব সন্দেহের নিরসন করে দেবেন।

---

* বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণ পঞ্চকৈর্মনসাধিয়া
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতেঃ॥ —পঞ্চদশী

জলা চুপ করে রইল। তাঁকে জানবে, কিন্তু কেমন করে জানবে? কত ক্ষুদ্র নারী সে, আর কোথায় সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বর পরাৎপর পরমব্রহ্ম—!

গুরুদেব যেন তার মনের কথা জেনেই হেসে বললেন—তুমি ঠিকই ভাবছো মা, তাঁকে জানা যায় না। কিন্তু তিনি নিজেই জানিয়ে দেন! তোমাদেরই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হোত যে মিছে।"

কবিরা সত্যকে উপলব্ধি করেন মা, তাই তাঁদের মুখ থেকে আপ্তবাক্য বের হয়। ত্রিভুবনেশ্বর জীবকে না পেলে থাকতে পারেন না, তাঁর প্রেম মিথ্যা হয়ে যায়। তাঁর লীলা বিলসিত হয় না,—তাই ক্ষুদ্র হয়ে, নীচু হয়ে তিনি ক্ষুদ্রের কাছেই আসেন। ছোট একটা আয়নায় কত বড় বিরাট আকাশ ধরা যায় মা, বল দেখি! তোমার চিদাকাশকে আয়নার মত কর, তিনি বিরাট হলেও প্রেম-ভক্তির ছোট সেই মুকুরে প্রতিবিম্বিত হবেন। তাঁকে জানতে পারবে।

—আপনার আশীর্বাদ যখন পেয়েছি প্রভু, তখন নিশ্চয় আমার শ্রেয়ঃ লাভ হবে। কিন্তু আমাকে কি আবার ঐ ভোগ-বিলাসের জন্ম-মৃত্যু-ভূমি পৃথিবীতে জন্মাতে হবে গিয়ে?

—তুমি সাত জন্ম পৃথিবীতে প্রেম ভক্তির সাধনা করেছ মা! তোমার প্রেম ভক্তি নিষ্কলুষ, কিন্তু সে প্রেম এখনো জগৎ-স্বামীর চরণে অর্পিত হয়নি। সমীরকে স্বামী ভেবে সমীরের মধ্যেই তুমি ঈশ্বরের সাধনা করেছ; নারীর পক্ষে এ খুবই উৎকৃষ্ট সাধনা। বারংবার স্বর্গভোগের সুযোগ পেয়েও তুমি দুঃখ দৈন্য ভরা ধরণীতে গিয়ে সাধ্যমত সেবাধর্ম, ন্যায়ধর্ম, ত্যাগধর্ম, সত্য-ধর্মের আচরণ করেছ, তাই স্বর্গ তোমাকে বাঁধতে পারেনি; স্বর্গসুখ তুচ্ছ করে কর্মমার্গ আশ্রয় করেছ বলে তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্থ লোকে যাবার অধিকারিণী, কিন্তু তোমার

একমাত্র আকর্ষণ সমীর, সেইটি তোমার প্রেমভক্তির শক্তিকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হতে দিচ্ছেনা! জ্ঞান লাভ না হলে ভক্তি অন্ধ থেকে যায় মা, প্রেম অবিশুদ্ধ থাকে।

—তাহলে উপায় কি হবে দেব? জলা সসঙ্কোচে প্রশ্ন করলো।

—ভয়ের কিছু নাই মা। চতুর্থ, এমনকি পঞ্চম লোকের আত্মারও পৃথিবীতে পতন হতে পারে, কিন্তু খুব বেশীদিন তাকে ঘুরতে হয় না। যদি একান্তই তোমাকে জন্ম নিতে হয় আবার, তো কর্ম করে জ্ঞানের পথ উজ্জ্বল করে আসবে! কিন্তু এখানেই তুমি যে-ভাবে সাধনা করছো, তাতে মনে হয়, তোমায় আর যেতে হবে না। স্বর্গ ভোগ তো করছো না মা তুমি!

—না প্রভু, স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই। আমাকে যেন আর পৃথিবীর পঙ্কে পড়তে না হয়।

গুরুদেব হাসলেন। বললেন—যাওয়া না যাওয়া তোমার নিজেরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মা। সমীরের জন্য ঐ পৃথিবীতে সাত বার জন্মেছ, তাকে পাওনি, তার পূর্বে নয়বার তুমি মঙ্গলের অধিবাসী ছিলে, তার আগে ছিলে ছয়বার শুক্রগ্রহে, পরে এই সেদিন অতি অল্পদিনের জন্য দু'বার তুমি চন্দ্রলোকে জন্মে এসেছ। সমীরের সঙ্গে কোন বারই মিলতে পারনি, অথচ সমীরের জন্য মন তোমার জ্ঞানের পথে যেতে পারছে না, আকর্ষণ এতই প্রবল।

—চন্দ্রলোকে কি আমার জন্ম হয়েছিল প্রভু?

—হ্যাঁ, চন্দ্রলোকের জীবন স্বল্পকালস্থায়ী। দু'বার দুরকম জীবন তোমাকে দেওয়া হয়েছিল ওখানে। তারপর পৃথিবীতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তুমি মা'র সাহায্যে ফিরে এলে। সমীরের উপর আকর্ষণ থাকা তোমার স্বাভাবিক মা,—তোমরা দু'টিতে এক সত্ত্বা বিশিষ্ট আত্মা; আত্মার স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গ-ভেদ নাই; এক জীবাত্মা বৈষ্ণবী মায়ার লীলাবিলাসে মায়া মুগ্ধ হয়ে নিজকে প্রকৃতি আর পুরুষ রূপে বিভক্ত করে। (১) তখন উভয়ের কর্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভ হয়। যেমন

(১) স ইমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ৎ।
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্॥—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

সোনার সূক্ষ্মতম কণাও সোনা, তেমনি এই বিভাজ্য অংশেও জীবাত্মার পূর্ণ শক্তি বিদ্যমান থাকে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ওর প্রত্যেকটিকে চালিত করে স্বতন্ত্রভাবে, অথচ—চুম্বক আর লোহার আকর্ষণের মত তীব্র আকর্ষণ জেগে থাকে দুজনের জন্য দুজনের অন্তরে, কিন্তু একজন হয়তো বিপথগামী হয় অপরজন হয়তো উচ্চগতি লাভ করে ; তবে পরিণামে দুটিতে একটী হবেই।

—দুজনের পুর্ণ মিলন তাহলে কি করে সম্ভব হয় প্রভু ?

—হয়, শত শত জন্ম পরেও হয়। এর জন্য লোকে লোকে দেবতারা রয়েছেন ; প্রেম, ভক্তি, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা আদি দেবকন্যারা রয়েছেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম্ম নামে ঋষিরা রয়েছেন। তাঁরাই সব ব্যবস্থা করেন। তোমাদের জন্যও তাঁরা ভাবছেন, তবে তোমাদের কর্মফল ছাড়া ফল দান করাতো সম্ভব নয় মা, তাই করিয়ে নিচ্ছেন কর্ম।

—করিয়ে নিচ্ছেন ?

—হ্যাঁ মা, করিয়ে নেবেনই। যাকে দিয়ে যা করাবার তা করাবেনই ওঁরা, তবে কারো দেরী হয়ে যায়, কেউবা শীঘ্র করে। আচ্ছা মা, এসব কথা আরেক দিন আরো ভালো করে বুঝিয়ে দেব। আজ পৃথিবীতে যাবে বলছিলে, যাও। কিন্তু সাবধান হয়ো মা, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান বড় ভয়ানক ; তুমি সূক্ষ্মলোকের অধিবাসী ; এলোকের তপস্যার শক্তি অনেক বেশী। তোমার দৈবী শক্তিতে পৃথিবীর মঙ্গল করে নিজেকে উন্নত করো, কিন্তু জড়িত হ'য়ো না ; জলের উপর তেলের মতন নিস্পৃহ থেকো মা ! জানবে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে একটি মাত্র অখণ্ড সত্ত্বা জাগ্রত আছেন। যাঁর সুখ নাই, দুঃখ নাই, আনন্দ নাই, বেদনা নাই, সত্ত্ব রজঃ তমঃ কিছুই নাই অথচ সবই তাঁর আছে, তাঁর স্পন্দনে সবকিছু স্পন্দিত হচ্ছে। সব গুণিই আছে, অথচ কোন গুণ নাই, তাই তিনি গুণাতীত। সকলই তাঁর, তোমায় দিয়ে তিনি কাজ করাচ্ছেন। এই তাঁর লীলা-বিলাস।—তোমার সুখ দুঃখের দাতা এবং ভোক্তা তিনি নিজেই অথচ তিনি কিছুই নেন না, কিছুই দেন না।

—বুঝতে পারছি না প্রভু !

বড্ড শক্ত কথা মা। বুঝবে, আরো অগ্রসর হও, তাঁকে ডাক, তিনি বুঝিয়ে দেবেন।

* * * *

উচ্চলোকের অধিবাসিনী জলার আকাশপথে দেবযান গতি লাভ হয়েছে—নিজেই জলা বুঝতে পারলো। তার দেহের ভার সে প্রায় বুঝতেই পারে না, অথচ মনের শক্তি এবং বুদ্ধির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে; তার দৃষ্টিশক্তি এখন শত সহস্র যোজন দূরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, শ্রবণশক্তি শুনতে পায় বহু দূরের বাক্যালাপ, আর মননশক্তি তার এতো বেড়ে উঠেছে যে ভূঃ ভুবঃ স্বর্লোকের অনেক ব্যাপারই তার মনের মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে। আকাশপথে আসবার সময় জলা পিতৃলোক, প্রেতলোক দেখে এলো, কিন্তু পৃথিবীর মাটির সামান্য কয়েকশত হাত উপরে একটা জায়গা দেখলো, নিদারুণ অন্ধকার, ধূমপরিপূর্ণ আর দুর্গন্ধময়। জলা বুঝলো ওটা নরক। ভয়ে সে ওপাশ থেকে পালিয়ে একেবারে বৈদ্যনাথ ধামের যোজন বিস্তৃত ভূমিতে নেমে তাদের যশিডির বাড়ীতে এসে পৌছুল। এসেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল জলা।

প্রবাল শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে, আর তার মাথার শিয়রে বসে আছে একটি বছর কুড়ি বয়সের মেয়ে; মাথায় ঘোমটা, লালপাড় শাড়ী, পায়ে আলতা, সীঁথিতে সিঁদুর। মুখ দেখা যাচ্ছে না মেয়েটার, তবে অনুমান করা যায়, শ্যামলাঙ্গী সুশ্রী বৌ—হাত-পাগুলো ভারী কোমল আর নধর। বসে বসে প্রবালের মাথার চুলে হাত বুলুচ্ছে, মুখে স্নিগ্ধ একটুকরো হাসি।

কে মেয়েটা? জলা তো একে কখনো দেখেনি! ঘরে অন্য কেউ নাই, বাইরে বৈকুণ্ঠ খোকাকে কোলে নিয়ে বসে আছে; খোকাও ঘুমুচ্ছে।

গ্রীষ্মের দিনের দুপুর বেলা এখন পৃথিবীতে ঘুমোবারই সময়, কিন্তু এই মেয়েটা কি নার্স? অথচ নার্সের মতন চেহারা তো নয় ওর। দাদা কি এর মধ্যে আবার বিয়ে করেছে নাকি? দেখা যাক, বড় বৌদি কোথায়!

জলা উপরে উঠে গেল, দেখলো, বড় বৌদি ঘরে খিল বন্ধ করে চিঠি লিখছে,

লিখছে লোচনকে—"প্রিয়তম! তুমি যাওয়ার পর তিন দিন কেটেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে, তিন যুগ! বড়বাবু শয্যাগত; আমাকে আর কিছু বকাবকি করেনি, তবে দেশ থেকে বৈকুণ্ঠকে আনিয়েছে তার সেবা করতে, আর কাশীতে টেলিগ্রাফ করেছে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেবার জন্য। তিনি আজ আসবেন। বড় বাবু আমার সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না। বৈকুণ্ঠ আর উষা দেখাশুনা করছে তাঁর। আমি বড় ভাবনায় রয়েছি, ওদিকে আমার প্রায় চার মাস পেরিয়ে পাঁচে পড়েছে। বড় বাবু যদি ...”

জলার আর দেখতে ইচ্ছে হোল না। এই শয়তানীর হস্তে শব্দব্রহ্ম কলঙ্কিত হচ্ছেন না তো? ধিক! বন্ধ দরজার এপাশে জলা এসে দাঁড়ালো। তার স্বর্গের গুরুদেবের পৃথিবীর বংশধর আজ আসবেন এখানে; আসুন, জলা তাঁকে প্রণাম করে চলে যাবে এখান থেকে। এই পাপ পুরিতে এসে সে নিজেকে আর বিড়ম্বিত করবে না। দেওঘরের মন্দিরের পানে তাকিয়ে জলা প্রণাম করলো। তারপর নেমে এল দাদার ঘরে।

সেই সুন্দর বৌটি বসে বসে হাত বুলুচ্ছে প্রবালের মাথায়। কি গভীর স্নেহে যে চেয়ে রয়েছে ওর মুখের পানে! জলার উপস্থিতি ও বুঝতে পারছে না। কিন্তু ওর মুখের সামান্য অংশ দেখেই জলার ভুল ভেঙ্গে গেল। মেয়েটি মানবী নয়, মানব-দেহধারী আত্মিক, কিন্তু ঠিক মানুষের মত রূপ নিয়ে রয়েছে, খুব শক্তিশালী আত্মিক, সন্দেহ নাই। জলা বিস্মিত হোল, কিন্তু মনঃশক্তি দিয়ে তার নিজ দেহকে সাধারণ আত্মিকদের দর্শনীয় করে মেয়েটির কাছে এসে শুধুলো—তুমি কে ভাই? তোমায় তো দেখিনি!

মেয়েটি ওর পানে বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে মধুর হাসলো, বহুদিনের পুরানো বান্ধবীর মতন হাত ধরে বললো—তোমায় আমি চিনি ভাই, অনেকবার দেখেছি, কিন্তু তুমি তখন মানুষ ছিলে কিনা, আমায় তাই দেখতে পেতে না, আমি তোমার বৌদি হই ঠাকুরঝি! তোমার দাদার গত জন্মের ধর্মপত্নী আমি।

—গতজন্মের পত্নী? এতদিন কোথায় ছিলে তুমি বৌদি? তোমার মতন লক্ষ্মীর অংশ বৌ থাকতে দাদা আমার ঐ হারামজাদীকে কেন এজন্মে বিয়ে

করলো ?—জলা কেঁদে ফেললো মনের আবেগে. কিন্তু মেয়েটি হেসেই বললো,—

—ওসব প্রাক্তন কর্মের ফল ভাই, তোমার আমার বুঝবার উপায় নাই। তোমাদের এই সংসারটা নষ্ট হয়ে যাবে, এই হয়তো বিধাতার ইচ্ছা। আমি গত জন্মে মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণের একমাত্র মেয়ে ছিলাম ; তোমার দাদার সঙ্গে আমার খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল। তারপর উনি কত বড় হলেন, সাগর পারে গেলেন, ফিরে এসে কত নাম, কত ধনসম্পদ অর্জন করলেন, কিন্তু……কেঁদে ফেললো বৌটি। জলা ব্যাকুল হয়ে শুধুলো—

—কিন্তু কি করলেন ? বল ভাই বৌদি ?

—উনি আমায় কখনো স্পর্শ করেন নি। আমি প্রতি রাত্রিতে বাসক-সজ্জিতা হয়ে বসে থাকতাম ঠাকুরঝি ; প্রতিরাত্রেই নিরাশ হতে হোত। উনি থাকতেন এক দেবদাসীর ঘরে, সে তোমার ঐ নীলিমা বৌদি। টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো মেয়েটির চোখ থেকে, ভাঙ্গা গলায় বললো—বাবা শেষে নিরাশ হয়ে আমাকে দেবমন্দিরে উৎসর্গ করে দেন। আমি দেবতার পূজা করতাম; আর বলতাম "আমার স্বামীর যেন কল্যাণ হয়। হে ঠাকুর, আমার স্বামীকে যেন আমি আগামী জন্মে লাভ করি।"

—তারপর ? আগামী জন্মে কেন পেলে না বৌদি ?

—পেলাম না, কারণ তারপর আর আমি জন্মাইনি। ঐ নীলিমাও দেবদাসী ছিল, দেহ বিক্রয় সে করেছে, বহু যুবকের সর্বনাশও করেছে, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় দেবতার কাছে নৃত্যগীত করে উপাসনা করতো, আর বলতো, "আগামী জন্মে সে যেন নটনারায়ণের স্ত্রী হয়, তার যেন ভাল বংশে বিবাহ হয়ে সমাজ-জীবন লাভ হয়," আর, তার ফলে ও এজন্মে তোমার দাদাকে পেয়েছে। আমার কপালে নেই, তাই পৃথিবীতে জন্মই হোল না।

—দাদার নাম ছিল বুঝি নটনারায়ণ ? তোমার নামটি কি বৌদি ?

—কলালক্ষ্মী। আমার বাবা ছিলেন শিল্পী, তাই ওরকম নাম রেখেছিলেন। হাসলো বৌটি।

—এজন্মে তুমি দাদাকে পাবে তো ভাই লক্ষ্মীবৌদি ?

—হ্যাঁ, এবার আর ভয় নেই, ঐ নীলিমা দেবতার বর লাভ করেছিল, কিন্তু ওতো স্বামী-সংসারে নিষ্ঠা রাখতে পারলো না ; ওর গত জন্মের চরিত্রহীনতার সংস্কার ওকে প্রথম সুযোগেই নষ্ট করেছে ; তবে ও বড্ড ভাগ্যবতী ঠাকুরঝি, ও বর চেয়েছিল 'ঠাকুর আমার গর্ভে যেন জনপাবন পুত্র জন্মায়,' তাই প্রণব, ঐ অমৃত লোকের দেবশিশু, আমার গর্ভে যার জন্মবার কথা ছিল, ঠাকুরঝি, কান্নায় মূর্চ্ছিত হয়ে যাই, যখন ভাবি......

—কেঁদোনা বৌদি ! ঠাকুর মঙ্গলময়, তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমিও জনপাবন পুত্র লাভ করো। কিন্তু বুঝতে পারছিনা, একটা বেশ্যাকেও ঈশ্বর এত কৃপা করেন কেন !

—তাঁর কাছে বেশ্যা সতীর তফাৎ শুধু নিষ্ঠায় ঠাকুরঝি ! ও যখন নৃত্য করতো, তখন সারা প্রাণমন সমর্পণ করে দিত ঠাকুরের পায়ে। আমি দেখতাম আর ভাবতাম, ও যদি ব্রহ্মে লীন হতে চাইতো তো তাই পারতো।

প্রবাল জেগে উঠেছে, জলা কলালক্ষ্মীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললো—দাদা বোধ হয় কাল দীক্ষা নেবে বৌদি।

—হ্যাঁ, ওঁর ইচ্ছা নয় যে নীলিমা ওঁর সঙ্গে দীক্ষা নেয়, তাই ভাবছেন আমিও ওঁর সঙ্গেই নেব দীক্ষা। অবশ্য আমার তো মানুষ হয়ে দীক্ষা নেওয়া কপালে লেখা নেই, তবু ওঁর মন্ত্র নিয়ে আমি আরো একটু এগিয়ে যেতে পারবো।

—দাদা কি শীগ্রি পৃথিবী ছাড়বেন বৌদি ? জলা প্রশ্ন করলো।

—না, এখনো বছর কয়েক দেরী রয়েছে। প্রণবকে মানুষ করে উপনয়ন দিয়ে তার সঙ্গে নিজের কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতি করে তবে উনি পৃথিবী ছাড়বেন ; অবশ্য উৎপলপর্ণার সঙ্গে সম্বন্ধ ওঁর চুকে গেছে পরশু দিনই।

—উৎপলা কে ?

—তোমার ঐ নীলিমা বৌদির গত জন্মের নাম।

—ওঃ, নামটাতো খুব জমকালো দেখছি—উৎপলপর্ণা—বাঃ ! জলা হাসলো ; বললো,—আচ্ছা বৌদি, তুমি এখন থাকো কোন জায়গায়, কোন লোকে ?

—আমার থাকবার জায়গা স্বর্গলোকের পঞ্চম স্তরে, কিন্তু আমি সেখানে যাই না। এতো ভোগবিলাসের উপকরণ সেখানে যে আমার ভয় করে, আবার হয়তো ভোগে ডুবে যাবো, ভুলে যাবো আমার পূজ্য শ্রীমাধবের কথা—আমার স্বামী নটনারায়ণের কথা, তাই আমি পিতৃলোকে বাবার কাছে থাকি। আর জানোতো ভাই, খুব উচ্চলোকের দেহ ধারণ করলে পৃথিবীতে আসতে বড় কষ্ট হয়, অথচ এখানেই আমার সর্ব্বস্ব রয়েছে।*

জলা বুঝতে পারলো, কলালক্ষ্মী প্রেমভক্তির পথে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, কিন্তু সে সাকার উপাসিকা, নিরাকার ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ হয় নাই।

বাইরে এসে কলা প্রণবকে আদর করলো, চুমা দিল, হেসে বললো,

—বাচ্চা সন্নিসী, তোর এই না-দেখা মাকে উদ্ধার করার কথাটা ভুলিস না। মুখে হাসি, চোখে জল মেয়েটার। জলা শুধুলো—ও কি দাদাকেও উদ্ধার করবে ভাই বৌদি ? দাদাতো অনেক পাপ করেছেন।

—হ্যাঁ, ও পরম ব্রহ্মের জ্যোতি, অদ্বৈতবাদী ও ; ওর কাছে পাপ-তাপ কিছু নেই, ওর কাছে বাপ-মাও নাই, ও নিজেই ব্রহ্ম, সোহং।

—অত উচ্চ স্তরের সাধক পৃথিবীতে কেন আসেন বৌদি ?

—কেন আসেন ? আসেন জগৎ-হিতায়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে", তাই ওঁরা আসেন বুদ্ধ, খৃষ্ট, বামনরূপে, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যরূপে, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দরূপে, আমাদের পথ দেখিয়ে দিতে আসেন ওঁরা, নইলে কোন পথে যাবে ঠাকুরঝি ? ও এসেছে এই বংশে, এরই জন্যে এরা মুক্তি পাবে। ও এত বড় আত্মা।

জলা নিজের ভুল বুঝতে পারলো, বিস্মিত হয়ে প্রশ্নো করলো,

—তুমিতো দ্বৈত, অদ্বৈতবাদ শিখে ফেলেছ বৌদি, কোথায় শিখলে এসব ?

—নাই ভাই, অতবড় শক্তি নাই আমার। তবে আমি অনেকদিন মরলোক

*পরলোকের কথা—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—ভক্তিভূষণ প্রণীত।

ছেড়েছি। কত বড় বড় আত্মার সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা বলেন, শুনি। কিন্তু আমাদের মেয়েদের জন্য ভক্তির পথই ভালো ঠাকুরঝি. অদ্বৈতবাদ পুরুষের জন্য। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, গুণাতীত সত্ত্বার ধারণা তাদের পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু আমরা চিনি হতে চাইনা, চিনি খেতে চাই। স্বামীর মধ্যে জগৎ-স্বামীকে লাভ করতে চাই। গোপীদের মতন তাঁর দেওয়া সুখদুঃখ, বিরহ মিলন নিয়ে আমরা তাঁকে লাভ করি। এই আমাদের আনন্দ। তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর নাম মাধুর্য্য, তাঁর সহ-রতি-আরতিই আমাদের ভাল লাগে। তুমি কোন লোকে রয়েছ ঠাকুরঝি ?

—স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে। আমি উচ্চ লোকে যাই না বৌদি। আমারও জীবনের ইতিহাস বড় করুণ। শুনবে তো চল। সন্ধ্যা হয়ে এলো, শ্রীধাম বৈদ্যনাথের মন্দিরে আরতি দেখে বলবো তোমাকে সব কথা। জলা হাত ধরে টানলো কলার। কলা আর একবার চেয়ে দেখলো প্রবালের পানে, উঠে বসেছে প্রবাল। চাকরকে বলল,

—ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে বল বৈকুণ্ঠ, আর তুই সঙ্গে যা, প্রণবকেও নিয়ে যা।

—যাই হুজুর ! বলে বৈকুণ্ঠ উঠলো। প্রবাল আস্তে মাটিতে নেমে এক গ্লাস জল খেল। তারপর বারান্দায় এসে দেখলো—একটা চাকর ফিরছে, শুধুলো—

—কোথায় গিয়েছিলি মনমোহন ?

—ডাকখানা হুজুর, মা চিঠি ফেলতে দিয়েছিলেন।

—ও, যা। প্রবাল আর কিছু শুধুলো না, নীলিমার সম্বন্ধে ও একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে গেছে, দেখে লক্ষ্মী একটু হাসলো। জলা দেখে বললো,

—হাসলে যে বৌদি ?

—তোমার দাদার আক্কেল হচ্ছে, দেখলাম।

—ও, চল বৌদি ! বলে জলা ওকে নিয়ে বৈদ্যনাথধামে এসে উপস্থিত হোল। সন্ধ্যার দেরী আছে। দু'জনে একটা পুকুরের বাঁধা ঘাটের পৈঠায় বসে কথা বলতে লাগলো।

জলাই বললো তার নিজের কাহিনী ; শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মী। আকস্মাৎ সুমুখে রজত-ধবল-কান্তি এক দিব্য মূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটলো ; তাঁর অঙ্গ-জ্যোতিতে যোজন পরিমিত স্থান স্নিগ্ধ জ্যোস্নালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, মেঘমালার মত জটাজুট থেকে হিরণ্য বর্ণা সুরতরঙ্গিনী বিগলিত হচ্ছেন, জলা আর লক্ষ্মী করযোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ আভূমি নত হয়ে পড়লো তাঁর চরণে। প্রসন্ন হাস্যচ্ছটায় অমৃত ক্ষরিত হচ্ছে তাঁর, স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

—আপন ভোলা মেয়ে, মন্দিরে আরতি আরম্ভ হয়েছে, দেখবি না তোরা ?

—করুণাময়, জীবকে তুমি এমনিভাবে সর্বক্ষণ সৎ, চিৎ, আনন্দের পথে, শ্রেয় লাভের পথে পরিচালিত কর, তবু আমরা ভুলে যাই, ভুলে যাই নিজের সুখদুঃখের মায়ায়, মোহে, অহঙ্কারে। তুমি কত বিরাট, তবু কত ক্ষুদ্র হয়ে কাছে কাছে রয়েছো। অন্তরে বাহিরে, কত রূপে, কত কথায় আমাদের চৈতন্য দান করছো, তবু আমরা থাকি অচৈতন্য, হে বিশ্বের চৈতন্যময় পরম সত্ত্বা, তোমায় নমস্কার !

উঠে দুজনেই দেখলো, মহেশ্বরের অঙ্গজ্যোতি মহাকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে, শুভ্র জ্যেস্নালোকে গগনমণ্ডল পরিপ্লাবিত ! দু'জনে আবার প্রণাম করে দেব মন্দিরে এসে দাঁড়ালো। চতুর্দিকে অসংখ্য আত্মিক, কত মুক্তাত্মা, কত সাধু, কত সাধকের পবিত্র আত্মা, কত যুগ যুগ ধরে কৃচ্ছ্র সাধনায় নিরত ভোগ বিরত তপস্বীর আত্মা, কত ব্রহ্মবাদিনী নারী, কত সতী সাধ্বী, কত প্রেমিক প্রেমিকা, তার সঙ্গে কত নৃত্য-শিল্পী, সঙ্গীতাচার্য্য, গ্রন্থকার, কবি, দার্শনিক, কত নট, কত নটী, আবার কত উচ্চ শ্রেণীর ভূত প্রেত, যাদের আত্মিক দেহ পদ্মরাগ মণি অপেক্ষাও উজ্জল কি এক জ্যোতিপরমাণুতে গঠিত,—এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবতার আরত্রিক আরম্ভ হয়েছে। নৃত্য ভঙ্গিমায় বৃদ্ধ পুরোহিত প্রদীপ-শিখা নাচিয়ে চলেছেন। দৃশ্য অপূর্ব ! ভূলোকেই যেন কৈলাসধাম নেমে এসেছে। এক কোণে দাঁড়িয়ে দিব্য দেহধারী একজন স্তোত্র পাঠ করছিলেন :

"প্রভুমীশমনিশমশেষগুণং, গুণহীন মহেশ গরলাভরনং।
রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥

কলালক্ষ্মী জলাকে বললো,—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য। আমি আরো দু একদিন এসে দেখেছি, উনি এখানে প্রায়ই আসেন ; এখান থেকে আবার কাশী যান দু'একদিন।

—দেখা করে কথা বলা যায় না বৌদি ?

—হয়তো যায়, কিন্তু ঠাকুঝি, ওঁরা সব সময় আত্মানন্দে বিভোর থাকেন। তোমার ইচ্ছা বুঝে যদি নিজেই কথা বলেন, তবেই বলা উচিৎ। না হলে ওঁদের হয়তো সাধনায় বিঘ্ন হয়, কি বলো ?

—হ্যাঁ, ঠিকই তুমি বলেছ বৌদি। তোমার কাছে অনেক শেখবার আছে।

—কিছু না ভাই, কিছুই আমি জানিনা।

আরতি শেষ হলে প্রণাম করে লক্ষ্মী বললো,

—গত জন্মে যিনি আমায় উপাসনা শিখিয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন দেবদাসী ; এজন্মে কলকাতায় থাকেন। আজ তাঁর পৃথিবীর দেহ রক্ষার দিন, যাবে ভাই একবার দেখতে ?

—বেশ তো চলো, বলে জলা এগুলো, আবার প্রশ্ন করলো—এ জন্মে কি হয়েছেন তিনি ?

—তাঁর গত জন্মের সংস্কার তাঁকে এজন্মেও পতিতা করেছে। তবে এজন্মেই তিনি শুদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর কর্ম-সংস্কার কেটে গেল বোধ হয়।

—বলো কি বৌদি ? পতিতা হয়েও কর্মসংস্কার কাটালেন ? তিনি তো নমস্যা বৌদি ?

—হাঁা, নমস্যা নিশ্চয়ই ! তিনি নির্লিপ্ত হয়ে মানুষকে দেহ দান করেছেন, আর সে অর্থ নির্লিপ্ত হয়েই মানব-সাধারণের সেবায় ব্যয় করেছেন। দেহ-মনের সব ক্ষুধার, সব আকাঙ্খায় সমাপ্তি হয়ে গেছে তাঁর, অথচ সঞ্চিত আছে বহু জন্মের নিরাসক্ত কর্মফল ; সে ফল তিনি সর্ব্বফলদাতাকে নিবেদন করে বলেছিলেন, 'পুণ্যের বোঝা আমার নাও প্রভু। আমায় দুঃখ দাও, দীন কর, যে দীনতার জ্বালায় তোমার কথাই শুধু মনে পড়বে।' বলেছিলেন,

"যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে ॥"

কে তিনি বৌদি? কে এই মহা সাধিকা?

—এসো না, দেখবে। বলে ওরা কলকাতার কুৎসিং পল্লীর একটা কদর্য্য ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বিছানায় গলিত নারীদেহ একটা, মৃত্যু-কাতর, মলিন। কিন্তু মুখে বলছে—নারায়ণ মধুসূদন, গোপীবল্লভ!

জলা দেখেই চিনলো—মেনকা।

গান করছে মেনকা :—"মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে,
হবে গো এইবার
আমার এই মলিন অহঙ্কার—
দিনের কাজে ধূলো লাগি
অনেক দাগে হলো দাগী,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে, সহ্য করা ভার"......

যন্ত্রণায় "মা বাবা" বলে চীৎকার করবার কথা—সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, শরীরের দু'এক জায়গা পচে গেছে, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, কিন্তু—আহাহা! কি স্বর্গের সুর!

"এখন্ তো কাজ সাঙ্গ হলো দিনের অবসানে,
হোলরে তার আসার সময়, আশা এল প্রাণে;
স্নান করে আয় এবার তবে, প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে গাঁথতে হবে হার,—সময় নাই যে আর।"

জলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। রোগজীর্ণ এই গলিত দেহ পৃথিবীর মানুষরা হয়তো ছুঁতেও ঘৃণা করবে কিন্তু ঐ পিঞ্জরে রয়েছে কী মহা-মহিয়সী নারী! প্রেমভক্তির কি অমৃত উৎসধারা! জলা আস্তে বললো,—

—ইনি অনেক উচ্চস্তরের দেবী, না বৌদি ?

—আমি ঠিক জানিনে ঠাকুঝি, উনি কোন স্তরের, তবে আমার মনে হয় উনি স্বর্গের অপ্সরী, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভার আত্মীয়া। হয়তো কোন কারণে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। গত জন্মে আমার আগে উনিই মারা যান, তাই সে সময় দেখা করতে পারিনি। তুমি ওঁকে চেন নাকি ঠাকুরঝি ?

—হ্যাঁ !—জলা পরম যত্নে মাথাটি তুলে নিল মেনকার, ডাকলো আস্তে,

— মা, শুনতে পাচ্ছ ? ওমা !—কিন্তু মেনকা তখনো পৃথিবীতে। তার পৃথিবীর কাণ সূক্ষ্ম দেহীর কথা শুনতে পাচ্ছেনা। জলা কেঁদে ফেললো, বললো, —ইনি আমায় আত্মহত্যার মহাপাপ থেকে বাঁচিয়েছিলেন ! ইনি স্বর্গের দেবী হোন বা না হোন, আমার মা'র মতন আপন। বৌদি, ওঁকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব—জলা সযত্নে হাতবুলুচ্ছে মেনকার কপালে।

কিন্তু ধারে-পাশের বেশ্যাগুলোর উৎসবদিন আজ ; আজ রবিবার, লোক আসবে সবারই ঘরে, সবাই দুপয়সা আশা করে। চুল বেঁধে, ভালো কাপড় পরে সকলেই প্রায় মাথায় বেল ফুলের মালা জড়িয়েছে, কেউ কেউ আবার হাতেও জড়িয়েছে; সস্তা সিগারেট টানছে দরজায় দাঁড়িয়ে। বাবুদের সঙ্গে দর কষাকষি করছে। যুদ্ধের বাজারে ওদেরও বাড়ীতে ভিড় খুব, দু' আনার জায়গায় দু'টাকা দাম ওদেরও হয়েছে। তাই কেউ মেনকাকে দেখতে আসেনি। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে মেনকার। একবিন্দু জল ওকে না দিলে মরার পর আত্মিক দেহের পিপাসা থেকে যেতে পারে, লক্ষ্মী সেই কথা ভাবছিল। মেনকা মরে গেলে তার শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে' কেউ তো জল দেবে না, আত্মার ঐ তুচ্ছ আকাঙ্খাটুকু থেকে যাবে। লক্ষ্মীরা অস্থির হয়ে উঠলো, কিন্তু কেউ এদিকে আসছেনা।

মৃত্যুর এখনো হয়তো দেরী আছে, জল একটু দেওয়া একান্ত দরকার। পার্থিব জল তুলে মেনকাকে দেবার ওদের সাধ্য নাই, ওরা সূক্ষ্ম দেহী। চেয়ে দেখলো, আশে পাশে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে বিস্তর প্রেত, কেউ গাইছে, কেউ বাজাচ্ছে; কিন্তু বাজাচ্ছে নিজেরই হাড়গুলো, না হয় হাঁটু, আর গাইছে অশ্লীল ঘেউড়। জলা আর লক্ষ্মী বুঝতে পারলো, মেনকার মানব জীবনে এরা সঙ্গী ছিল, এখন

মরে প্রেত হয়ে বান্ধবীকে ডাকতে এসেছে। কিন্তু এই দেবীকে ঐ প্রেতগুলোর বান্ধবী ভেবে জলা অপরাধ করলো না তো? তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করলো জলা। বাইরে চেয়ে দেখলো, মদের গেলাস, বোতল ভাঙা, খাবারের ঠোঙা আর রাজ্যের ময়লার মধ্যে বসে আছে কয়েকটা বেশ্যার বিদেহী আত্মা, হেসে লুটোপাটি খাচ্ছে। আনন্দের কারণ আর কিছু নয়, মেনকাকে কেউ এক ফোঁটা জল দেবার লোকও নেই, এই দেখে। জীবৎকালে মেনকা ওদের মধ্যে সেরা রূপসী নর্ত্তকী, গায়িকা ছিল, তার ঐশ্বর্য্য দেখে হিংসা করতো ওরা, আজ ওর দুর্গতি দেখে হাসছে।

—অনেক তো টাকা ইনি রোজগার করেছেন বৌদি, চাকর-বাকর রাখেননি কেন?

—কারণ, উনি নিজের দেহটাকে কষ্ট দিয়ে, মনকে শুদ্ধ করতে চান, তাই টাকা, বাড়ী, গয়না, কাপড় সব দিয়ে দরিদ্র সেবা করলেন, পুকুর করলেন, নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করলেন, আর বাকি যা ছিল সব এই বেশ্যাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন, অথচ ওরা আজ কেউ দেখতে এলোনা; মানুষ এতই অকৃতজ্ঞ ঠাকুরঝি!

কিন্তু এলো একজন, একটা মোটা কালো মতন মেয়েকে জড়িয়ে টলতে টলতে এসে বললো,—কি বাবা, এখনো মরোনি? তোমার যে দেখছি আকাট পরমায়ু চাঁদ! মরো, মরে ফেলো দেখি এবার!

—আঃ কি করো! ছাড়ো, বলে সেই কালো মেয়েটাই জল দিল মুখে। জলা লোকটাকে দেখেই চিনেছে, লোকটা লোচন। চিনেছে লক্ষ্মীও। হেসে বললো—

—তোমার উনি গো ঠাকুরঝি; দেখছো?

—ছিঃ বৌদি! জলা মৃদু তিরস্কার করলো লক্ষ্মীকে। লোচন কিন্তু টলতে টলতে মেনকার মাথার বালিশটা পা দিয়ে সরিয়ে বললো—কৈ মাণিক, তোমার পোড়াবার খরচটা রেখেছো কোথায়? ক' বোতলের দাম রেখেছো? কৈ?

ওপাশের জানালায় একটা দীর্ঘ ছায়া পড়লো, তারপর সবল অস্থিগঠিত একখানা হাত—প্রচণ্ড এক চড় পড়লো লোচনের গালে।—উঃ হু হু করে চেঁচিয়ে

উঠলো লোচন। সঙ্গের কালো মেয়েটা বললো - হোল কি মুখপোড়া ?

—কে আমাকে মারলে, মাইরী! কে আমাকে চড় মারলো! ও বাবা! ভূত নাকি ?

—তোমার বাবা! খালি ঘরে চড় মারতে আসছে ভূতে! সকাল থেকে মদ গিলছো আর ভূত দেখছো! চল শোবে গিয়ে—হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল মেয়েটা ওকে। লোচন তখনো বলছে—মাইরি বুঁচি, কে যেন……

চড়টা যে মেরেছিল সে এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মেঝেতে। লক্ষ্মীতো তাকে চেনেই, জলাও চেনে; সে তার বাবার সেই বন্ধু হারাণ ভড়। হাড়ের মতন কি এক বস্তুতে গড়া তার দেহ, লম্বা, শক্ত, কুৎসিত চেহারা। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, দাঁত মাত্র দুটি, বাকি সব পড়ে গেছে, বীভৎস দেখতে। বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে ভড়, জলা লক্ষ্মীকে বললো—ঐ শয়তান এঁকে ছোঁবে নাকি বৌদি ?

—পারবেনা। শোবার আগেই উনি বিছানার তলায় গঙ্গামৃত্তিকা, তুলসী-পত্র, দেব নির্মাল্য রেখে শুয়েছেন।

হারাণ ভড় খানিকটা এসে কি যেন ভাবলো, তারপর পিছিয়ে গিয়ে জানালার রড ধরে পাঁচিলের বাইরে পা ঝুলিয়ে বসে রইল। আরো দু'একজন ঠিক তেমনি ভাবে বসে রয়েছে! বিশ্রী একটা গন্ধ ওদের গায়ে। বুড়ো ছাগলের মত গন্ধটা, কিন্তু কষ্ট হলেও জলা আর লক্ষ্মী চলে যেতে পারেনা। ওরা অপেক্ষা করে রইল। প্রেতগুলোর কেউ ওদের সূক্ষ্মতর দেহ দেখতে পাচ্ছেনা। মেনকার মৃত্যুর সময় প্রায় হয়ে আসছে, জনচার ষণ্ডামার্ক বিদেহী আত্মিক এসে পৌঁছুল, হাতে লগুড়, মশাল, দড়ি।—কে ওরা ? যমদূত ?

—না, ওরা শ্মশানের প্রেত। ভয় দেখাচ্ছে মেনকাকে, যাতে শীগ্রি মরে যায়! ওদের তাড়িয়ে দিতে পারবেনা ঠাকুরঝি ?

—কি করে তাড়াবো—বৌদি ?

ঠিক সেই সময় এলেন একজন নারী। নবদূর্ব্বাদলের মতন তাঁর গায়ের রং, আর অঙ্গের সুরভি পদ্মের মতন। বিস্ময়ে দুজনে চেয়ে আছে।

—ওঃ ! তোমরা বসে আছ ? বেশ মা !বলেই উনি সেই শ্মশানের প্রেত দুটোকে বললেন—যা—এখানে তোদের কিছু কাজ নেই।

আশ্চর্য্য ! দরজা জানালায় যে যেখানে ছিল সবাই সরে পালালো, কিন্তু বেশীদূর গেলনা—তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। জলা যোড়হাতে নমস্কার করে শুধুলো—

—আপনি কে মা ? কোন্ লোকের অধিবাসিনী ?

—আমরা অপ্সরা মা,—আমার নাম ঋতম্ভরা, এ আমার মেয়ে। পৃথিবীতে একদিন বেড়াতে এসে একটা নষ্ট চরিত্র মানুষকে ভালবেসে ফেলেছিল, তাই ওর এই দুর্গতি !

—কে সেই মানুষটি মা ?—জলা সাগ্রহে শুধুলো।

—ঐ যে মা তাড়িয়ে দিলাম, ওর এ জন্মের নাম ছিল হারাণ ভড় ! তোমার বাবাকে ঐ এখানে এনেছিল, তোমার বাবা আজও তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন। আর এই হতভাগীর মানুষ-দেহের দুর্গতি দেখ মা, পোকা কিলবিল করছে ! উঃ !

মেনকার নাভিশ্বাস উঠছে ; আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। কিন্তু অত কষ্টের মধ্যেও সে বলছে—নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা, নারায়ণ পরামুক্তি··· ! শেষ হয়ে গেল ওর শেষ নিশ্বাস। দুটি চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল।

—আয় মা কুন্তলা !—ঋতম্ভরা কোমল স্বরে ডাকলেন। কিন্তু মেনকার এখনো আত্মিক দেহ গড়ে উঠেনি, সাড়া দিলনা। অকস্মাৎ এক আশ্চর্য্য গীতধ্বনি শুনতে পেল জলা, সঙ্গে সঙ্গে চারজন দেব পিণ্ডধারিণী পরমা সুন্দরী তন্বী প্রবেশ করলো ঘরে। সমস্ত বাতাস এক অননুভূত সুগন্ধে ভরে উঠলো। চারজনেই এসে মেনকার মাকে প্রণাম করে বললো—আমরা ওকে ডাকি মা, কুন্তলা—ও কুন্তলা !

জ্যোতির্ময় এক সূক্ষ্ম দেহ মৃত দেহের উপর ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে। শায়িত সেই সূক্ষ্ম দেহ ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হোল, তারপর হাসলো,

—উঃ ! কত দিন পর তোরা এলি ?—মেনকা অনুযোগের সুরে বললো।

—চমৎকার বললি ! আমরা কতবার এসে ফিরে গেছি জানিস ? কেমন, পড়বে আর মানুষের প্রেমে ! মিছেমিছি এই দুর্ভোগ ভুগলি !

—আমার অদৃষ্টে মানুষের প্রেম খারাপ হয়েছিল সই, নইলে মানুষের প্রেমই সর্ব শ্রেষ্ঠ, মানুষের প্রেমের মধ্য দিয়ে মহান ঈশ্বরের প্রেম আস্বাদন করা যায়, মানুষী প্রেমই কত সীতা, সাবিত্রী, বেহুলাকে মহাদেবীর পর্যায়ে উন্নীত করেছে, কত রামী রজকিনীকে রাধার অঙ্গে মিলিয়েছে।

—থাক ! আর বচন ঝাড়তে হবে না। এখন চল দেখি।

হাত ধরে ওরা নিয়ে যাচ্ছে মেনকাকে, কিন্তু মেনকাই দেখতে পেল, বললো,

—লক্ষ্মী তুই, ওমা জলা যে, ভাল আছিস ? ওরা দুজনে প্রণাম করে বললো,

—তুমি তো স্বর্লোকে যাচ্ছ মা, আর কি তোমায় দেখতে পাবো না ?

—নিশ্চয় পাবে, তোমরা যেও আমাদের ওখানে বেড়াতে। আচ্ছা, আমিই ওখানে গিয়ে একদিন নিয়ে আসবো তোমাদের।

—তুমি আমায় আত্মহত্যার পাপ থেকে……

—থাক জলা ; তোমার প্রেম-সাধনা পূর্ণ হোক। তোমার বাবার কথা ভেবে বড় কষ্ট হচ্ছে মা, বন্ধুরূপী শত্রুর পাল্লায় পড়ে তাঁর অশেষ দুর্গতি হচ্ছে ! তবে পত্নী তাঁর সতী, তিনি পতিকে শীঘ্র মুক্ত করতে পারবেন।

আশীর্বাদ করে ওঁরা চলে গেলেন। লক্ষ্মী আর জলা এবার কি করবে ভাবছে, ইতিমধ্যে দেখা গেল, সেই প্রেতগুলো এসে মৃত দেহটাকে ঘিরে ফেলেছে ; ঘায়ের পোকা নাড়ছে, রক্ত পুঁজ চাটছে। উঃ ! জলা লক্ষ্মীর হাত ধরে টান দিয়ে বললো—চল বৌদি, পালাই !

একেবারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হোল ওরা। রাত প্রায় দশটা ; মন্দিরের দর্শনার্থীর ভিড় নেই, কিন্তু বাগানে, গঙ্গার ধারে বহু লোকে এখনো বেড়াচ্ছে। কেউ কুমারী কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলছে ; কেউ পরস্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে এসে বাড়ী ফিরতে চাইছে না, কেউ বা বাজারের একটা ধরে এনেছে—মদ মাংসও চলছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র সাধন-ভূমি এই স্থান। আত্মপরায়ণ, বিবেকান্ধ বাঙ্গালীর অধঃপতন দেখে যে করুণাবতার সর্ব ধর্ম সমন্বয় সাধন করে বাঙ্গালীকে যুগোপযোগী ধর্মে দীক্ষা দিয়ে গেলেন, তাঁর সাধনার মৃত্তিকায় এই সব চমৎকার অভিনয় খানিকক্ষণ দেখলো ওরা। লক্ষ্মী

কালো—যুগের চাওয়া ঠাকুরঝি। এসব হবেই। চলো, প্রণাম করিগে।

প্রণাম করে দু'জনে স্বর্লোকে উঠে আসবে, কিন্তু জলার মনটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে গেল, বিমর্ষ কণ্ঠে সে বললো—বড্ড মন খারাপ করছে, বৌদি, চণ্ডীপুরে যাই একবার।

—চণ্ডীপুরে তোমার আর কে আছে ঠাকুর ঝি? বলে হাসলো লক্ষ্মী, কিন্তু তখুনি ভুল বুঝে বললো—হ্যাঁ, তোমার ছোটদা আছে! তা চল, দেখে আসি।

পরমুহূর্ত্তে দু'জনে চণ্ডীপুরের জমিদারবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে নামলো এসে। বাস্তুপুরুষকে প্রথমে খুঁজলো জলা কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। তবে কি তিনি চলে গেছেন? জলার বড় দুঃখ হোল; দু' একবার ডাক দিল, —ঠাকুর, কোথায় তুমি। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা জলা নীচের তলায় যে ঘরে আলো জ্বলছিল সেই ঘরেই গেল। গিয়ে যা দেখলো তাতে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ছোটদা একটি তরুণীর সঙ্গে কথা বলছে। বেশ সুন্দরী মেয়েটি, হাসি হাসি মুখ আর গায়ের রং খুব ফর্সা, হয়তো মেম সাহেব; শাড়ী পরে রয়েছে তাই বাঙ্গালী মেয়ের মতন দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, মেম সাহেবই; খাটো চুল আর পিত্তলের রং চোখ দেখে বুঝতে পারলো জলা। ছোটদা বলছে,

—তোমার জন্য সব ব্যবস্থাই করে দেব! আজকার রাতটা এখানেই থাকো; দাদার খুব অসুখ। আমাকে একবার ঘশিড়ি যেতে হবে কাল, ফিরেই তোমার জন্য আলাদা ঘর তৈরী করে দেওয়া হবে।

—এ কদিন আমি কোথায় থাকবো?—বললো মেয়েটি—তোমার ফিরতে তো দেরী হবে। আমায় নিয়েই চলনা।

—হ্যাঁ, তুমি যদি রাজি থাক তাহলে চলো—দুজনেই যাই কাল। আজকার রাত এখানেই কাটানো যাক—বলে ছোটদা ওকে নিজের কাছে বসালো, ওর থুতনিতে হাত বুলিয়ে আদর করে বললো,

—হ্যাঁ, তবে তোমার মতন রাজার কাছে থাকার পর যেন আবার দোকান খুলতে না হয়। সেইটে দেখো, না হলে সে বড় কষ্টকর হবে আমার পক্ষে।

—নিশ্চয় নিশ্চয়! বলে ছোটদা ওর গালে চুমা দিয়ে বললে—সে দিন কলকাতায় তোমাকে দেখার পর থেকে ঘুমুতে পারিনি! ঈশ্বরের দিব্য, বিশ্বাস করো।

—করছি! বলে মৃদু একটু হাসলো মেয়েটি! বললো—আমার সৌভাগ্য যে তোমার মতন রসজ্ঞ লোক সেদিন নাচ দেখতে গিয়েছিলেন। কাল তোমার কম্‌প্লিমেণ্ট যখন আমার কাছে পৌঁছালো তখন আমি যেন আনন্দে স্বর্গলাভ করছিলুম। দেখছোনা, তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমি একদিনও দেরী করিনি। আবার হাসলো মেয়েটি। সিগারেট ধরালো একটা; ঠোঁট দুটো বেশ গোল মত করে ধোঁয়ার রিং ছাড়লো একখানা। ওর লাল রং ঠোঁটে মদের ফেনার মত উগ্র কামনা। ছোটদা আবেগে অধির হয়ে ওকে বুকের কাছে ধরে বললো—আজ একবার সেই নাচটা দেখাতে হচ্ছে।

—আচ্ছা তোমার আদেশ, কিন্তু একটু হুইস্কি চাই ডারলিং। বলে চাইলে ছোটদার পানে।

হুইস্কি ঢালছে ছোটদা কিন্তু জলা দেখতে পেল, ঐ মেয়েটা বাইরে যতই সুন্দরী দেখাক ভিতরে ওর কুৎসিৎ ব্যাধি। ছোটদা ওর সংস্পর্শে একটা দিন থাকলেই ঐ নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হবে। উপায় কি? জলা ভাবনায় অস্থির হয়ে কার কাছে সাহায্য চাইবে ভাবছে, দেখতে পেল, ছোটদার পিছনে হিঃ হিঃ হিঃ করে হাসছে নিরু। সর্ব্বনাশী প্রতিহিংসা নেবার এই উপায় বার করেছে। জলা বুঝতে পারলো, নিরু তার প্রেত-যোনির সব ক্ষমতা দিয়ে ছোটদাকে প্রেরণা যোগাচ্ছে, ছোটদাকে কামাশক্ত করে দিচ্ছে, ছোটদাকে তার সঙ্গী করবার জন্য চমৎকরে প্ল্যান ঠিক করেছে নিরু। জলা বা লক্ষ্মীকে নিরু দেখতে পাচ্ছেনা ওদের দেহ সূক্ষ্ম দেবপিণ্ড বলে। কিন্তু নিরুর হিংসামূর্ত্তি দেখে জলা আর লক্ষ্মী ভীত হয়ে উঠলো। ওঃ! মৃত্যুর পরেও হিংসা কত ভয়ানক ভাবে জেগে থাকে প্রেতের অন্তরে! জলা করুণ কণ্ঠে বললো—কি করবো বৌদি?

—কিছু করবার নাই ভাই। কিছুই আমরা করতে পারবো না। রক্ষা করতে পারেন ভগবান তোমার ছোট বৌদির মধ্য দিয়ে কিন্তু তিনি নিশ্চয় এতক্ষণ উপপতির সঙ্গে····· জলা বাকি কথা আর না শুনে ছুটলো উপরে। গিয়ে দেখলো, লক্ষ্মী বৌদির কথাই ঠিক, ছোটবৌদি মদনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, তবে ঘুমুচ্ছেনা, গল্প করছে। ওর মনের ভেতর ঢুকে সৎপ্রেরণা দিতে জলার ঘৃণাবোধ হলো ! অথচ তার মা'র পেটের ভাই বিপন্ন ; নিজের ঘৃণাকে সবলে সরিয়ে জলা ছোটবৌদির অন্তরে প্রেরণা সঞ্চালিত করতে লাগলো, কিন্তু বৃথা। অতখানি মোহগ্রস্থ আত্মাকে বিচলিত করার শক্তি তার নেই। বাস্তুপুরুষ থাকলে হয়তো কিছু একটা উপায় করতে পারতেন। কোথায় তিনি ? জলা অশ্রুসজলচোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল, দিদিমার বাড়ীতে তুলসীমঞ্চমূলে বাস্তুপুরুষ বসে রয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে পড়লো জলা।

—এস মা, আমি জানি, তুমি এসেছে। কিন্তু কোন উপায় নেই মা, এ নিয়তি। তোমার ছোটদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। নিরু তার প্রতিহিংসা গ্রহণ করবেই। বহুদিন আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, আজ আর পারলাম না। তাই এখানে পালিয়ে এসেছি।

জলার অন্তর হাহাকার করে কেঁদে উঠলো। মানব-জগতের সে কেউ নয়, অথচ শৈবাল ওর মা'র পেটের ভাই ; ওর ছোটদা। জলা কেঁদে কেঁদে বললো,—

—কিছু উপায় কি নাই প্রভু? আপনি ইচ্ছা করলে কিছু কি করতে পারেন না ?

—না, ওর প্রাক্তন। ওর পুণ্যকর্মের ফলও পেয়েছে। এই জমিদার-বংশে জন্মেছিল, স্বর্গের মত সুখে লালিত হয়েছে, এবার পাপের ফল ভোগ করতেই হবে। যিনি ওকে রক্ষা করতে পারেন, আমি তাঁর দাসানুদাস মা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে গেলাম, সর্ব্বশক্তিময়ী শরণাগত-পালিকা মাতা চণ্ডী ঘুমুচ্ছেন ; জাগলেন না।

—তাহলে দাদার কি হবে প্রভু ? জলা ক্রন্দনাবেগে কম্পিত হচ্ছে।

—হবে যা হ'বার। ওর ভোগশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কুৎসিত ব্যাধিতে ও কুষ্ঠগ্রস্থ হবে, অন্ধ হয়ে যাবে, অথচ বেঁচে থাকবে। ওর অন্ধতা আর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ছোটবৌ ওর পৈত্রিক ভিটাতে লাম্পলীলা চালিয়ে যাবে।

জলা আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু ছোটবৌদির কথা ও জানে, বলল,—সে তো চলছেই প্রভু! আর কতদিন চলবে এই পাপস্রোত ?

—এখনো পূর্ণ হয়নি মা, এই ভিটের উপর মানুষ রূপী প্রেতের নৃত্য হবে। কিন্তু তুমি কাঁদো কেন জলা ? তুমি স্বর্গের দেবী, তোমার দেশে চলে যাও। পৃথিবীর মায়ায় আর নিজেকে বেঁধো না ; নিজেকে জানো, আত্মানং বেত্তি !

লক্ষ্মীও ঐ কথা বলে জলাকে তুলে বললো—চল ঠাকুরঝি, যার যা কর্মফল তা সে পাবে। জোয়ারের সময় হয়ে এল, চল পালাই, নইলে পৃথিবীর আকর্ষণে কোথায় কোনখানে গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে আবার জন্ম নিতে হবে। কাল আবার আসতে হবে মন্ত্র নিতে।

বাস্তুপুরুষকে প্রণাম করে দুজনে ঊর্দ্ধাকাশে উঠে গেল, কিন্তু জলা তখনো চেয়েছিল তার পৈত্রিক ভিটেটার দিকে। দেখতে পেল, ছোটদা ঐ কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্থ নারীদেহখানাকে পারিজাতের মালার মত বুকে জড়িয়েছে, আর নিরু বিকট, বীভৎস অট্টহাসি হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ !

জলা কিছুতেই চোখের জল রুখতে পারলো না।

* * * *

সকালবেলা স্নানাদি করে প্রবাল প্রস্তুত হোল দীক্ষা নেবার জন্য। ওদিকে বড় বৌও স্নান করে ক্ষৌমবস্ত্র পরে পবিত্রমূর্ত্তিতে এসে উপস্থিত হোল ; সেও দীক্ষা নেবে। প্রবাল সক্রোধে বললো,

—তুমি যাও, তোমাকে আর দীক্ষা নিতে হবে না।

—কিন্তু বৎস ! ও এই বংশের বধূ, ওকেও দীক্ষা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। প্রসন্নকণ্ঠে বললেন গুরুদেব।

—ও ভ্রষ্টা, প্রভু, ওকে আমি পরিত্যাগ করেছি।

—তা তুমি পার না বৎস, ও এই বংশের একমাত্র বংশধরের জননী, ওকে ত্যাগ করা যায় না।

—শুধু এই গুণেই ও এই বংশের তালিকায় স্থান পাবে?

—হ্যাঁ! ও যে জননী, জগজ্জননীর অংশ, মা হওয়া থেকে নারীজীবনে আর কিছু বড় নাই বৎস, ঈশ্বরের সুমহান উদ্দেশ্য ওতেই সিদ্ধ হয়। আর ও যার জননী, সে এই বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁকে গর্ভে ঠাঁই দিয়ে ও এই বিশ্ববাসীর নমস্যা হয়েছে।

—কোন পুণ্যে ওর এই ফললাভ প্রভু?—প্রবাল অতিবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

—তা আমি জানিনা বৎস, জগৎকারণের কর্তা যিনি তিনিই বলতে পারেন। তবে ওর পুণ্যবল নিশ্চয় ছিল, নইলে যে পুত্রকে দীক্ষা দেবার জন্য আমার স্বর্গগত পিতা বারংবার স্বপ্নাদেশ দান করেন, সেই পুত্র ওর গর্ভে জন্মাল কেন? এস মা, এস, বসো তুমি। তুমি যাই হও, তুমি প্রণবের জননী, তোমার পাপপুণ্যের বিচারের ভার আমার নয়।

নিজের অধঃপতনের কথা ভেবে নীলিমা কাঁপছিল বেতস পত্রের মত; মুখ তার শুকিয়ে গেছে, বললে,—আমার পাপের কি মার্জনা আছে, প্রভু? প্রণব কি আমায় উদ্ধার করতে পারবে?

—হ্যাঁ মা, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এসো, মন্ত্র গ্রহণ কর।

বৈকুণ্ঠের কোলে বসে প্রণব পূজা দেখছে। গুরুদেব তার পানে চেয়ে হেসে বললেন—তোর গর্ভধারিনীকে দীক্ষা দিচ্ছি প্রণব। তুইও যেন আমার বংশের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিস। তারপর সন্ন্যাসে দীক্ষা যার কাছে ইচ্ছে নিবি।

প্রণব হাসলো, জ্যোতির্ময় সে হাসি; নীলিমা অবাক হয়ে গেল। কোনোদিন সে প্রণবকে এমন করে হাসতে দেখেনি; এ হাসি যেন জীবনের সব পাপ, তাপ, জ্বালা জুড়ানো।

মন্ত্রপাঠ চলতে লাগলো দীর্ঘ সময় ধরে, নানা আচার অনুষ্ঠান যথারীতি

পালিত হোল। প্রণব সমস্ত সময়টা বৈকুণ্ঠের কাছে বসে রয়েছে। দীক্ষা শেষ হলে প্রবাল কোলে নিল ওকে, তারপর বাইরে দীন দুঃখীদের খাওয়াতে আরম্ভ করলো। প্রচুর ভোজ্য দেওয়া হচ্ছে তাদের। তৃপ্তি করে খাচ্ছে সবাই, প্রণব বাবার কোলে বসে দেখছে আর হাসছে। বারান্দা থেকে দেখছে নীলিমাও, একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে এসে নামলো শৈবাল, সঙ্গে একটা বিলিতি মেম।

—এসো ঠাকুরপো, ওটি কে ?

—একাই সব কাজ দেখতে হচ্ছে, বৌদি, ইংরাজী চিঠি পত্তর লিখতে হয়, তাই ওকে সেক্রেটারি রেখেছি।

—ওঃ—নীলিমা ঠোঁটের কোনে হাসলো একটু।

কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু হোলনা দু'ভাইএর। প্রবাল শুধু জানালো যে সে কিছু দিন তীর্থ যাত্রা করবে, শরীর অসুস্থ হলেও তার মন উচাটন হয়েছে। শৈবাল জমিদারী, ঘর সংসার দেখুক, প্রবালকে যেন নিয়মিত টাকাটা পাঠায়।

পর দিনই গুরুদেবের সঙ্গে প্রবাল, নীলিমা, প্রণব, বৈকুণ্ঠ কাশী চলে গেল। আর শৈবাল ঐ বাড়ীতেই মেম সাহেবকে নিয়ে রয়ে গেল কয়েক দিনের জন্য। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট বাড়ীখানা এখন। মেম সাহেবের জন্য শিক্ষিত আরদালী, খানসামা, সব রাখা হয়েছে, মোটর খানাও রং করিয়ে দেওয়া হোল, বাড়ীর মধ্যে মুরগী রাখবার ঘর তৈরী হোল একটা, আর তুলসী গাছটা উপড়ে ফেলে দেওয়া হোল! নীলিমা যেটাকে পূজোর ঘর করে করেছিল সেই মার্বেলের মেঝেওয়ালা ঘরটাতেই মেম সাহেব শোয়। দিন কতক ওখানে থেকে শৈবাল বাড়ী ফিরলো। কিন্তু মেম সাহেব রইলো ওখানেই। শৈবাল হপ্তায় হপ্তায় আসবে, ঠিক হোল।

বাড়ী ফিরে শৈবাল কিন্তু অবাক হয়ে গেল ; তার গায়ে চাকা চাকা দু'একটা দাগ দেখা দিয়েছে, আর সেগুলো চুলকোয়। ডাক্তার এসে বললেন, 'সিকিলিস'। মাথা ঘুরতে লাগলো শৈবালের। একি সর্বনাশ হলো তার! একি ভয়ানক রোগ তাকে চেপে ধরলো! শৈবাল বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু কোথায় যেন কে হাসছে! কে ? কে হাসছে ? ছোট বৌ নন্দিতা না অন্য কেউ ?

—হিঃ হিঃ হিঃ ! আমি নিরু গো ছোট বাবু, চিনতে পারচো ? বীভৎস মূর্ত্তি একটা প্রেতিনী বাইরের বিলাতি আমড়া গাছটায় দোল খাচ্ছে আর হাসছে।

—দেখ, চিনতে পারবে—বলে লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিল প্রেতিনী ; গলায় দগ দগে ঘা, রক্ত পড়ছে, ভয়ে শৈবাল মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

প্রণবের আজ পঞ্চম বার্ষিক জন্ম তিথি। কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরে তাকে নিয়ে গেলেন গুরুদেব। বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত পান করিয়ে দিলেন। হাসছে কিন্তু প্রণব। হাসছে খুব, হাসিটা যেন ব্যঙ্গের। গুরুদেব অবাক হয়ে শুধুলেন, হাসছিস কেন প্রণব ?

—হুঁ, হাতি পা তুতে (১) বলে প্রণব আবার হাসলো। ছেলেটার কথা এখনো ভালো করে ফোটেনি, কেন কে জানে ! গুরুদেব ভাবতে ভাবতে আসছেন, অকস্মাৎ এক গৈরিক বসন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে বললেন, একটু দাঁড়ান, বলে প্রণবকে বেশ করে দেখে বললেন—জড়ভরৎ সেজে আছে কেন প্রণব ? পৃথিবীর শব্দে কি মিথ্যা আছে ?

—ইথ্যা আথে ! প্রণব যেন কথাটার আংশিক প্রতিধ্বনি করলো।

—সে ইচ্ছায় কি ব্রহ্মলাভের পথ রুদ্ধ হয় ?

—লুব্ধ হয়। আবার প্রতিধ্বনি করলো প্রণব (২)

—ব্রহ্ম কি জীবই স্বয়ং ?

—সোহং !

সন্ন্যাসী প্রণবের চিবুকে স্নেহ স্পর্শ দিয়ে বললেন,—জ্ঞানময়, চৈতন্যময় ঋতু, তোমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দেবার জন্য দুশ' বছর বসে আছি, আমার কাছে সন্ন্যাস মন্ত্র নিয়ে আমায় কৃতার্থ করো।

(১) ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যসঃ—যজুর্ব্বেদ।

(২) নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া—কঠোপনিষদ্‌।

গুরুদেব শুধুলেন—প্রণব কি সন্ন্যাস নেবে?

—হ্যাঁ, ও কঠোর অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। প্রবাল আর নীলিমা সঙ্গে ছিল। নীলিমা ব্যাকুল হয়ে বললো,

—খোকা সন্ন্যাস নেবে! সে কি কথা গুরুদেব?

—হ্যাঁ মা, নেবে, তারই জন্য এসেছে ও। গুরুদেব এগিয়ে চললেন, কিন্তু নীলিমার মাতৃপ্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে। প্রবাল সব শুনে হাসলো। ওর আনন্দই হচ্ছে। প্রণব সন্ন্যাস নিলে এই বংশের উর্দ্ধ এবং অধস্তন সাতপুরুষ পরিত্রাণ লাভ করবে, প্রবালের মনে সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আনন্দালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

পরদিনই প্রবাল শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে হরিদ্বার যাত্রা করলো। শরীর ভালো থাকলে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত যাবার তার সঙ্কল্প। নীলিমার নারীপ্রাণ তীর্থের প্রতি লোভাতুর থাকলেও ছেলের সন্ন্যাস নেবার কথায় বড্ড মুষড়ে পড়েছে। তাছাড়া ওর আর একটা ভয় আছে, দৈহিক স্ফীতি ওর দেশভ্রমণে ক্লান্তিকর হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। তবু নীলিমা সঙ্গ ছাড়লো না।

পথে প্রত্যেকটি তীর্থ ওরা দর্শন করলো। দু'চার দিন করে থাকলো। কিন্তু হরিদ্বারে এসে নীলিমা আর এগুতে পারলোনা, ওর শরীর খুবই অসুস্থ বোধ হচ্ছে। প্রবাল বললো,

—বৈকুণ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে তুমি বাড়ী চলে যাও নীলিমা, আমার ফিরতে দেরী হবে।

নীলিমার কান্না পেতে লাগলো। জীবনের সব পাপ-তাপ সে তীর্থস্নান করে ধুয়ে নিতে পারতো, মনের সমস্ত গ্লানি মুক্ত করে সে শ্বশুরের পবিত্র ভিটায় গিয়ে উঠতো পারতো, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে বঞ্চিত করলো। নিরুপায় হয়ে নীলিমা ফিরে এলো; সঙ্গে এলো বৈকুণ্ঠ আর প্রণব। প্রবাল যাত্রা করলো কেদারবদ্রীর পথে।

শ্বশুর বাড়ী ফিরে নীলিমা দেখলো, সংসারটার অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। শৈবাল ভীষণ অসুস্থ, বিছানা থেকে উঠতে পারে না, জমিদারী অবশ্য পুরাণো প্রবীণ নায়েবের হাতে ঠিকই চলছে, কিন্তু অন্দরে ছোটবৌ যাচ্ছেতাই

আরম্ভ করেছে। আজকাল সে প্রকাশ্যভাবেই মদনকে ডেকে পাঠায়, বলে, তার পেটের অসুখ হয়েছে, নাহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা, নাহয় আর কিছু।

নীলিমা একদিন ছোটবৌকে নির্জনে ডেকে বললো, —বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস নন্দিতা।

—ওঃ—তুমি আর ওকথা বলোনা দিদি, হোল ক'মাস তোমার ?

নীলিমা লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল। আর কোন কথা বলা নিরাপদ নয়, তবু নীলিমা বললো, —আমি বুঝেছি যে আমি অন্যায় করেছি। তাই……

—আচ্ছা, আমি যখন বুঝবো তখন উপদেশ ঝেড়ো, বলে চলে গেল ছোটবৌ।

নিশ্বাস ফেলে নীলিমা প্রণবের সেবায় মন দিল। কেঁদে বললো—আমার কোন্ পুণ্যে তুই আমার কোলে এসেছিস প্রণব ? আমার পাপের কথা যেদিন জানবি, সেদিন আমায় ঘৃণা করিস না বাবা ! আমি তোর মা।

—না। ঘিন্‌না নাই নাই—নাই - বলে প্রণব হাসে। হতভাগিনী নীলিমার ঐটুকু সান্ত্বনা। প্রণবকে বুকে চেপে বলে—নাইতো বাবা, ঘৃণা করবি নাতো ? চোখের জল চাপতে পারে না নীলিমা।

— তোকে জান্‌তো পিসি !

—জন্ তৎ ত্বম্ অসি। প্রণব প্রতিধ্বনি করলো (১)

—কি বল্লিরে ? "তত্ত্বমসি", নীলিমা চীৎকার করে উঠলো। প্রবালের সঙ্গে তীর্থ যাত্রায় গিয়ে ওর অনেক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথাও শুনেছে তাঁদের। তাঁদের মধ্যে কারো করো মুখে ও শুনেছে ঐ তত্ত্বমসি কথাটা। কথাটির অর্থ খুবই জটিল, তবু নীলিমার মনে আছে, একজন বলেছিলেন, "যেমন ঘটাকাশ আর মহাকাশ শব্দে একই আকাশের ছোটত্ব আর বড়ত্ব বোঝায়, তেমনি এক অদ্বিতীয় মহাতত্ত্ব "মায়া" উপাধিযোগে 'তৎ'পদ অর্থাৎ ঈশ্বর আর অবিদ্যাযোগে ত্বং অর্থাৎ জীব বোঝায়। ঈশ্বর আর জীবের ভিন্নতা শুধু বড় আর ছোট নাম। ঈশ্বরের সমর্থতা আর জীবের

(১) বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দিনমিবধাবসি,—অষ্টাবক্র।

অসমর্থতা মাত্র 'মায়া' আর অবিদ্যা নাম ভেদে হয়ে থাকে। এই নাম ভেদ ছেড়ে দিলে 'অসি' পদ দ্বারা তৎ আর ত্বং পদ দ্বারা একত্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সিদ্ধি হয়। ভাগত্যাগ লক্ষণ দ্বারা (অবিদ্যা আর মায়া) জীব আর ঈশ্বরের উপাধি ত্যাগ করলে স্বয়ং প্রকাশরূপ নিজ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়—এই অদ্বৈতবাদ।"

তাহলে প্রণব কি বলতে চাইছে যে জীবে আর ঈশ্বরে ভেদ নাই ; জীবে জীবে ভেদ নাই, সবই এক অখণ্ড ব্রহ্ম, শুধু উপাধি ভেদ ? মনে পড়লো সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা—"তত্ত্বমসি"– তৎ (ব্রহ্ম) ত্বং (তুমি, জীব) অসি (হও) – তুমিই ব্রহ্ম। প্রণব তাহলে নীলিমাকে নিশ্চয় উদ্ধার করবে, নীলিমার দেহের অংশ নিয়েও যে পৃথিবীতে এসেছে, নীলিমাই প্রণব, প্রণবই নীলিমা। নিমজ্জমান মানুষের খড় কুটো ধরার মতন নীলিমা প্রণবের ক্ষুদ্র শিশুদেহ দুহাতে বেষ্টন করে ধরলো, —বাবা ! কিন্তু প্রণব খড় কুটো নয়, বিশাল অর্ণবপোত সে, নীলিমার শ্লোক মনে পড়লো,—দ্বৈতাদ্বৈত্য বিকল্পজাল কলহাতীতায় শুদ্ধাত্মনে।

জাগ্রৎ স্বানুভব প্রকাশমহসে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

দ্বৈত ও অদ্বৈত সংশয়ের অতীত, আপন অনুভবে সদা জাগ্রত জ্যোতিস্বরূপ হে শুদ্ধাত্মা, তোমায় নমস্কার !

পৃথিবী থেকে মন্ত্র গ্রহণ এবং গুরুদেবকে দর্শন করে সেদিন ফিরে জলা আর লক্ষ্মী স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে জলার বাড়ীতেই উঠেছিল। দু'জনে ওদের খুবই ভাব হয়ে গেছে ; দু'জনেরই ভোগ বিতৃষ্ণ মন, তাই দু'জনেরই উচ্চস্তরে যাবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেউই যেতে চায়না। বেশ সখীর মত এক বাড়ীতে থাকে, এক ঘাটে স্নান করে, এক সঙ্গে পূজা করে। জলার পূজা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। লক্ষ্মীর অন্তর প্রেম-ভক্তিতে বিনম্র কিন্তু জলার শুদ্ধা ভক্তি.; সে ভক্তি লক্ষ্মী এখনো লাভ করতে পারেনি। ওর স্বামীর উপর প্রগাঢ় আকর্ষণ ওকে জাগতিক প্রেম থেকে উঁচু স্তরে উঠতে দিচ্ছেনা ; তাই ওর ভক্তি এখনো বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু জলা

চায় সমীরের মঙ্গল। সমীরের উপর তার প্রেম অহেতুকী, সে প্রেম বৈধা নয়। জলার অন্তর থেকে ধীরে ধীরে সমীরের উপর আকর্ষণ শুদ্ধা প্রেমে রূপান্তরিত হচ্ছে; আকর্ষণটা অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পরিণত হচ্ছে। পেতে আর সে কিছু চায় না সমীরের কাছে, দেবার মত তার নাইও কিছু, তাই শুধু চায় সমীরের কল্যাণ, সমীরের আত্মার উন্নতি, তার উর্দ্ধগতি লাভের যোগ্যতা। নিঃস্বার্থ ভাবেই চায়, কারণ সমীরের কাছ থেকে কিছু তার পাবার আছে বলে মনে হয় না। মনে হয়, যাকে পেলে সবই পাওয়া হয়ে যায় সেই শ্রীভগবানের মধ্যেই সমীরও আছে, তাঁকে পেলে সমীরকেও পাওয়া হবে। সমীরের মধ্যে তিনি যেমন আছেন, সমীরও ঠিক তেমনি তাঁর মধ্যে রয়েছে, তাই তিনিই একমাত্র চাইবার বস্তু।

এই আশ্চর্য্য অনুভূতিটা ওর এসেছে একটি অদ্ভুৎ ব্যাপার থেকে। তুচ্ছ একটা ঘটনা কিন্তু তার ফল ওর জীবনে সুদূর প্রসারী হোল। সেদিন যখন মেনকার জ্যোতির্ময় আত্মিক দেহটাকে তার মা উর্দ্ধ লোকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই জলা দেখেছিল, মেনকা স্নিগ্ধ সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়েছিল অতি কদর্য্য একটি প্রেতের পানে, সে প্রেত হারাণ ভড়, মেনকার মহাশত্রু কিন্তু মেনকার সেদিনের দৃষ্টিতে কী যে অপার প্রেম-করুণা-দয়া-শ্রদ্ধা-সান্ত্বনার মহাসাগর দুলতে দেখেছিল জলা, তার আর তুলনা মেলেনা। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। তার কয়েক দিন পরেই মেনকা একদিন এলো জলা আর লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে। গেল দু'জনেই। অতি উর্দ্ধে সে অপ্সরোলোকে; প্রবাল, মণি, মাণিক্য, মরকত, পদ্মরাগের তেজঃ সত্ত্বা দিয়ে তৈরী সেখানকার প্রাসাদ, উদ্যান, বাপী-তড়াগ। অধিবাসীদের জ্যোতির্ময় দেহ সূক্ষ্মতর দেবপিণ্ডে গঠিত, সে দেহ-জ্যোতি কারো স্বচ্ছতম শিশির বিন্দুর আভা, কারোবা নবীন দূর্বাদলের স্নিগ্ধতা, কারোবা অতসী কাঞ্চন পুষ্পের লাবণ্য বিকিরণ করছে। সেই অপূর্ব্বদৃষ্ট অপ্সরোলোকে জলা আর লক্ষ্মী এসে পৌঁছালো যখন তখন তাদের শ্বাস রোধ হবার উপক্রম হয়েছে। এত উর্দ্ধলোকে তারা কখনো আসেনি। অথচ স্বর্গের এটা মাত্র পঞ্চম স্তর। এখানকার সম্রাট ইন্দ্র আর অধিবাসীরা সব দেবতা পদ লব্ধ মহাপুণ্যবান আত্মিক। সৌর জগতের সমগ্র গ্রহ উপগ্রহের অধিবাসীরাই কর্মানুযায়ী এখানে আসতে পারেন। রাজ

প্রাসাদ বজ্র (১) বিদ্যুত (২) ইত্যাদি জ্যোতি পদার্থে নির্মিত। অসংখ্য আয়ুধধারী দেবতা অবিশ্রাম সেখানে শাস্ত্রশিক্ষা করছেন। জলা আর লক্ষ্মী কিন্তু কথা বলতে পারছেনা। বড় কষ্ট হচ্ছে ওদের। এখানকার উপযুক্ত সূক্ষ্ম দেহ ওদের হয় নাই। মেনকা ওদের দিকে চেয়ে দেখেই হাসলো একটু, তারপর বললো,

—চলো মা, আমার পূজামন্দিরে চলো আগে - নিয়ে এলো মন্দিরেই। ওরা দেখলো, হিরণ্যগর্ভ ক্ষুদ্র মন্দিরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী ভগবান বিষ্ণুর ক্ষুদ্রতম মূর্ত্তি একটি, যেন অতি ক্ষুদ্র একটি নীলাভ দীপশিখা, সে শিখায় শুধু মন্দির-টুকু আলোকিত হয়। মেনকা বললো—

—ঐ অনন্ত জ্যোতির্ময়, এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারার জ্যোতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরি-চালয়িত্রী মহা প্রকৃতির শক্তি, বিশ্ববিলোপকারী মহাশিবের ধ্বংসশূল। উনিই সত্ব, রজ, তম, উনিই ত্রিগুণ, উনিই গুণাতীত "ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

মেনকার কথা শেষ হবার পূর্বেই জলা দেখতে পেল, সেই ক্ষুদ্র জ্যোতিশিখা অনন্ত অনন্ত বিস্তারিত কারণ-সমুদ্রের অনুপরমাণুতে জ্যোতি বিস্তার করছে, গ্রহতারা সমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত, তাঁরই কম্পনে স্পন্দিত বা ঝঙ্কৃত; বিরাট বিশাল অনন্ত মহাকাশব্যাপী সেই জ্যোতি, আবার ক্ষুদ্রাদাপি ক্ষুদ্র অণুতে পরমাণুত, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, লঘিষ্ঠ থেকে গরিয়ানে ওতপ্রোতভাবে আশ্লিষ্ট। বিস্ময়ের এই পরমমুহূর্ত্তে জলা দেখলো কলালক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। এত উচ্চস্তরে আসার জন্য হয়তো ওর শরীর মন অবসন্ন ছিল, তারপর বিশ্বভুবনালোকিত এই দিব্য জ্যোতি লক্ষ্মী সইতে পারলো না। জলা কিছু বলবার পূর্বেই মনকা বললো—

—ওর জন্য ভাবনা নাই; মূর্চ্ছা ভাঙলে এই দিব্যদর্শন ওর স্বপ্ন মনে হবে। তুমি দেখো মা জলা, এই বিরাট পুরুষই সব। এঁকে পেলেই সবকে পাওয়া যায়। ইনি সব কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। এই জ্ঞান লাভ হলেই জীবন্মুক্তি হয়। কিন্তু

---

(১) হীরক সত্বা (২) স্বর্ণ-রজত-পারদাদির তেজঃ সত্বা।

জ্ঞানের সাধনা বড় কঠিন মা, বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে, তাই ভক্তিমার্গই আমাদের গ্রহণযোগ্য। তিনিই সব কিছু করছেন, এই ধারণা নিয়ে সবকর্মফল তাঁকেই সমর্পণ করে যে উপাসনা, তারই নাম ভক্তি। ঋষিরা বলেছেন মা, "উদ্যতং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্" ॥ জগতে প্রকাশ করবার জন্য সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যকে ধরে আছে। তেমনি জ্ঞান ভক্তির রশ্মি ধরে জ্ঞানভক্তির প্রকাশক আনন্দজ্যোতিস্বরূপ শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়।

জলা নির্বাক হয়ে শুনছিল। ওর চেতনার গভীর অভ্যন্তরে একটি সুনিবিড় অনুভাব জেগে উঠতে লাগলো—এইতো পরম পুরুষ, এঁর মধ্যেই সব আছে, পিতা-মাতা-ভ্রাতা; স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা, প্রভু ভৃত্য, শত্রু মিত্র, জ্ঞান অজ্ঞান, আলো অন্ধকার সকলই এতে প্রকাশমান, আবার এতেই বিলীন। এঁকে পেলেই সব পাওয়া হয়ে যায়। আর এঁকে পাওয়া হয়েই আছে, শুধু জেনে নেওয়ার দরকার যে এঁর মধ্যে আমিও আছি এবং ইনি আমাতেও আছেন। প্রত্যূষের আলোকের পানে তাকিয়ে থাকলে ক্ষণিক পরেই যেমন সূর্য্যদেবকে দেখা যায়, তেমনি এঁর করুণা-রশ্মিধারা ধরে অপেক্ষা করলেই ইনিও প্রকাশমান হবেন।

মন্দিরের বিরাট পুরুষ বিশ্বজ্যোতি সম্বরণ করছেন। মেনকা হেসে বললো, —তুমি খুবই উচ্চস্তরের সাধিকা মা জলা, বেশি কিছু তোমায় বলবার দরকার নেই। দেবগুরু বৃহস্পতি তোমার মন্ত্রগুরু, চন্দ্রদেব তোমার প্রেমভক্তির প্রেরক, তুমি শ্রীভগবানের স্নেহের গোপিনী।

জলা প্রণাম করলো, তারপর আস্তে উঠে দাঁড়ালো; চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো শ্রীমূর্ত্তির পানে, সমীরণ যেন দাঁড়িয়ে, না, ঠিক যেন গুরুদেব, দূর! ওযে প্রণব আমার! কিন্তু না, যার কথা মনে করছে জলা উনি সেই মূর্ত্তিতেই প্রকট হচ্ছেন, আশ্চর্য্য! তবে উনি স্বয়ং কে? তন্মুহূর্ত্তেই জলার মনে হোল, সমগ্র চরাচর পরিব্যাপ্ত করে এক অখণ্ড কারণ-মহাসমুদ্র, অন্তহীন ক্ষীরোদার্ণব, তার মধ্যে বটপত্রশায়ী উনিই মহাবিষ্ণু, সুপ্ত, সস্মিত, নিরাকার, আকারবিশিষ্ট, সগুণ অথচ গুণাতীত! উনিই সর্বব্যাপ্ত মহাশূন্য। আর কিছু

নাই, কোথাও কিছু নাই আর. শূন্য, মহাশূন্য, মহাব্যোম ওঁরই শ্বাসস্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে। জড় প্রকৃতির ধর্মই স্পন্দিত হওয়া, কিন্তু সে স্পন্দনের মূল কারণ উনিই। উনিই অয়স্কান্তমণির মত কর্ত্তা, অথচ কর্ত্তৃত্বহীনরূপে অধিষ্ঠিত।

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ (১) জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী সগুণ ব্রহ্ম উনিই, যা কিছু সৃষ্টির উনিই নিমিত্ত কারণ; উনিই "একোঽহম বহুস্যাম প্রজায়য়ে", উনি এক থেকে বহু হয়েছেন। অনন্ত মহাসমুদ্ররূপিণী মহাপ্রকৃতিতে উনিই অনন্ত তরঙ্গ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিলসিত হচ্ছেন, প্রতি তরঙ্গে সূর্য্যের মত অনন্ত জীবাত্মারূপে প্রতিভাসিত হচ্ছেন, এই জন্যই গীতায় বলেছেন "স্বভাবোঽধ্যাত্ম উচ্যতে"।

মেনকা বললো,—বুঝতে পারছো তো মা, প্রবাহরূপে এই অধ্যাত্ম সৃষ্টি সমষ্টিগতভাবে অনাদি অনন্ত, এর শেষ নাই, লয় নাই, কিন্তু সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গ যেমন ভাঙে, তেমনি ব্যষ্টিগতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী অধিদৈব সৃষ্টি আর পিণ্ডরূপী অধিভূত সৃষ্টি সাদি এবং সান্ত।* একটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হতে পারে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তারপরও থাকবে, যেমন এই শরীর নষ্ট হতে পারে, অনন্ত শরীর-তরঙ্গের বিনাশ নাই, একটি মানুষ মরতে পারে কিন্তু অনন্ত মানব-স্রোতের শেষ নাই ঠিক তেমনি (২) অনন্ত সৃষ্টির মূলে পরমাত্মা নিমিত্ত কারণ মাত্র।

—উনি নিজে কি? জলা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলো।

—উনি সৎ, চিৎ আর অনন্দময়, এই ভাবময় অদ্বৈত সত্ত্বাই নির্গুণ ব্রহ্ম; কিন্তু মজা কি জানো মা, এই তিনটি ভাব পৃথক ভাবে ধরলে সগুণ অবস্থার উদ্ভব হয়, কারণ সৎ সত্তা আর চিৎ সত্তা অস্তি আর ভাতি ভাবে অনুভব করা যায় কিন্তু আনন্দ সত্তা এই সৎ চিৎ এর আশ্রয় না নিয়ে অনুভূত হয় না। এই

(১) কপিল সাংখ্যদর্শন।   * জন্মাদ্যস্য যত :—
(২) মীমাংসাদর্শন   জগদ্বাচিত্বাৎ
(৩) মুণ্ডক শ্রুতি   তস্মাৎ ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতিসিদ্ধম। বেদান্তদর্শন।

আনন্দ সত্বাটি বিকাশের জন্যই নির্গুণ ব্রহ্মে সৃষ্টির আবির্ভাব ; জগৎ তাই তাঁর আনন্দের সৃষ্টি। আনন্দ লাভের জন্যই জীবের তাই যা-কিছু প্রচেষ্টা। কিন্তু আনন্দ আবার দু'রকমের মা, বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ, এদের ২টি মার্গ, প্রবৃত্তি মার্গ আর নিবৃত্তি মার্গ। জীব তাই আনন্দ লাভের জন্য এত ব্যাকুল কিন্তু প্রবৃত্তি মার্গে বা নিবৃত্তি মার্গে যাবে, ঠিক করতে পারে না।

—এই বিপুল সৃষ্টির কার্তাকে ধারণা করা আমাদের সাধ্যাতীত—জলা বললো।

—সে বিরাট সৃষ্টি রহস্য এত সহজে বোঝা যায় না মা, তাই মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

বাক্য, মেধা বা শাস্ত্র চর্চ্চায় ওঁকে পাওয়া যায় না মা, ভক্ত হৃদয়েই উনি প্রকট হোন। তিনি নির্গুণ অবস্থায় ব্রহ্ম আবার সগুণ অবস্থায় ঈশ্বর,—ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর, শিব, কালী, দুর্গা, অনন্ত কোটি নাম উপাধিধারী ঈশ্বর তিনিই।

—তিনিই সব, সবেতেই তিনি! জলা বললো।

—হ্যাঁ মা, সবেতেই তিনি, তিনি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। রক্ষা কর্তা বিষ্ণু আবার প্রলয় কর্তা রুদ্র। তাঁর ইচ্ছাতেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সংখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র জ্যোতিতমসার গর্ভ থেকে সম্ভূত হয়েছে, কালের অনন্ত তরঙ্গে লীলা-বিলসিত হচ্ছে। আবার যথাকালে অনন্ত জ্যোতিতমসায় বিলীন হয়ে যাবে। তিলি নিয়ামক, তাই জড় প্রকৃতির মধ্যে এতো শৃঙ্খলা। মহা প্রকৃতি জড়, তাই সেই মহা চৈতন্যের অধিষ্ঠানে এবং স্পন্দনে স্পন্দিত, ছন্দিত, মন্দ্রিত হচ্ছেন। অথচ তাঁর কোন ইচ্ছা নাই। কারণ তিনি মায়ায় বশ নন, মায়ার চালক, মায়ী * চুম্বকের কাছে লৌহপত্র যেমন স্পন্দিত হয়, তার জন্য চুম্বক নিমিত্ত কারণ মাত্র, এখানে তিনিও তাই। ইচ্ছা রহিত তাই অকর্তা। কিন্তু অধিষ্ঠান করেন তাই তিনি কর্তা।

* মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

জলা এত বড় বড় কথা বুঝতে পারছিল না কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনার জন্য তার সঞ্চিত প্রাক্তন ফলে তার একটা মোটামুটি ধারণা হোল ঈশ্বর সম্বন্ধে। আর তাঁকে ভালো করে জেনে শুদ্ধা ভক্তি লাভের জন্য অন্তর তার অতি মাত্রায় পিপাসিত হয়ে উঠলো। জলা ভূমিলগ্ন হয়ে নমস্কার করলো—

বায়ুর্যমোঽগ্নি বরুণঃ শশাঙ্কঃ—প্রজাপতি-স্ত্বং-প্রপিতামহশ্চ।

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥"

মেনকার মা এই সময় এসে বললেন,

—ওদের কিছু খেতে দিবি না কুন্তলা! সেই কখন এনে মন্দিরে ভরেছিস!

—হ্যাঁ মা যাই, এসো জলা, এসো লক্ষ্মী, ওঠো, বললো কুন্তলা। ওর এখানকার নাম কুন্তলা। হ্যাঁ, কুন্তলা সত্যই কুন্তল শালিনী; সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ আলুলায়িত, যেন জ্যোতিতমসা! যেন সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা সমন্বিত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ওর কালো চুলের মহাসাগরে প্রতিবিম্বিত হতে পারে।

লক্ষ্মী এতক্ষণ মূর্চ্ছিত হয়েছিল, উঠে বসে বললো,—আহা, কি সুন্দর স্বপ্ন!

—কি স্বপ্ন বৌদি? জলা হেসে শুধুলো।

—দেখলাম কি জানো ঠাকুরঝি, তোমার দাদা যেন শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম-ধারী বিষ্ণু। তারপর মুরলী ধারী শ্রীকৃষ্ণ, আবার তোমার দাদা, আমার স্বামী, প্রণবের বাবা।

—তুই তো রাধা হয়েছিলি তখন?—জলা হাসছে।

—হ্যাঁ সত্যি। আহা! আমার গা'টা এখনো আনন্দে শিউরে উঠছে ঠাকুঝি। কি যে সুন্দর দেখলাম, বৃন্দাবন, যমুনাকূল, গোপীরা, ধেনুদল; আর তোমার দাদা আর আমি যেন অনন্ত কাল ধরে ছিলাম, আছি, থাকবো, অনন্ত কালের সেই লীলা কখনো শেষ হবে না। ভারী সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম ঠাকুরঝি।

—ভাগ্যবতী তুই বৌদি! তোর স্বামীপ্রেম মহাভাবরূপা শ্রীরাধার প্রেমে পরিণত হোক।

কুন্তলার প্রাসাদে সেদিন ওখানকার অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন। স্বয়ং

দেবরাজ ইন্দ্রও এসেছেন। বিরাট উৎসব সভা। এখনকার লোক সবাই সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করেন। কিন্তু জলা দেখলো, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করতে পারেন এমন অনেক নিবৃত্তি পরায়ণ চতুর্থ লোকের মহাপুরুষও এখানে এসেছেন। তাঁদের একজন জলার কাছে এসে সস্নেহে বললেন,—আমি তোমার পূর্ব্ব পুরুষ মা। আশীর্ব্বাদ নাও। জলা তাঁর চরণ বন্দনা করে বললো—আপনি কোন লোকের অধিবাসী পিতঃ ?

—আমি ষষ্ঠলোকে থাকি মা। আমি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপর আধিপত্য করতে পেরেছি, ভোগ সুখে নিরাসক্ত থাকতে পারি। যাঁরা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের উপরও আধিপত্য করতে সক্ষম, তাঁরা ষষ্ঠ ঊর্দ্ধলোকে যেতে পারেন। কিন্তু যে সব মহাযোগী নিজের প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে পারেন তাঁরা সপ্তম ঊর্দ্ধলোকে, সত্য লোকে বাস করেন। ২) সেখানে গেলে আর ফিরতে হয় না মা, সেখানে উপলব্ধ সত্য মহাসত্যের সঙ্গে মিলে যায়। ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। কিম্বা সাধকের ইচ্ছামত উপাস্যদেবতার উপাসনা করে তিনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত আনন্দে থাকতে পরেন। মহাপ্রলয়ের দিন তাঁর উপাস্যের সঙ্গে অনন্ত-কারণ-শায়ী মহাবিষ্ণুর অঙ্গে লীন হয়ে যান। ভক্ত আর ভগবান সেখানে এক মা, সে-লোক দেব-লোকেরও উপাস্য।

জলা ওঁর কাছে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্য, অশেষ বৈচিত্র আর অনন্তমেয় বিশালতার কথা কিছু শুনলো। উনি স্নেহের সঙ্গে বললেন। তোমায় একদিন এই ব্রহ্মাণ্ডের সবটা আর অন্য ব্রহ্মাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ দেখিয়ে আনবো মা, আর একটু শক্তি সঞ্চয় করো তুমি।

স্বর্গের নৃত্যগীত উৎসবের দিকে জলার নজর ছিল না। মনও তার টানতে পারছেনা এই রজোগুণান্বিত উৎসব। ওর শুধু মনে হচ্ছে, একি ছাই একটা উৎসব! কী বা এই অমৃতের আস্বাদ! যিনি আনন্দের আনন্দত্ব, অমৃতের অমৃতত্ব, তাঁর কথা শুনেই কত আনন্দ, কত অমৃত পাওয়া যায়। তাঁর নামেতেই

(২) বেদব্যাস প্রণীত যোগসূত্র ভাষ্য, দেবী ভাগবৎ, বিষ্ণুভাগবৎ।

কি বিপুল হর্ষ জেগে উঠে, তার তুলনায় তুচ্ছ এই উৎসব। "নাম-পরতাপেযার ঐছন করিল নরিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

কিন্তু লক্ষ্মীয় খুব ভাল লাগছে, বললো—শুনছো ঠাকুর ঝি? চমৎকার! জলা উত্তর দিলনা, বুঝলো, বৌদির ভোগের স্পৃহা মেটেনি; যেতে হবে আবার সংসার করতে, স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করতে, তবে কর্ম ক্ষয় হবে। হোক! বৌদি আবার মাটির ধরণীতে ফিরে যাক, দাদা দিন কতক সুখের সংসার করে নিক।

কিন্তু জলার মনে পড়লো, দাদার ঔরসে জন-পাবন পুত্র প্রণব জন্মেছে, তবে কেন দাদা আবার পৃথিবীতে ফিরে যাবে? উচ্চতর লোকের সেই পিতৃ-পুরুষের জ্যোতির্ময় আত্মা তখনো উপস্থিত রয়েছেন; জলা তাঁকে শুধুবে কিনা ভাবছে কিন্তু পঞ্চম ষষ্ঠ লোকের অধিবাসীরা দেবত্ব অর্জন করেছেনা পিতৃপুরুষ জানতে পারলেন ওর মনের কথা।

—তোমার দাদার বৌ এবং আর আর সবাই জ্ঞান লাভ করবে মা, ওদের অজ্ঞানতার মোহ কেটে যাবে, অন্তর মালিন্য মুক্ত হবে, সেখানে ঈশ্বর-প্রেম জাগ্রত হবে।

—স্বর্গে এসে আবার কি পৃথিবীতে যেতে হবে তাঁদের?

—সে কথা তো আমি বলতে পারি না. মা। স্বর্গভোগ না করে তারা আরো উর্দ্ধলোকে চলে যেতে পারে কিম্বা পৃথিবীতেও যেতে পারে ফিরে। কিন্তু তাতে ক্ষতি তো কিছু নাই। পৃথিবী কর্মভূমি, সাধনভূমি। সপ্তলোকের শ্রেষ্ঠলোক ঐ পৃথিবী, কারণ পৃথিবীর কর্মফল দিয়েই সাত উর্দ্ধলোক আর সাত অধঃলোক গড়া এই চতুর্দ্দশ ভুবন পৃথিবীর কর্মফলে জাত; ইন্দ্র বায়ু বরুণ আদি অধিদেবতারা এবং লোকপালগণ এই সব ভুবন শাসন করেন আপন আপন কর্মফলেই। ঐ পৃথিবীর কর্মফলেই তাঁরা ইন্দ্রত্ব বা চন্দ্রত্ব অর্জন করেছেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কত শত ইন্দ্র চন্দ্র আছেন, কত শিব, কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু কত কালী কত দুর্গা রয়েছেন, তাঁরা সকলেই সেখানকার কর্মভূমির ফলে সৃষ্ট অধিদেবতা।

—তাঁদের শেষ পরিণাম কি তাত? জলা প্রশ্ন করলো।

—ইন্দ্র, বসু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য আদি দেবতাগণ নিজ নিজ কর্মের যোগ্যতা

দেখাতে পারলে কিম্বা তপস্যাদ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর মহেশ্বর পদ পান। গুণানুসারে এই ত্রিমূর্ত্তির যে-কোন একটি পদ লাভ করলে এঁরা তখন আর দেবতা থাকেন না, সগুণ ব্রহ্মপদে অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। গুণানুসারে সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অধিনায়ক হয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালে স্ব স্বরূপে বিলীন হয়ে যান, এইজন্য ঐ ত্রিমূর্ত্তিকে জীব বলা হয় না; ওঁরা সগুণ ব্রহ্ম। আর যে গতি দ্বারা দেবতারা এই পদ লাভ করেন, তাকে ঐশী গতি বলে।* পরে ওঁরা পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান।

—দেবতা তাহলে কাদের বলে পিতা ?

—এই সূক্ষ্মলোকবাসী জীবদের দেবতা বলা হয়, কারণ এঁদের দৈবী শক্তি অসাধারণ। তিনটি ভাগ এঁদের, পিতৃগণ, ঋষিগণ আর দেবগণ। ঋষি, দেবতা আর পিতৃগণ যথাক্রমে জ্ঞানরাজ্য, কর্মরাজ্য আর স্থূল রাজ্যের সঞ্চালক; আমাদের যে মৃত্যুলোক পৃথিবী, সেটি এই তিন শ্রেণীর দেবতা দ্বারা পরিচালিত। দেবতাদেরও রাজা আছেন, এবং নরক, প্রেতলোকাদিরও রাজা আছেন। পিতৃলোকে পিতৃনামধারী দেবতারা সাত ঊর্দ্ধলোকে থাকেন: অসুররাও দেবপিণ্ড, তাঁরা থাকেন সাত অধঃলোকে, কিন্তু ঋষিগণ চতুর্দ্দশ-ভুবনের সর্বত্র থাকতে পারেন। তাঁরা জ্ঞানের সঞ্চালক। তাই তাঁদের সর্বত্র অবাধ গতি।

জলা কিছুক্ষণ ভেবে বুঝে নিতে চাইল ওঁর কথাগুলি, তারপর বললো,
—মানুষও তাহলে দেবপর্য্যায়ে উঠতে পারে পিতা! মানুষ ঈশ্বরত্ব পেতে পারে ?

—হ্যাঁ মা, নিশ্চয় পারে। সর্বত্র ঈশ্বর, সবই ঈশ্বর, মানুষ কেন পারবে না মা ? মানুষও তো ঈশ্বর স্বয়ং, শুধু আকারে আর উপাধিতে ছোট। নিজকে জান মা, সব জানতে পারবে।

কুন্তলাদের বাড়ীর অতবড় উৎসবটা মাঠে মারা গেল জলার কাছে। ও

---

* ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমলীয়ন্তে—ঋকবেদ।

কিছুই তার উপভোগ করতে পারলো না, কিন্তু ওর পরম ভাগ্য যে ওর একজন দেবতাপদ প্রাপ্ত ষষ্ঠলোকের পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি আবার কথা দিয়েছেন, ওকে একদিন এই ব্রহ্মাণ্ড এবং আরো অনেক ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনবেন। ফিরে এসে জলা প্রতিদিন ভাবে, আজ হয়তো তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি আসেননা। জলা বুঝতে পারে, তার শক্তি এখনো যথেষ্ট হয় নাই! তাই তিনি আসেননা। নিজের ইচ্ছাকে সংযত করে জলা উপাসনা করে; মনকে সর্বভোগ থেকে বিরত করে ভাবে, তোমার বিশ্ব দেখবার সুযোগ আমায় দাও প্রভু।

ঊর্দ্ধলোকের সেই উৎসব-সভা থেকে ফেরার পরে জলার অন্তর আরো বেশী পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এখন যেন সে ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করতে পারে, এমনকি, মনকেও যথেষ্ট বশে এনেছে জলা। সেদিন ঊর্দ্ধলোকের পিতৃরূপী দেবতা বলেছিলেন—'ইন্দ্রিয়ের আর মনের উপর প্রভুত্ব করতে পারলে পঞ্চম লোকে যেতে পারবে, আর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপর প্রভুত্ব করতে পারলে ষষ্ঠ লোকে যাওয়া যায়, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে পারলে তবে সপ্তম লোকে যেতে পারা যাবে, তবে চিজ্জড় গ্রন্থি খুলে যাবে, জীব শিব হতে পারবে। ওঃ—কত দেরী, কত শত সহস্র জন্ম দেরী! জলা প্রাণ মনে প্রার্থনা করে, সে যেন যেতে পারে, সে যেন চিজ্জড় গ্রন্থি থেকে মুক্ত হতে পারে, হোক সেদিন শত সহস্র যুগ পরেও।

লক্ষ্মী বললো—শুনছো ঠাকুরঝি, তোমার দাদা একা তীর্থ যাবার পথে একটা চটিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; বড্ড কষ্ট হচ্ছে তাঁর, আমি যাই ভাই—দেখি গিয়ে!

—কেন?—বৌদি, প্রণব, বৈকুণ্ঠ—ওরা সব কোথায়?

—ওরা দেশে ফিরে গেছে, সেদিন বললাম না তোমায়, বড্ড আমার মন খারাপ করছে ঠাকুরঝি।

—বেশতো, যাও তুমি, যাও দাদার কাছে; কোথায় রয়েছে দাদা?

—কেদার-বদরীর পথে একটা ছোট্ট চটিতে; কাছে কেউ আত্মীয় নেই।

বলেই লক্ষ্মী তৈরী হয়ে বেরুলো প্রবালকে দেখতে যাবার জন্য। জলা একলাটি বসে রইল। অলকানন্দার অঙ্গে গিয়ে মিশেছে ওর বাড়ীর পাশের ছোট নদীটি। জলার মনে হচ্ছিল, প্রতিটি জীবন-নদী ঠিক এমনি, এককালে মহাসাগরে গিয়ে মিলিয়ে যাবে; তখন সে হবে মহাসাগর, 'নদী' উপাধি তার আর থাকবেনা। জলাও একদিন অনন্ত পরমব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে, জলা উপাধি লুপ্ত হয়ে যাবে তার। সবাই এমনি করে লুপ্ত হয়ে যাবে এক দিন, মা বাবা, বাড়ীর আর সব, দাদা, বৌদি, প্রণব, সমীর। হ্যাঁ, সমীরও মিলিয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে বিশ্ব-মহাপ্রাণের মহাসাগরে তারও প্রাণ-সত্ত্বা। তখন সমীর আর জলার কোন পৃথক সত্ত্বা থাকবেনা, সমীর জলা হয়ে যাবে, আর জলাও সমীর হয়ে যাবে—সব একাকার হবে।

কিন্তু সমীর এখন আছে কেমন? অনেকদিন তার খবর নেয়নি জলা। সেই রেল গাড়ীতে ওকে সিলোনের পথে যেতে দেখেছে, তারপর আর খোঁজ নিতে পারে নি। কারণ এখানে ওকে কতকগুলো আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হচ্ছে আরো আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য। সেগুলি না করতে পারলে পৃথিবীতে যাতায়াত করা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়। যে-কোন সময় ও পৃথিবীর আকর্ষণে আবার মাতৃগর্ভে জন্মে যেতে পারে। জলার পৃথিবীতে সাতটা, চন্দ্রে দু'টা, আর বৃহস্পতিতে তিনটে জন্ম কাটাবার কথা মনে পড়ে। বৃহস্পতি গ্রহের ঐ তিন বারের জন্ম ওর পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়েছিল। কারণ সমীরনকে ও মোটে দেখতে পায়নি, বার বার খুঁজে ফিরেছে; সমীরন তখনো স্বর্গেই ছিল, কিম্বা আরো কোথাও, জানতো না জলা। বৃহস্পতিতে জীব আবার বহুদিন দেহ ধারণ করে; শ' তিনেক বছর দেহ ধারণ তো সেখানে অতি সাধারণ কথা। ধৌতি, নেতি, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে দেহ শুদ্ধি করলে সেখানে তিন হাজার বছর বাঁচা কিছুই বেশী কথা নয়। মানুষের পৃথিবীর বৎসর গণনায় জলার বৃহস্পতি গ্রহে কেটেছে প্রায় বারশো বছর, অথচ সমীরকে সে ওখানে দেখতেও পায়নি।

তবে বৃহস্পতিতে সুবিধে এই হয়েছিল যে অত দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে জলা ওখানকার মুনি ঋষিদের কাছে পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জ্জন করেছিল কিছু।

আর ঈশ্বরের উপাসনা করে সমীরের সাক্ষাৎ প্রর্থনা করেছিল। পৃথিবীতে গিয়ে সাত জন্মের মধ্যে মাত্র শেষের চারটা জন্মে সমীরের সঙ্গে ওর দেখা হয়। কিন্তু কোন বারই মিলন হোলনা। তারপর পৃথিবী থেকে এসে চন্দ্রে জন্মগ্রহণ, সেটা অবশ্য বেশি কিছু নয়, শুধু রূপ পরিবর্তন। চন্দ্রের বছরগুলো খুব তাড়া-তাড়ি কাটে, আর জলাকে সেখানে মাত্র কয়েকটা দিন থাকতে হয়েছিল।

লক্ষ্মী বৌদি হয়তো এতক্ষণ দাদার কাছে পৌঁছে গেছে চটিতে। ওর সঙ্গে গেলেই ভাল হতো। কিন্তু সেও তো সমীরকে একবার গিয়ে দেখে আসতে পারে। জলার মনটা অকস্মাৎ খুবই উচাটন হয়ে উঠলো সমীরের জন্য। নিজেকে প্রস্তুত করলো, সমীরকে দেখতে যাবে, পৃথিবীর দিকে নামতে লাগলো।

রাত্রির আকাশ, পৃথিবীতে এখন কত রাত, কে জানে? জলা তার সূক্ষ্মতর দেহকে ইচ্ছাশক্তিবলে নীচের দিকে নামাতে লাগলো। তার গতি এখন বায়ুর গতি অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে, কত অশরীরি আলোকের আত্মা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে যাতায়াত করছেন। তাঁদের গতি আলোকের। আরো তীব্র গতি বিশিষ্ট একটি নীলাভ জ্যোতিঃ দেখতে পেল জলা। অত্যুগ্র তাঁর গতি, মহাকাশের কারণ-সাগর সে গতিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে, তরঙ্গিত হচ্ছে তাঁর পশ্চাতের সাগর। কে উনি? জলা স্বর্গ আর পৃথিবীর সংযোগ-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে গেল। নীলাভ জ্যোতি যেন বেগ সম্বরণ করলেন, মনে হলো জলার। তাহলে কি উনি জলার সঙ্গে কথা বলবেন? জলা করযোড়ে অপেক্ষা করছে, মুহূর্ত্তের সহস্রাংশ সময়ের মধ্যে উনি এসে দাঁড়ালেন জলার কাছে। অদৃষ্টপূর্ব তাঁর অঙ্গজ্যোতি। কয়েকদিন পূর্বে এমন জ্যোতি দেখলে জলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তো। কিন্তু সেদিন মেনকার বাড়ীতে বিশ্বরূপ দর্শন আর ষষ্ঠ লোকের সেই পিতৃপুরুষের দর্শনের পর থেকে ওর শক্তি অনেকটা বেড়ে গেছে। জ্যোতির্ময় নীল দেবতা মৃদু হেসে বললেন,—আমায় কিছু বলছো মা তুমি?

—হাঁ, প্রভু সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু জলা আর কিছু বলতে ভয় করছে! উনিই হেসে বললেন,—তুমি মর্ত্তলোকে ছিলে, অল্পদিন এসেছো, জানতে চাইছ আমি কে? আমি তোমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের কেউ নই মা, আমার আবাস এখান থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পারে রূপব্রহ্মাণ্ড। সে এখান থেকে বহু বহু আলোক-বর্ষের পথ, অর্থাৎ তোমাদের এক মুহূর্ত্তে যদি এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে যাওয়া যায় তাহলে আমার বাড়ী পৌছতে লাগবে দেড় কোটি বৎসর। আমার আকাশগতিতে যেতে লাগে তিন দিব্য মুহূর্ত্ত।

—উঃ—সে কতদূর দেশ প্রভু?

—সে আর কি এমন দূর মা? ওর পরে কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পার হ'য়ে 'স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড' রয়েছে, তারপর 'অপরূপ' তারপর 'অরূপ', তারপর 'রূপাতীত',—ব্রহ্মাণ্ডের কি শেষ আছে মা? কোটি কোটি আলোকবর্ষ ধরে যাত্রা করলেও কোনোকালে তা প্রদক্ষিণ করা সম্ভব নয়। তোমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা সূর্য্য, কিন্তু এটা বোধ হয় সব থেকে ছোট ব্রহ্মাণ্ড, তাই এখানে জীব সল্পায়ু।

—প্রভু এখানে কোথায় এসেছেন? জলা সাহস পেয়ে প্রশ্ন করলো।

—তোমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ধ্রুববিন্দুকে যে নক্ষত্রগুলি প্রদক্ষিণ করেন, তাঁদের মধ্যে একটিতে আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁর নাম "উজ্জ্বল নীলমণি", যাচ্ছি তাঁরই কাছে।

বলে উনি প্রসন্ন হাসলেন। আবার বললেন,—তুমি নারী, শক্তির অংশ, তাই তোমায় জানাচ্ছি মা, নীলমণির একমাত্র পুত্র আয়ুষ্মানের সঙ্গে আমার কন্যা অচিরার বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছি, যাত্রা আমার শুভ হোক মা লক্ষ্মী!

—ঈশ্বর মঙ্গলময়! বলে জলা মাথায় হাত ঠেকালো। তারপর ছেলেমানুষের মত বললো—সে বিয়েতে আমরা বাসর জাগাতে পারবোনা দেব? আমার বড্ড ইচ্ছা করছে ওখানে যেতে।

—এখনতো যেতে পারবেনা মা তুমি! বলেই উনি একটু যেন কি ভাবলেন, পরে বললেন,—তুমি শক্তির অংশ, অংশের মধ্যেও পূর্ণ বিদ্যমান থাকে মা, এই

বিশ্বপ্রকৃতির স্পন্দনশক্তি তোমার মধ্যেও রয়েছে তেমনি পূর্ণভাবে, তবে অনুশীলিত হয়নি। আচ্ছা মা, আমি ফেরার পথে তোমায় নিয়ে যাব আমার নিজের লোকে, আসি এখন।

জলা প্রণাম করলো। পরমুহূর্ত্তেই দেখলো, বিরাট মহাকাশে উনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আশীর্বাণী তখনো ঝঙ্কৃত হচ্ছে, "আত্মানং বেত্তি", উত্তিষ্ঠত জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরাণ নিবোধতঃ। ওঁর উদ্দেশে আর একবার প্রণাম নিবেদন করে জলা পৃথিবীর পথে আসতে লাগলো। বায়ুভুক নিরালম্ব কত জীব, উগ্র তপস্যারত কত আত্মিক, কদর্য্য দর্শন কত প্রেত ওর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। জলা ধীরে এসে দাঁড়ালো—ভারত মহাসাগরের আকাশে। সিংহল দ্বীপ দেখা যাচ্ছে; অদূরে কন্যাকুমারী মহাতীর্থ। গৌরী এখানে শিবারাধনা করেছিলেন। আজো তাঁর স্বর্ণময়ী কুমারীমূর্ত্তি লক্ষ কোটি সতীর উপাসনায় নন্দিত হয়। বালু বেলায় তাঁর পরিত্যক্ত তণ্ডুলকণায় এখনো রয়েছে সেই ইতিহাস-লিপি। জলা বারবার প্রণাম করলো।

—দুম্ দুড়ুড়্ দুম্—বিরাট আওয়াজ, শোঁ শোঁ শব্দ, সাইরেণ, উঃ—কী ভয়ানক যুদ্ধই না চলছে ওখানে! জাপানের ওদিকটায়, ব্রহ্মদেশে. আকিয়াবে, আরাকানে। জলা দেখতে লাগলো মৃত্যু-দেবতার তাণ্ডব নৃত্য। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা যেন হারিয়ে গেছে প্রকৃতিতে। সমুদ্রের কল্লোলকে তুচ্ছ করে হাজার মারণাস্ত্রের মহারাব কর্ণকে বধির করে দিচ্ছে। বীর সৈনিক দল এগিয়ে যাচ্ছে, মৃত্যুকে বরণ করছে যেন পুষ্পমাল্য পরছে বিবাহ আসরে। অদ্ভুৎ, আশ্চর্য্য এই বীরদের আত্মিক দেহ। মূহূর্ত্তের মধ্যে তারা জ্যোতিদেহ গ্রহণ করে পরমানন্দে উর্দ্ধে চলে যাচ্ছেন, উর্দ্ধতর লোকে যাচ্ছেন, যেন মৃত্যুর ফটফটা পার হয়েই তাঁরা মুক্ত হয়ে গেলেন। বীরের মৃত্যু এইজন্য শ্লাঘ্য বলা হয়েছে। আবার দেখতে পেলো, জলা, দু'একজন অতি ভয়ে যুদ্ধ করছে, মরতে তাদের বড় ভয় কিন্তু মরছে। তাদের আত্মিক দেহ লাভ হতে বড় দেরী হচ্ছে, এমন কি ঠিক আত্মহত্যাকারীর মত তারা অনেকে মূর্চ্ছিত হয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রেত লোকের বেশি উচ্চগতি হচ্ছেনা। এরা কাপুরুষ—জলা বুঝতে পারলো।

—রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সমীরন ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ নিশ্চয়। জলা ধীরে ধীরে নেমে এল পৃথিবীতে—সমীরনের অস্থায়ী আবাসের ভেতরে। ঘুমুচ্ছে সমীর, কিন্তু ওকি? মাথার কাছের জানালার ওপাশ থেকে দুখানা শক্ত হাড়ের হাত, হাতের রোঁয়াগুলো ফণীমনসার কাঁটার মত, এগিয়ে এসে সমীরের বুকখানা চেপে ধরলো। দু'হাত দিয়ে যেন পিষে ফেলবে সমীরের বুকখানা। সমীর একটু নড়ে উঠলো, তারপর চীৎকার করে উঠলো, উঃ উঃ উঃ—মা......

মেরেই ফেলবে নাকি সমীরকে! জলা ব্যাকুল হয়ে ওদিকের প্রেতটাকে তাড়াতে গেল, কিন্তু সে গ্রাহ্যমাত্র করলোনা। জলা বুঝলো, প্রেতটা শক্তিমান। ওকে তাড়ানো সহজ নয়। সমীর শুধু কাতর স্বরে উ—উ করছে। জলা তার অন্তরে নিজের মনকে প্রবেশ করিয়ে বললো "শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে, সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে"। স্তোত্রের ঝঙ্কার সমীরের মনেও সঞ্চারিত হোল,—সঙ্গে সঙ্গে প্রেতটা সমীরকে ছেড়ে দিয়ে ওপাশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। সমীর জেগে উঠেছে। বসলো বিছানায়, উঃ—কী ভয়ানক স্বপ্ন—বললো সমীর। উঠে জল খাচ্ছে। নিজেকে প্রেত-লোকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ্য করে জলা ওপাশে গিয়ে দেখলো, প্রেতটাকে যেন চেনা মনে হচ্ছে। কে এ? প্রেতটাও উঠে দাঁড়ালো, উরে বাপ! উঃ! বলে পালিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ জলাকে দেখতে পেয়ে বললো,

—নমস্কার! ভাল আছেন মিস্ জলা?

জলা এবার চিনতে পারলো ওকে—ওনীল! বিস্মিত হয়ে বললো,—

—ব্যাপার কি কবি? তুমি এখানে কেন? সমীরের উপর তোমার কিসের আক্রোশ?

—কিসের? জানো মিস জলা, সিঙাপুরের সেই ডাক্তার মরেছে, আর হেলেন এখানে এসে এই ছোঁড়াটাকে আবার পাকড়াও করেছে। ওকে আমি খুন করবো।

—কাকে? হেলেনকে না সমীরকে?

—দুজনকেই, জান, আমার জাজ্‌মেণ্ট্‌ বেরিয়ে গেছে চন্দ্র লোকের। এখানে আসতে হোল।

—বেশতো, কিন্তু ওদের মারতে চাও কেন?

—কারণ,—এসো ঐ রবার গাছটায় বসিগে। তুমি চলে আসার পর আমাকে তো খুব দিনকতক "সারমন" শোনালো ওরা চন্দ্রলোকে। হুঁ! শুনতে আমার দায় পড়েছে। তারপর বললো—যাও, পৃথিবীতে জন্মাওগে।

—কোথায় জন্মাতে হবে?

—কে জানে সে কোন নরক কুণ্ড! চণ্ডীপুর গাঁয়ের শৈবাল ঠাকুরের বিয়ে করা বৌএর গর্ভে,—অফ্‌কোর্স ইল্‌লেজিটিমেট চাইল্ড, মানে, তোমাদের বাংলায় কি?

—জারজ। বলেই জলা চমকে উঠলো, কিন্তু বাকিটাও ওর শোনা দরকার।

—হ্যাঁ, জারজ ছেলে হয়ে নাকি জন্মাতে হবে, ভয়ঙ্কর বদমাইস লোক হব। টাকা পয়সা হরদম উড়োবো, সত্যিকার বাবাকে জেলে ভরবো, আর ঐ শৈবালকে না খেতে দিয়ে মারবো, মা'কে বার করে দেব বাড়ী থেকে, বুঝলে—?

—হুঁ, কিন্তু সমীর কি করলো তোমার ক্ষতি?

—হেলেন ওকে ভাল বেসেছে; ছোঁড়াটা দেখতে খুব সুন্দর আছে, দেখছোনা! আর ডাক্তার হয়েছে। আমি শালাও এবার ডাক্তার হব, মাইরি বলছি। হেলেনকে এই ছোঁড়া যেন কিছুতেই ছুঁতে না পারে; তাই ওকে আগে খুন করবো। তারপর হেলেনকেও মারবো, এজন্মে হেলেনকে পাব আমি, জানো? ও গিয়ে জন্মাবে কলকাতায় একটা বিধবা নার্সের মেয়ে হয়ে, অফ্‌কোর্স ইল্‌লেজিটিমেট।

—আর সমীর?

—চুলোয় যাক! ওকে নিয়ে আমার আর কোন দরকার নাই। ওকে খুন করেই ছেড়ে দেব আমি, তারপর আমি গিয়ে জন্মাব; হেলেন দিনকতক প্রেত হবে।

—বেশ, কিন্তু সমীরকে খুন করে তোমার লাভ কি হবে ওনীল ? অনর্থক আবার একটা পাপ করে আবার কত জন্ম কষ্ট পাবে ! এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর ওনীল, বুঝলে ?

ওনীল কি যেন ভাবতে লাগলো। ভাবছে জলাও। তার পৈত্রিক ভিটেতে ওনীল তারই ছোটদার পুত্র হয়ে, না, ছোটদার কেউই সে হবেনা, তার পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে শুধু জন্মাবে। তারপর ছোটদাকে না খেতে দিয়ে মারবে। ছোট বৌদিকে বার করে দেবে। আর ডাক্তার মদনকে জেলে দেবে। উঃ -ভাবতে শিউরে উঠছে জলা, কিন্তু এ নিয়তি, একে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নাই। জলা তবু বললো,—পৃথিবীতে গিয়ে অনেক পাপ তো তোমায় করতে হবেই ওনীল। প্রেতলোকে থেকে আর পাপ করো না ; সমীরকে হত্যা করে কেন আর পাপ বাড়াবে ?

—কিন্তু সমীর না মরলে ও হারামজাদী মরবে না, জানো, সমীরকে ও ভালোবাসে। ওকে শাস্তি দেব ই আমি।

তাহলে সমীরও নিশ্চয় হেলেনকে ভালোবাসে। বাসুক, জলা ওনীলকে বললো—বাইবেল পড়েছো তো—But I say unto yon which hear, Love your enemies, do good to them which hate you." * কাউকে বাঁচিয়ে রাখবার বা মেরে ফেলবার অধিকার ধর্মরাজ যমের। তুমি কেন নিমিত্ত হতে যাচ্ছ ওনীল, ওতে তোমার পাপের বোঝা ভারি হবে।

—হোক, পাপকে আমি ভয় করিনে। ঐ শয়তানীর জন্য শয়তান হবো আমি। বড়-লোকের বাড়ীতে জন্মে আমি ওকে টাকার লোভ দেখিয়ে বের করে আনবো। ওর গর্ভের সন্তানকে ওকে দিয়ে হত্যা কারবো, ওকে জীর্ণযৌবনা করে পথের ধূলোয় ফেলে দেব লাথি মেরে। ও বুঝবে, আমার সঙ্গে চালাকি করার ফলটা কেমন! না জলা দেবী! সমীরকে হত্যা না করলে আমার চলবে না।

---

* St. Luke VI—27

—কিন্তু যদি না করতে পার ? আমি সমীরকে রক্ষা করবো, দেখো।

—তুমি ? কেন ? সমীর তোমার কে ? ওঃ বুঝেছি। তা সে কথাটা আগে বললেই তো হোত যে সমীরকে তুমি ভালবাস। যাক্, তোমার খাতিরে আমি না হয় ছেড়েই দিলাম সমীরকে এজন্মে। কিন্তু ও মরবেই। আর দিন সাতেক দেরী আছে মাত্র। তারপর যেখানে যাবে, সেখানে গিয়ে আবার ঐ হেলেনের পাল্লায় পড়বে। তখন কি হবে ?

—তার একটা উপায় আমি করবো কিছু,—বলে জলা উঠলো। ওর মন বড্ড বেশী খারাপ হয়ে গেছে সব কথা শুনে। সমীরের সঙ্গে ওর দেখা করতেই হবে একবার। উঠে ওনীলের কাছে বিদায় নিয়ে সমীরের ঘরে এসে দেখলো, সে ডিউটিতে যাচ্ছে। জলাও পিছনে চললো। সমীর হাঁসপাতালে আসতেই একটি তরুণী হেসে ওকে অভিবাদন জানালো। জলা বুঝতে পারলো, এই হেলেন। কথাবার্ত্তা ওদের বন্ধুত্বের পর্য্যায় প্রায় ছাড়িয়ে উঠেছে এখন প্রেমিকের পর্য্যায়ে। কথা বলছে হেলেন, কিন্তু সমীর একটু সাবধান। এ সাবধানতা বাংলা দেশের ছেলের মানসিক ভীরুতা ছাড়া আর কিছু নয়। অন্তরে সমীর বেশ তীব্র ভাবেই কামনা করছে হেলেনের সংসর্গ। জলা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। সমীর কি শেষে এতটা অধঃপাতে নেবে যাবে ? বড় কষ্ট হতে লাগলো ওর মনে। সমীরকে রক্ষা করবার কি কোন উপায় নাই ?

—বড় দেরী করলে সমী ! হেলেন বললো। জলাও সমীরকে 'সমী' বলতো, মনে পড়ছে।

—ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। যা একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম, উঃ ! ভূতের স্বপ্ন !

—কাওয়ার্ড ! ভূত কি ? ভূত আবার আছে নাকি কোথাও ? ননসেন্স্। এসো, চা খাও।

—আছে, ভূত আছে, মানে অতীত আছে, ভূত মানে অতীত, আর অতীতে আমি একটী মেয়েকে ভাল বাসতাম্। সেও এসেছিল সেই ভূতটার সঙ্গে।

—বাজে, ! কবে কোন একটা মেয়েকে ভালবাসতে, সে কথা আজ আমায় নাই বা শোনাতে সমী ? জানো, মেয়েদের মনে এতে বড় কষ্ট হয়। ভুলে দাও তার কথা।

—না, তুমিই মনে করিয়ে দাও ঐ 'সমী' নামটা বলে। ও ডাকতো ঐ নামে।

—ইজ্ ইট্ ? আমি তোমার নাম বদলে দিলাম এখুনি। কারো এঁটো নামে আমি তোমায় ডাকতে চাই না, আমার ডাকা হবে আমারই রাখা নামে। আচ্ছা, তোমার নাম রইল 'মীর'—'স' টাকে বাদ দিলাম আমি।

সমীর হাসলো একটু, কিছু জবাব দিলনা। সমীর বড্ড বেশী অবনত হয়ে গেছে। হেলেন সমীরের একটা বাহু জড়িয়ে ঠিক লতার মত ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগলো। ওপাশের হল ঘরে গেল। বসালো সমীরকে, তারপর বললো,—শাট্ ইয়োর আইজ, চোখ বোঁজো তোমার।

—কেন ? বলেও সমীর চোখ বুঁজলো। হেলেন তার কপালে একটা চুমো খেয়ে বললো,—বিকজ্, ঘুম ভাঙার পর তোমাকে বড্ড লাভলি দেখাচ্ছে, লোভ সামলাতে পারলাম না।

বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো জলার সারা অন্তর। তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অতিমানবীয় শক্তি, স্বর্গের সূক্ষ্ম চিন্তা ধারা—সবই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। কোথাকার একটা পতিতা নার্স সমীরে মুখে চুমা খায় ? ওঃ ! কিন্তু জলার এটা কি ঈর্ষা ? না, জলা অনুভব করতে চাইলো, ঈর্ষা তার কেন হবে ? সমীর, জলা, এবং ঐ হেলেন তো এক পরমাত্মারই অংশ, কিন্তু মন কি ছাই বোঝে ? অথচ জলা আজই সকালে ভেবেছিল, সে মনের উপরও কর্তৃত্ব করতে পারছে। অত সোজা নয়। জলার অহঙ্কার বিচূর্ণিত হয়ে গেল। কেঁদে সরে গেল জলা। চলে গেল বহুদূরে একটা বুদ্ধ মন্দিরে। ভগবান তথাগতের পবিত্র মূর্ত্তি আসীন, জলা চেয়ে রইল সেই দিকে। আহা কী সুন্দর !

"নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি !
দৃষ্টি হ'তে শান্তি ঝরে ঝরিছে অধরোপরে
করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি"।

কী অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তি! কী জ্যোতির্ময় ওই দুটি প্রশান্ত চোখের দৃষ্টি। জলা অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ঐ রাজবংশধর একদিন পথে বেরিয়েছিলেন মহাভিনিষ্ক্রমনে। পৃথিবীর পাপী-তাপীর জন্য নির্বাণ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। আজও তিনি সেই পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। "কামনা বাসনা বর্জন কর, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ পরিত্যাগ কর,:দয়া, ক্ষমা, শৌচ, দান, সত্য আচরণ অভ্যাস কর। হে মর্ত্ত মানব, তুমি নির্বাণের অধিকারী হবে"। বুদ্ধের এই বাণী।

আজ জলা কিনা দাঁড়িয়ে দেখতে পারলোনা হেলেনের কাণ্ডটা! উঃ! ঈর্ষায় যেন বুক ফেটে যাচ্ছিল ওর। অথচ সে দেবলোকের অধিবাসী। এতক্ষণে লজ্জা করতে লাগলো জলার। হেলেন সমীরকে ভালবাসে, বাসুক না, ক্ষতি কি তাতে? বিশ্বের অধিদেবতাকে অণু-পরমাণুও ভাল বাসে। তার জন্য অণুতে অণুতে ঈর্ষার তো কারণ ঘটে না। কিন্তু এর মধ্যেও কথা আছে, জলা ভাবতেই লাগল, বিশ্বের অধিদেবতা সকলের ভালবাসা নিতে এবং সকলে ভাল বাসতে সমর্থ; তিনি বিরাট, সমীর ক্ষুদ্র ঘটাকাশ মাত্র, তার অন্তরে সকলের স্থান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সমীর তো তাঁরই অংশ, তাকেং তো ঘট ভেঙে মহাকাশে মিলিয়ে বিরাট করে নেওয়া যায়! তখন জলা, হেলেন এবং আরো হাজার মেয়েকে সে ভালোবাসতে পারবে, যেমন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার গোপীকে সমান ভাবে ভালবেসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাই তো মরজগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ঘটাকাশকে মহাকাশ হতে হবে, সমীরকে অনন্ত সমীরে, অনন্ত সমীরণে, অনন্ত কারন সমুদ্রে-মিলিয়ে দিতে হবে, জলা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে করবে সেই সাধনা।

জলা আবার ফিরে গেল সমীরের কাছে। দেখলো, রাত্রি শেষের শীতল হাওয়ায় ক্লান্ত সমীর ঘুমিয়ে গেছে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে। হেলেনও ঘুমুচ্ছে ওর কাছেই। জলা কথা বলতে চাইল সমীরের সঙ্গে। তার শক্তিশালী ইচ্ছা সমীরের মানুষীদেহ থেকে জীবাত্মাকে বার করে আনলো আধ মিনিটের মধ্যেই। জলা দেখলো, সমীর অত্যন্ত মলিন, নিম্ন শ্রেণীর এক আত্মিক দেহ লাভ করেছে

এঞ্জিনের বাষ্পের মত তার অঙ্গ, চোখের জ্যোতিও তেমন উজ্জ্বল নয়। জলা বুঝলো, সমীর কয়েক ধাপ নেমে এসেছে। আর সামান্য নামলেই তার আত্মিক দেহ ভৌতিক কৃষ্ণ ধূমের মত দেখাবে। মানে, এঞ্জিনের চিমনি থেকে যে কুণ্ডলাকৃতি ধূম বার হয়, তার মতই হয়ে যাবে। দুঃখ খুবই হচ্ছে জলার। তবু ধৈর্য্য ধরে প্রশ্ন করলো—চিনতে পার সমীর ? দেখ।

—হ্যাঁ উজ্জ্বলা। কতক্ষণ এলে ? উঃ ! তোমার গায়ে কি আগুনের মত পোষাক উজ্জ্বলা ! চাইতে পারছিনা আমি, তুমি কি আগুনের কাপড় পর নাকি এখন ?

—হ্যাঁ—পরি। তুমি কিন্তু নর্দমার পর্দার পোষাক পরেছো। ছিঃ—সমীর, তুমি এত নীচে ?

—কেন ? মানুষ হয়ে জন্মেছি, মানুষের রাজ্যের ভোগ সুখ তো ভোগ করতে হবে জলা !

—ভোগে পূর্ণ তৃপ্তি হয় না—সমী, ভোগের মধ্যে ত্যাগ শিক্ষার জন্যই ভোগ দরকার। তোমার দেহগত ভোগ তোমার বাসনা বাড়িয়ে দেবে মাত্র। সমী, দেহটা অপবিত্র করোনা। এ দিয়ে যতটুকু বিষয় তুমি ভোগ করবে তার সংস্কার তোমার চিদাকাশে কত জন্মধরে সঞ্চিত থেকে যাবে। আর ঘুরে ঘুরে তোমায় জন্মাতে হবে। আবার এই দেহতেই তুমি সংস্কারকে উচ্চ গামী করে বিষয়-বিরক্ত করে উর্দ্ধ জগতের অনেক ভাল ভোগ পাবে সমী, সাবধান হও।

সমীর যেন বুঝতেই পারছেনা তার কথা। জলা সখেদে বললো—

—সমী, আমি কতটা জন্ম তোমার লেগে ঘুরছি ; তুমি বারবার বিপথে যাচ্ছ। মানুষী-দেহের এই তুচ্ছ ভোগ কি তোমার কাছে এতই বড় হোল ? কুৎসিৎ একটা নারীর মোহ তুমি জয় করতে পারছো না ?

—না, পারছিনা, আমায় সাহায্য কর উজ্জ্বলা।

—পালিয়ে যাও এখান থেকে, সকালেই পালিয়ে যাও,। যাবে ?

—যাব, জলা···

জলা তখনকার মত ছেড়েদিল সমীয়ের আত্মাকে !

*   *   *   *

রাত্রি শেষ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো সমীর। চারিদিকে চাইলো। কোথায় উজ্জ্বলা? এটাতো সিংহলের একটা মাঠের মধ্যে অস্থায়ী হাঁসপাতাল। কিন্তু স্বপ্নের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সমীর। উজ্জ্বলার আত্মিকরূপী মূর্ত্তি ওর চোখে যেন এখনো ভাসছে। উজ্জ্বলা তার অধঃপতন দেখে খুব বেশি ক্ষুন্ন হয়েছে, তাই অমন আগুনের মত রূপ ধরে তার কাছে এসেছিল! সত্যি তো। সমীরতো অনেক খানিই নেমে গেছে। অন্ত্যজ সংসর্গ ঘটেছে তার, ম্লেচ্ছদের খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে সে তার দেহকে তো অশুদ্ধ করেছেই, মনকেও পবিত্র রাখতে পারেনি। এই সমীরই একদিন উজ্জ্বলাকে দেখবে বলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল! ধিক! সমীর যেন চাবুক মারলো নিজকে। যেমন করে হোক নিজকে ও সম্বরণ করবে, সংশোধন করবে। উঃ—দেহের মায়া কি ভয়ঙ্কর! দেহের মোহ কি বিপজ্জনক! পৃথিবীর কামনার কত বেশী তীব্র স্রোত! প্রবৃত্তির গতিরপথে যে-কোন বাধা বাধাই নয়! সমীর প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশজাত পুত্র। যুগ যুগান্ত সঞ্চিত সংস্কার-সংস্কৃতিতে তার দেহ, রক্ত, মাংস, মজ্জা, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বিবেক। ঈশ্বরকে স্বীকার না করলেও বংশধারার প্রভাবকে তো বৈজ্ঞানিক সমীর অস্বীকার করতে পারেনা। সমীর নেমে গেছে, নেমে গেছে বহু নীচে।

—এই, কতক্ষণ জেগেছো? ও বেঞ্চি থেকে বললো হেলেন। চোখে সুপ্তির মদিরা তার।

—মিনিট পাঁচ! বলে সমীর গা মুড়ি ভাঙলো, বললো,—যাচ্ছি আমি।

—কোথায়? চা খেয়ে তারপর যাবে মীর। প্লিজ ওয়েট ফর মি, আমিও যাব।—উঠে পড়লো হেলেন। চক্ষুলজ্জায় সমীর দাঁড়ালো কিন্তু মনের ইচ্ছাটা ওর অন্যরকম। হেলেন কাছে এসে আদর করে বললো,—কাল অতখানি রাত জেগে চোখদুটি তোমার কেমন লাল হয়ে গেছে। তোমাদের ট্রপিক্যাল দেশের যা গরম, উঃ!—চল মীর।

কথাগুলো অবান্তর, অনাবশ্যক মনে করলো সমীর, উত্তর দিলনা। ওর সঙ্গেই চা কিন্তু খেতে হোল তাকে। এর মধ্যে এতোটা সমীর এগিয়েছে যে অত তাড়াতাড়ি হেলেনের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। নিজের ঘরে এসে সমীর উপায় চিন্তা করতে লাগলো। উজ্জ্বলাকে স্বপ্নে সে বলেছে, সে পালিয়ে যাবে, কিন্তু পালাবার কোন উপায় ওর নাই। ওকে যেখানে কর্ত্তৃপক্ষ রাখবেন সেখানেই থাকতে হবে। ওর স্বাধীন ইচ্ছা এখন আদেশের অধীন। কিন্তু এখনো সমীর হেলেনের সঙ্গে দৈহিক সংসর্গে পতিত হয়নি, এখনো হয়তো উদ্ধার লাভের আশা সে করতে পারে। কিন্তু আরো কিছুকাল থাকলে সেটাও ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সমীর বিশেষ চিন্তিত হোল।

ডাক এলো কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে। সমীর তৈরী হয়ে গিয়ে শুনলো, গত দু' তিন দিনের যুদ্ধে যে সব সৈন্য আহত হয়েছে তাদের আনবার জন্য একখানা জাহাজ যাচ্ছে, সমীরকে সেই জাহাজে যেতে হবে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। মন যেন প্রস্তুতই ছিল। বললো—আমি তৈরী। শুধু আমার বাবার নামে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে চাই। ওর ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হোল। টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোল ওর বাবার নামে। সমীর বিপজ্জনক যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললো।

—পালাতে পেরেছে হেলেনের কাছ ছেড়ে,—ভেবে যেন সমীর বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে। ওর চরম-অধঃপতন আর ঘটতে পেলনা। ঈশ্বর, না, ঈশ্বরকে ও মানেনা, উজ্জ্বলাই ওকে বাঁচিয়ে দিল। উজ্জ্বলাই ওর ঈশ্বরী। সমীর জাহাজের ডেকে বসে গান ধরে দিল—

"শুন রজকিনী রামী—
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া শরণ নিয়েছি আমি।"

জলা এত বেলা অবধি সঙ্গে ছিল সমীরের। ওর উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের মনে চিন্তার তরঙ্গ তুলে জলাই সমীরের নাম মনে করিয়ে দিল, সমীরের যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে দিল, এবং তার উপার্জ্জিত টাকাগুলিও যাতে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়, সে কথাও সমীরকে মনে করিয়ে দিল, কারণ জলা জেনেছে, সমীর

আর না ফিরতেও পারে ! জাহাজেও জলা বসেছিল সমীরের পাশটিতে। দেখলো. সমীর মনের আনন্দে গান ধরেছে। আর গাইছে তারই কথা মনে করে··· "—ও দু'টি চরণ শীতল বলিয়া" "মিষ্টি হাসলো জলা। ভালোও লাগছে ওর খুব। এই পৃথিবীর প্রেম, কবি চণ্ডীদাস যে প্রেমকে কামগন্ধহীন করে সপ্তম স্বর্গের ঐশ্বরিক প্রেমে পরিণত করেছিলেন। জলা নিশ্চিন্ত হোল অনেকটা; সমীর নিজেকে রক্ষা করতে পারবে এবার। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে ; বেলা মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে। গ্রীষ্ম মণ্ডলের প্রচণ্ড রোদ আর ঘননীল আকাশ, তার নীচে নীলিম সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজখানি যেন নীলমণির কৌটায় রাখা ছোট্ট একটি জীব-পঙ্কের বিন্দু! জলার উপমাটা ওর বর্ত্তমান স্বর্গ লোকের মনের তুলনায় পার্থিব হয়ে গেল।

কিন্তু আর বেশী দূর গিয়ে কি হবে! জলা সমীরের পাশ থেকে উঠে সমুদ্রের আকাশে ভাসতে ভাসতে আবার এল সিংহলে। বেলা অপরাহ্ন, দেখতে পেল, হেলেন বিমর্ষমুখে একটা তাল কুঞ্জে বসে আছে, আর ঐ কুঞ্জেরই একটা তাল গাছে পা ঝুলিয়ে বসে মিটি মিটি হাসছে ওনীল। কবির বসবার যোগ্য চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে ও। জলা ওর কাছে এসে শুধুলো, এবার কি করবে কবি ?

—বলেছিতো। ওকে লাথি মেরে পথে বের না করা পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই।

—কিন্তু কবি, শুনেছিলাম, প্রথমে ওই তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছিল, তুমি উপেক্ষা করেছ।

—হতে পারে, কিন্তু আমি তিন জন্ম ওর পেছনে ঘুরছি, এবার দেখে নেবো ওকে।

কিন্তু এবারও তোমার ওকে ক্ষমা করা উচিৎ কবি। ত্রাণকার্ত্তা শ্রীশ্রীযিশু বলেছেন—I say unto thee, until seven times but until sevnty times seven......(Matt X VIII—12-22)

এতে নিজেকেও বড় বিপন্ন করছো তুমি কবি ; এ কর্মেরও ফল ভোগ করতে হবে।

—আচ্ছা, নো সারমণ প্লিজ, কোথা যাচ্ছ যাও এখন। তোমার প্রেমিকটিকে তো ছেড়ে দিয়েছি।

জলা আর অনর্থক বাক্যব্যয় করলো না। চলে এলো কন্যাকুমারী তীর্থে। সন্ধ্যার সময় আরতিটা এখানে দেখতে ইচ্ছা করছে ওর। সমুদ্রের বালুবেলায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কত শত যুগ অতীত হয়ে গেল, গৌরী এখানে শঙ্করকে স্বামীরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত এই পবিত্র স্থান। জলার মনে হোল, স্বর্গের যতখানা সে দেখেছে, এমন সুন্দর তো কোথাও দেখেনি। কি দরকার তবে স্বর্গের যাবার ? স্বর্গের ভোগভূমি থেকে এ জায়গা অনেক বেশী সুন্দর ; স্বর্গে এর তুলনাই নাই বোধ হয়।

দূরের তালীবন থেকে একজন পুণ্যাত্মা যোগী আসছিলেন ; জলা তাঁর মূর্ত্তি দেখে অবাক হয়ে গেল, মানুষী দেহ, কিন্তু কী সুন্দর ! কুমার কার্ত্তিকেয় নাকি ? জলা প্রণাম করলো।

—উচ্চতর লোকে ঐশীগতি লাভ হোক ! আশীর্ব্বাদ করলেন সেই মহাতাপস।

—প্রভু, আজো আপনি মানুষী দেহ ধারী ? কত বৎসর এখানে অধিষ্ঠান করছেন ?

—বেশীদিন নয় মা, উড়িষ্যার আবাল বৃদ্ধকে যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেব নামামৃত পান করাচ্ছিলেন, সেই সময় আমি এখানে এসেছিলাম, পাঁচশো বছরও হয়নি। এসেছিলাম ঐ নামামৃত দানের উদ্দেশ্যেই, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। জগদম্বার জগৎ বিমোহিনী মূর্ত্তি এখানেই আমাকে আটকে দিয়েছে, স্বর্গেও যেতে ইচ্ছা করে না। নরদেহও ছাড়তে পারি না। কারণ তাহলে মা'র স্তোত্রগান আমি মানুষকে শোনাতে পারবোনা, তাই দেহ রক্ষা করছি।

- দেহ রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ পারিশ্রম তো নিত্য করতে হয় প্রভু ! কি খান ?

—অতি সামান্য, ঐ বনের তাল, খেজুর, কিম্বা শতমূল, কুষ্মাণ্ড, ঐ যথেষ্ট।

একদিন আনলে সাতদিন চলে যায়। চল মা আরতি দেখবে, এসো। তুমি তো চতুর্থ লোকের দেবী।

—আমি যাইনা সেখানে! বড় ভয় করে, আবার যদি ভোগে মেতে উঠি।

—না যাওয়াই ভাল মা, নিবৃত্তিমার্গ খুবই ভাল। কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গ আরো ভালো মা—সে প্রবৃত্তি যদি সৎ প্রবৃত্তি হয়। এই ধরনা, আমি পৃথিবী ছাড়তে পারি না, দেহও ছাড়তে পারি না, কারণ আমার মা এখানে রয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে যাব কোথায়! এটাতো প্রবৃত্তি, আসক্তি, কিন্তু এটা বিষয়াসক্তি নয় মা, বিষয়াতীত আসক্তি। বিশ্বমাতাকে তো বিষয় বলা যায় না, তিনি বিষয়াতীতা, বিষয়িনী—(১)

জলা নীরবে হাঁটতে লাগলো। কি সে বলবে এঁর কাছে। উনিই বললেন আবার,—কোশ পাঁচেক দূরে বনের মধ্যে একটি ছোট মন্দির আছে। শ্রীমাধবের মন্দির, জান মা, ওখানে একজন ভক্ত আছেন, কালাপাহাড় যখন সব মন্দির ধ্বংস করে দেয় তখন উনি বিগ্রহ নিয়ে পালিয়ে আসেন এখানে; তাঁর সদাই ভয়, আবার যদি কোনো কালাপাহাড় এসে তাঁর শ্রীমাধবকে আঘাত করে, এই ভয়ে উনি আজো দেহরক্ষা করছেন, সে আজ বহুশত বছর হোল। উনি মরতে চান না কিছুতেই।

জলা অবাক হয়ে গেল, বললো—তাঁর চরণ দর্শন করতে পাই না প্রভু?

—কেন পাবে না মা? তুমি দেবযানগামিনী স্বর্গলোকের কন্যা, তুমি যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার। বেশতো, আমার সঙ্গেই যাবে এখনি, এসো, আরতি হচ্ছে দেখবে।

জলা ওঁর পিছনে এসে দাঁড়ালো মন্দির-প্রাঙ্গণে। দেখলো, কত যতি, কত তপস্বী, কত ব্রহ্মচারী, কত শুদ্ধাত্মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! এঁদের মধ্যে অনেকেই মানুষ। জলা শুধুলো—

—এঁরা এত কম বয়সে এমন শুদ্ধ হয়েছেন কি করে প্রভু?

—ওঁরা মায়ের ডাক ভুলতে পারেন না। মৃত্যুর পর আবার এখানেই

* (১) ন্যায় ভাষ্য

ন্মান ; দেহটা শুধু পাল্টে নেন। আমারও দু'এক সময় ইচ্ছা হয়, দেহটা পাল্টে নিই। কিন্তু ভয় করে মা। গর্ভের কারায়, যোনির পেষণে যদি আমার ...র কথা ভুলে যাই, তাই এক দেহই রক্ষা করছি। (২)

—ওঁরাতো ভোলেন না ?

—ওঁরা অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন। কেউ কেউ সপ্তম লোকের অধিবাসী ওঁরা।

আরতি আরম্ভ হোল। আহা কি সুন্দর! মা'র কুমারীমূর্ত্তি কি অপরূপ! মানুষের শিল্পশক্তি এমন মূর্ত্তি কল্পনাও করতে পারে না। স্বয়ং মা একদিন অকস্মাৎ স্থির পার্থিব প্রতিমায় পরিণত হয়েছিলেন, হয়তো ভক্তজন দেখে পূর্ণ ...প্তলাভ করবে বলেই। করুণাময়ী মা, জলার চোখে আনন্দাশ্রু নির্গত ...চ্ছে। নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল ; আরতি শেষ হয়ে গেছে, তবু ওর চৈতন্য নাই। ...ত্তি ডাকলেন—চল মা!

—যাই, প্রভু! সপ্তমলোকে আমি যাইনি, কিন্তু যাবার তো কিছু দরকার ...ই, মানুষের মৃত্যুলোকেই তো সপ্তম লোকের থেকেও উন্নত লোক রয়েছে!

—আছে, মা, এই মৃত্যুলোক ভারতবর্ষেই ক্ষীরোদার্ণবশায়ী সচ্চিদানন্দস্বরূপ ...র্গুণ গুণাতীত পরমব্রহ্ম আছেন। এইখানেই কোটি কোটি বিশ্বের মহা-...য়িকা মহাপ্রকৃতির নিত্যলীলা নিয়ত চলছে। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি চাই মা, ...লে তো দেখা যায় না।

উনি জলাকে সঙ্গে নিয়ে বায়ু-স্রোতেই চলে এলেন শ্রীমাধবের মন্দিরে। জলা দেখলো, অতিবৃদ্ধ একজন লোক বিগ্রহের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন। তিনি মানুষ, কি দেবতা, নাকি ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি, বোঝা যায় না। যতি বললেন, উনি ধ্যানস্থ ..., হয়তো এখন পরমাত্মার সঙ্গসুখ ভোগ করছেন। এসো, আমরা বাইরে অপেক্ষা করি।

---

(২) অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপিড্যমানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি ন চ কর্ম্মশুভাশুভং বিন্দতি—গর্ভ উপনিষদ।

সম্মুখে ছোট একটি পুকুর, স্ফটিকস্বচ্ছ জল, সেই জলে খেলা করছে কয়েকটি চারুহাসিনী দিব্যাঙ্গী মেয়ে। একজন জলাকে নির্দেশ করে অন্যকে বলছে—ঐযে দেখছিস না, ও আমাদের উৎপলপর্ণার ননদ, এখানে পূজা দেখতে এসেছে।

জলা অবাক হয়ে গেল। উৎপলপর্ণা তো তার বড় বৌদির পূর্ব জন্মের নাম! এরা চেনে নাকি তাকে? অন্য মেয়েটি বললো—উৎপলা এখন আছে কেমন লো? খবর জানিস?

—জানি, সেই শয়তানটার সঙ্গে মিশে ওর গর্ভে আবার একটা শয়তান এসেছে। তবে বেঁচে যাবে উৎপলা। ওর বিবাহিত স্বামীর খুব অসুখ। সেই অসুখটা নিজে নিয়ে উৎপলা মরবে।

—ওমা, তারপর পেটের ছেলেটা?

—সেটাতো শয়তান একটা। উৎপলা স্বামীর রোগ নিজে নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবে, কিন্তু আত্মঘাতি হবার জন্য আর গর্ভাবস্থায় মরার জন্য তাকে কিছুদিন প্রেত হতে হবে।

—সে কি লো! আমাদের উৎপলা প্রেত হবে?

—হোলতো কি বয়ে গেলো! ওর গর্ভে জন্মযোগী পুত্র জন্মেছেন। দ্বাদশ বৎসরে পড়লেই উৎপলাকে তিনি একেবারে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেরকম পুত্রের মা হবার মত মেয়ে স্বর্গেও কম আছে।

জলা ওদের সব কথাগুলো শুনলো। এদিকে শ্রীমাধবের পূজারীর ধ্যান ভেঙ্গেছে। তিনি জলাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন,—আমি বাংলার অধিবাসী ছিলাম, মা, বড় ভালোবাসি বাংলাকে। বাংলার বড় দুর্দ্দিন আসছে, মহামন্বন্তর সুরু হবে সেখানে।

—মহামন্বন্তর! সেকি প্রভু? কোনো প্রতিকার নেই তার?

—না, শ্রীভগবানের ইচ্ছা। স্বার্থলোভী বণিক, পাপান্ধ রাজকর্মচারী আর যুদ্ধের ভীষণতা ঠিক ত্র্যহস্পর্শের মত ঘটাবে এই মড়ক। ঈশ্বরকে ডাক মা তিনিই রক্ষা করুন বাংলাকে।

জ: .. ওঁদের দুজনকে প্রণাম করে বিদায় নিল। কিন্তু ওর বড্ড মন খারাপ ...হ চণ্ডীপুরের জন্য। বড়দার জন্যও ভাবছে সে। কিন্তু তার কাছে স্বার্থে তো আছে। জলা দেরী না করে চলে এলো চণ্ডীপুরে। রাত সবে ... হাটদা বিছানায় পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; আর ছোটবৌদি ...য়ে হয়তো লীলাবিলাস করছেন। জলা বড়বৌদির ঘরে এসে দেখলো, ...বৌদি। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চেয়ে দেখলো, প্রণব ঐখানে ঘুমুচ্ছে ...ানো মেঝেতে আর বড় বৌদি বেদীর কাছে বসে কাঁদছে, বলছে ...াগটি আমার দাও মা, উনি ভাল হয়ে উঠুন। মা, পাপ আমি অনেক ...রেছি, কিন্তু তুমি যে মা, তুমি ক্ষমা কর। তোমার আশীর্ব্বাদে প্রণব এসেছে ...মার কোলে। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার স্বামীর রোগব্যাধি নিয়ে আমি ...ন শাঁখা-সিঁন্দুর পরেই মরতে পারি।"

উঃ—কি নিদারুণ শুকিয়ে গেছে বড়বৌদি? কোথায় গেল সে রূপ, সে রঙ, ...যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। অনুতাপের জ্বালায় ছটফট করছে বড়বৌদি। ...র্মের ফল পেতেই হবে। বড়বৌদি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো অকস্মাৎ, –উঃ উঃ উঃ!

বৈকুণ্ঠ ছুটে এল, বললো, ধৈরয ধরো মাঠান, বড়বাবুর ওখানে অসুখ। আর ...মি এমন করে...।

—দাই ডাক বৈকুণ্ঠ, আমি গেলাম, আমি গেলাম, উঃ, প্রণব, বাবা আমার! ...মার গর্ভধারিণীকে ভুলো না মাণিক; ভুলোনা......বড় বৌদি হতচৈতন্য ...য়ে গেল। সে-জ্ঞান আর ফিরবে না, জানে জলা। বৈকুণ্ঠ লোকজন ডাকছে, ...াক্তার ডাকছে। জলা চলে গেল ওখান থেকে। দেখতে ওর কষ্ট ...হল খুব।

দিদিমার বাড়ীতে আছেন' বাস্তুপুরুষ, তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে গেল জলা। ...কিন্তু বৌদির শেষ পরিণাম ওকে ব্যাকুল করে তুলছে। বৌদি প্রেত হবে। প্রেতত্ব যে কত কষ্টকর, তা দেখেছে জলা। কিছুদিন আগেও বড়-বৌদিকে নিদারুণ ঘৃণা করতো, কিন্তু যেদিন লক্ষ্মীর মুখে তার গত জন্মের ইতিহাস

শুনেছে সেইদিন থেকে বড়বৌদিকে ও শুধু ভালোবাসে নয়, পূজা করে মনে মনে। বৌদি চরিত্রহীনা, বৌদি তার পিতৃবংশের কলঙ্ক, কিন্তু ঐ বৌদিই জনপাবন পুত্রের জননী। ভাবতে ভাবতে জলা দিদিমার বাড়ী এসে দেখলো, বাস্তুপুরুষ উঠানে পায়চারি করছেন। বর্ষা পড়েছে, মাটির উঠানে ঘাস গজিয়েছে। জলার দেখতে বড় সুন্দর লাগলো। বাস্তু পুরুষের অঙ্গের কোমল জ্যোতিতে ঘাসগুলি আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন পান্নায় মোড়া। আহা কতদিন জলা এমন করে ঘাসের উপর খেলা করেনি। মাতা ধরিত্রীর এই স্নেহশ্যামলতায় ওর অন্তর আবার গড়াগড়ি দিয়ে লুটোতে চায়। জলা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো বাস্তুপুরুষকে।

—এসো মা, আজ তোমার বড়বৌদির অন্তিম দিন, বড় কষ্ট পাচ্ছে, তাই চলে এলাম।

—প্রণব মাতৃহীন হবে প্রভু, কে ওকে দেখবে ?

—প্রণব অদ্বৈতবাদী মা, সে সোহং, তার মা নেই, বাপ নেই, কেউ নেই, সে নিজেই ঈশ্বর স্বরূপ। বৈকুণ্ঠের কোলেই সে বছর সাত বড় হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবে। বৈকুণ্ঠ সত্য-সাধক, তাই পরম সত্যের লালনের ভার তার উপর পড়লো। কিন্তু মা······বাস্তুপুরুষ জলাকে যেন বিচলিত দেখলেন বললেন,—তুমি পৃথিবীর মৃত্তিকায় আকর্ষিত হচ্ছো মা। সাবধান হও, যাও যাও, তুলসীমঞ্চ-তলে আশ্রয় নাও গিয়ে !

দিদিমা ঘুমুচ্ছেন বারান্দায়, পাশে তাঁর ছোট মেয়েটা, জলাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কারণ পৃথিবীর জীবাবর্ত-স্রোত প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে যেন কোথা ঘুরিয়ে নিয়ে ফেলবে। জলা ছুটে গিয়ে তুলসী মঞ্চটা চেপে ধরলো। দিদিমা জাগ্রত আত্মচৈতন্য বললেন,—কি উজ্জ্বলা ? ভয় কি ? বস, সমীর কেমন আছে ?

—ভাল নেই দিদিমা ! সমীর সাত দিনের মধ্যে মারা যাবে। তারপর আবার জন্মাবে, কোথায় যে জন্মাবে, জানিনা। ওর এ জন্মটায় কোন কাজ হোল না, দিদিমা !

—তাতে কি ? একটা দুটো জন্ম অনন্তকালের গর্ভে কিছু নয়, উজ্জ্বলা, সমীর আবার জন্মাবে ; কিন্তু তুই ? তুইও জন্মাবি তো ?

—না, জন্মাতে আর চাইনা দিদিমা, তাই এখানে এসে দাঁড়ালাম। জন্মালে কর্ম অনেক বেশী করা যায়, কিন্তু স্মৃতি ভুল হয়ে যায়। তাই সৎ না অসৎ কর্ম করবো, কে জানে ? ভয় হয় আমার।

দিদিমা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—সমীর আবার জন্মাবে, তাতে ভাববার কিছু নেই উজ্জ্বলা। তুই সব সময় তার খবর রাখিস। তবে আমার মনে হয়, সমীরের মন, বুদ্ধি, যথেষ্ট উন্নত, বেশীদিন সে পৃথিবীতে আটকে থাকবে না।

পৃথিবীর জাবাবর্ত তখনো শেষ হয়নি, করুণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বৌদি তাহলে মারাই গেল! আহা ! জলাকে ইঙ্গিতে ডেকে বাস্তু-পুরুষ সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাদের বাড়ীতে। দিদিমাও ঘুম ভেঙে বসলেন। জলা আবার চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখলো, বৌদির মৃতদেহটা ঘিরে ছোটবৌদি এবং বাড়ীর সবাই কাঁদছে, ছোটদাও রয়েছে, কিন্তু বড়বৌদির আত্মা কোথায় ? দেখতে না পেয়ে জলা বিস্মিত হলো। প্রণব জেগে উঠে খিড়কীর দরজার দিকে যাচ্ছে ছুটে ; ও চলে গেল—মা মা মা......ওমা······।

জলা আর বাস্তুপুরুষ সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখলেন, খিড়কীর পুকুরের বাঁধাঘাটের পাশে মস্ত বড় তমালগাছটায় বসে রয়েছে বড় বৌদি, কোলে একটা মরা ছেলে। বলছে—মরেছিস ! না মরেছিস্ তো মর, মরে যা। বড় খিদে পেয়েছে, তোর মাসটা খেতে পাই তাহলে।

আশ্চর্য্য ! বৌদি সেই মৃত শিশুটার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, আর হাসছে। আহা ! কি করুণ অবস্থা ! ঐ রকম করে ওকে সাত বছর থাকতে হবে ! হতভাগিনী নারী ! জলা কাছে গিয়ে বললো,

—বড়বৌদি, শুনছো ? ও বড় বৌদি !

কিন্তু বড়বৌদি ওর কথাতো শুনতে পেলই না, উপরন্তু কেমন যেন ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল উপরের সেই ঘরে, যেখানে লোচন ওর সর্বনাশ

করেছে। কান্নায় বুক ফেটে যাচ্ছে জলার। এই বংশের গৃহলক্ষ্মী বড়বৌদি, তার এই পরিণাম! কিন্তু কিছুই তাদের করবার নেই। প্রণবকে তুলে নিয়ে গেল বৈকুণ্ঠ। জলা আর বাস্তুপুরুষ এলেন ফিরে, দেখলেন, উপরের জানালা খুলে বড়বৌদির প্রেতমূর্ত্তি দেখছে উঠোনের লোকগুলিকে, বলছে,—কি হোল, কাঁদছো কেন সব? কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছেনা। বড়বৌদির আত্মা মূর্চ্ছিত হয়ে গেছে, জলা বুঝলো, বড় বৌদি জানেই না যে সে মরেছে। আশ্চর্য্য! বড়বৌদি বড়দার অসুখের খবরের জন্য একটুও ভাবছে না, ওর পেটটা খালি হয়ে গেছে, খাচ্ছে যা পাচ্ছে, মরা ছেলেটার মাংস, গু-গোবর, কিছু বাদ দিচ্ছে না। ঐসব খাবার খুঁজতে খুঁজতে বড়বৌদি বাইরে কোথায় চলে গেল। জলা প্রশ্ন করলো বাস্তুপুরুষকে,

—কোথায় ও যাবে প্রভু? ওর কি গতি হবে?

—নরকলোক বা প্রেতলোকে থাকবে, তারপর গতি করবে প্রণব। চল মা যাই—বলে উনি জলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাড়ী থেকে। জলাও ওঁকে প্রণাম করে স্বর্গলোকে ফিরলো। পৃথিবীতে রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

সমীরের রেডক্রশ মার্কা দেওয়া জাহাজ এগিয়ে চলেছে মহাসমুদ্রে। ভারত মহাসাগর, তারপর প্রশান্ত মহাসাগর, বিরাট বিস্তীর্ণ নীলাম্বু। মানুষ যে কত ক্ষুদ্র তা সমুদ্র না দেখলে ধারণা হয় না। ব্রহ্মাণ্ড যে কত বিশাল তার কথঞ্চিৎ ধারণা হয়তো মহাসমুদ্রই দিতে পারে আর দিতে পারে অনন্ত বায়ু সমুদ্র। কিন্তু সমীর ওসব কথা ভাবছিলনা। তার মনের পটে চণ্ডীপুরের ছবি, সেখানে উজ্জ্বলার খেলাঘর আর সেই খেলাঘরে সমীর খেলনাগুলো ভেঙে দিচ্ছে—এই ছবিটাই জ্বল জ্বল করছিল। মাঝে মাঝে কাটা কাটা হয়ে ভেসে আসছিল হেলেনের মূর্ত্তি, উচ্ছল যৌবন, মাংসল দেহ, লালা-নিস্থত মুখ, ক্লেদাক্ত নিশ্বাস আর কামনা-সিক্ত কথাগুলো। নাঃ, সমীর পালিয়ে বেঁচে গেছে খুব। হেলেন তাকে সহজে ছাড়তো না।

জাহাজ বহুদূরে এসে পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগ আর বেশী দূর নয়। মৃত্যুকাতর সৈনিকের শেষ আর্তনাদ, আহত সৈনিকের অসহ্য যন্ত্রণার্ত্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সমীরের জাহাজে ছোট ছোট নৌকা বোঝাই অনেকগুলি আহত সৈন্য এসে উঠলো। সমীর একাই এখানে ডাক্তার নয়, আরো আছেন কয়েকজন। কিছু দূরে একটা দ্বীপে অনেকগুলি আহত সৈন্য পড়ে আছে, জানা গেল। ওখানে একজন ডাক্তার পাঠাতে হবে। উর্দ্ধতন কর্মচারী বললেন, —কে যাবে ?

—আমি। বলে সমীর এগিয়ে গেল। ওর ইচ্ছাকে অভিনন্দিত করলেন কর্মচারী। সমীর একখানা ছোট নৌকায় আরো কয়েকজন নার্স আর লোক, ষ্টেচার ইত্যাদি নিয়ে যাত্রা করলো। মৃতদের সে কিছু করতে পারবেনা। কিন্তু জীবিত সৈনিকদের যন্ত্রণার সামান্য লাঘব সে করতে পারে। এই পরোপকার বৃত্তিতে তার আত্মার নিশ্চয় উন্নতি হবে, সমীর ভাবছিল আর স্বপ্নে শোনা উজ্জ্বলার কথাগুলো মনে পড়ছিল। পাঁচদিন সে সিলোন ছেড়েছে, কৈ, উজ্জ্বলা তো আর দেখা দিলনা স্বপ্নে! তবে কি স্বপ্নটা অলীক ? মনে সন্দেহ জাগছে ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক সমীরের। তবু সে অন্তরের অন্তরে হয়তো বিশ্বাস করে, না,—অলীক নয়। এই বিশ্বের মহারহস্যের উদ্ঘাটনের শক্তি মানুষের নাই, তাই বলে বিশ্বে কোন রহস্য নাই, এমন কথা বলা চলেনা। ঈশ্বর নাই, এমন কথা কেমন করে বলবো, ঈশ্বরকে দেখিনি, অনুভব করিনি, তাই বিশ্বাস করিনা, এই কথাই বলতে পারি। কিন্তু কে জানে, অন্য কেউ হয়তো দেখেছে যে তিনি আছেন।

দ্বীপটা ছোট, পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল বিস্তর। দু' তিনদিন থেকে এখানে যুদ্ধ চলছে, এটা শত্রু পক্ষের হাতে পড়লে তাদের ঘাঁটি করার সুবিধা হবে ভেবে মিত্র পক্ষই এটাকে নিজের অধিকারে রাখতে চান। কিন্তু সমীরদের নৌকা কূলে লাগাতেই দেখতে পাওয়া গেল, এ পক্ষের সব সৈন্যই প্রায় হত, না হয় আহত হয়ে এখানে সেখানে পড়ে আছে। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সমীরদের দল আহতদের পরীক্ষা করলো, ষ্টেচারে তুলে নৌকায় চড়ালো, সে নৌকা জাহাজে

পাঠিয়ে দিল। বলে দিল আরো খান কয়েক নৌকা পাঠাবার জন্যে। অনেক আহত সৈন্য এখানে। সমীর নার্সদের সঙ্গে যথাসাধ্য প্রাথমিক চিকিৎসা করছে, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নৌকায় তুলে জাহাজে পাঠাচ্ছে। অকস্মাৎ দূর আকাশে শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষী বিমানের আওয়াজ শোনা গেল। এই দ্বীপটাই তাদের লক্ষ্য, বুঝতে দেরী হোলনা সমীরদের। উপায় নাই, এখন আর চিন্তার অবসরও নাই। ওরা নীরবে কাজ করছে। শত্রুপক্ষের বিমান মাথার উপর দেখা গেল। আশ্রয়স্থলগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তবু যে যেখানে পারলো, আশ্রয় নিল।

এতক্ষণে সমীরের ভয় জেগে উঠলো অন্তরে, নিদারুণ ভয়। কোথায় তার জন্মভূমি শ্যামলা বাঙলাদেশ, আর কোথায় দূর দূর ভারত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে তার মৃত্যু হচ্ছে। হ্যাঁ, মৃত্যুই হবে তার, কোন রকমেই সমীর আজ বাঁচবেনা। আতঙ্কে ঠক্ ঠক করে কাঁপতে লাগলো সমীর। পাশের নার্সটা বললো, —ভয় পাচ্ছ কেন ডাক্তার, মরতে হয় বীরের মত মর, ভয় কি ?"

সমীর নিজকে সাহসী করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু খানিক দূরে 'দূড় দূড় দুড়ুম' বিকট শব্দে একটা বোমা বিস্ফারিত হয়ে গেল। কেঁপে উঠলো সারা দ্বীপটা। সেই নার্সটাও ভয় পেয়েছে এবার। প্লেনটা এই দিকেই আসছে। সমীর আরো দূরে পালিয়ে যাবার জন্য নার্সটার হাত ধরে ছুট দিল। ভয়ে ও ভুলেই গেল, যে এরকম ভাবে যাওয়া বেশি বিপজ্জনক। প্রাণের ভয় মানুষকে জন্তুতে পরিণত করে—সমীর ছুটছে। দুড়ুম! মেশিনগানের একটা গুলি লেগে সমীরের মাথার ঘিলুটা বেরিয়ে পড়লো, দেহটা পড়ে গেল মাটিতে। যাকগে, সমীর ছুটছে। নার্সটা কোথায় পড়ে রইল, কে জানে। সমীর ছুটছে মহাসাগরের উপর দিয়ে, প্লেনটাও যেন ছুটছে ওর পেছনেই। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে সমীর, কোন্‌দিকে যাচ্ছে ঠিক নেই, ছুটছে। বহু বহুদূর চলে এলো ছুটেই, খুব বেঁচে গেছে। ও জাহাজে আর যাবেনা সমীর ফিরে ; সে তো বেশ ছুটতে পারছে এখন, বায়ুতে ভর দিয়ে সাঁতার কাটতে পারছে, জাহাজে আর কি দরকার? সমীর প্রায় শতাধিক মাইল চলে এসে একটা ছোট দ্বীপের ছোট্ট একটি বালির পাহাড়ে বসলো। বিশাল রণক্ষেত্র এখন ওর চোখের সম্মুখে! ওঃ কত লোক, কত রকমের

সব লোক উঁচুদিকে নীচুদিকে ধারে পাশে পালাচ্ছে। আবার কেউ বেশ হাসি মুখে যুদ্ধই করছে, দেহটা পড়ে গেছে মাটিতে—তবু যুদ্ধ করছে। ওরা বীর!

কিন্তু এখানেও যদি এরোপ্লেন আসে! বিশ্রাম নিতে পারলোনা সমীর ভয়ে। আবার আকাশে উঠে ছুটতে লাগলো। ঘণ্টায় শত মাইল তার গতি। বাঃ, চমৎকার শক্তিতো জন্মেছে তার! কি করে হোল এত শক্তি! সমীর ঠিক করলো—সিলোন যাবে, গিয়ে হেলেনকে অবাক করে দেবে, তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে সটান বাড়ী চলে যাবে। সমীর তীব্র বেগে সিলোনে পৌছালো এসে।

রাত দুটো, হেলেন ঘুমুচ্ছে আর কাছে বসে রয়েছে একটা লোক—কে?

—এসো হে মিঃ সমীর, এখন লাগছে কেমন, খুব হাল্কা, না?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে? ভদ্র মহিলার শোবার ঘরে তার ঘুমন্ত অবস্থায় এসেছো কেন?

—হাঃ হাঃ হাঃ - তোমাকেও সেকথা বলতে পারি। তোমারই বা আসবার কি অধিকার?

—ও আমাকে ভালবাসে, আর আমিও ওকে ভালবাসি।

—মিছে কথা। ওকে আমিই ভালবাসতাম, এখন ঘৃণা করি! শোনো সমীর, চলে যাও এখান থেকে, নইলে মার খাবে, যাও।

রাগে সমীর চীৎকার করে উঠলো,—শূয়ার কা বাচ্চা! এত সাহস তোমার! জানো, এটা মিলিটারি এরিয়া? কার পারমিশনে ঢুকেছ তুমি?

—হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি আর মিলিটারি নয় হে সমীর, মরেছ। তুমি এখন ভূত।

—কি! শূয়ার কাঁহাকা, আমি ভূত, আর তুমি হারামজাদা দেবতা?

— না, আমিও ভূত। যাও বাপু, চলে যাও। হেলেনকে আমি আগে নেব, তারপর ওকে পথে ফেলে দিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। যাও।—সত্যি ও ঘাড় ধরে বার করে দিল সমীরকে। নিরুপায় সমীর ভাবতে লাগলো, লোকটা কে? ওর

গায়েতো ভয়ানক জোর দেখছি ! মিলিটারি পুলিশকে খবর দেওয়া যেতে পারে কিন্তু দেখতে পেলে সমীরকেও পুলিশ ধরবে, আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তি হবে তার। না, সমীর দেশে পালিয়ে যাবে।

প্রাণের আতঙ্কে সমীর ছুটতে লাগলো আবার, ভারতের শেষ মৃত্তিকাবিন্দু কন্যাকুমারী, বিবেকানন্দ দ্বীপ পার হয়ে মান্দ্রাজের উপকূল ধরে তাল-বনের ছায়ায় ছায়ায় সমীর বাঙলা দেশে চলে আসছে। বড্ড ক্লান্তি লাগছে, কারণ বাতাস ওকে উড়িয়ে দিচ্ছে অন্যদিকে ; হঠাৎ একটা মৌশুমী বায়ুতে সমীর হিমালয় পাহাড়ের একটা চূড়ায় গিয়ে পড়লো,—অজ্ঞান হয়ে গেল সমীর।

* * * *

সেদিন জলা তার স্বর্গের বাড়ীতে ফিরে দেখলো, লক্ষ্মীবৌদি ফেরেনি, তাহলে হয়তো দাদার অসুখের বাড়াবাড়ি হয়েছে। দাদাকেও একবার দেখে এলে হোত। কিন্তু সেদিন এত রকম দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে জলাকে যে, দাদার কথাটা মনেই ছিলনা ওর। লক্ষ্মী বৌদি যখন রয়েছে তখন ভাবনার কারণই বা কি ? আর দাদা এখনো কিছুদিন বাঁচবে, জলা দৈবক্রমে সেকথাও জানতে পেরেছে, কাজেই নদীতে ভাল করে স্নান করে সে পৃথিবীর স্মৃতির ময়লা ধুয়ে ফেলে পূজা করতে বসলো। ধ্যানে ভালো মন বসছেনা, কিন্তু জলা নিজের মনকে ধমক দিল, "তোমার খুসীমত চললে চলবেনা মন, আমার স্বাধীন ইচ্ছাতে তোমাকে চলতে হবে।" মনের উপর প্রভাব বিস্তারের শক্তিটা ওর জেগে উঠছে। আবার জলা পৃথিবীতে দেখা মাতা কন্যাকুমারীর দিব্যমূর্ত্তি চিন্তা করতে লাগলো।

আশ্চর্য্য ! ওর ঘর বাড়ী, ওর বাড়ীর কাছের নদী, দূরের পর্বত সব মুহূর্ত্তে কন্যাকুমারীকায় দেখা মন্দির, সাগর, পাহাড়, বালুবেলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল ; তেমনি শুভ্র জ্যোছনা ফুটে উঠলো চারিদিকে, আর মন্দিরের গৌরিমূর্ত্তি ঠিক তেমনি দিব্য মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে। আহা ! সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময়ী ত্রিগুণা প্রকৃতির মূলাধারা মহাপ্রকৃতি, তোমায় বার বার নমস্কার। জলা করযোড়ে আবৃত্তি করছে "নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকল্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।"

পশ্চাতে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জলা স্তব পাঠ শেষ করে ফিরে চেয়ে দেখলো, সে-দিনের সেই উজ্জ্বল নীলমণিযাত্রী রূপব্রহ্মাণ্ডের মহা-তাপস। উঠে প্রণাম করতেই উনি মিষ্ট হেসে বললেন,—

—আমি জানতাম না মা, তুমি উজ্জ্বল নীলমণির অধিবাসিনী। সেখানকার অধিদেবতা পরম আগ্রহে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ইচ্ছে করলেই সেখানে যেতে পার মা, পথে দেবী অরুন্ধতীকে প্রণাম করে যেও। ওখানের পথ বেশী দূর নয়, তিন দিব্য কলার।

—আমিতো জামতামনা প্রভু, যে আমি ওখানকার অধিবাসী! জলা বিস্ময়ের সঙ্গে বললো।

—জানতে; ভুলে গেছ; সার্দ্ধ দুই কোটি মানববর্ষ অতীত হয়ে গেছে, তুমি ওখান থেকে নেমে এসেছ, তারপর কত গ্রহে তুমি জন্মেছ, আবার সেই সেই গ্রহের স্বর্গে কিছুকাল কাটিয়ে আবার অন্য গ্রহে গেছ। তাই ভুলে গেছ মা, কিন্তু ওঁরা তোমায় ভোলেননি। এবার তুমি যেতে পারবে এই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ লোকে—ঐ ধ্রুবলোকে। উজ্জ্বল নীলমণির অবশ্য ঐ বিন্দুতে আসতে দেরী আছে কয়েক সহস্র বৎসর; কিন্তু কাল এদেশে অখণ্ড, পরমায়ু অনন্ত, ও'কটা বছর কিছুই নয় এখানে। তুমি বিদ্যুৎ দেহ ধারণ করে তিন দিব্য কলায় ওখানে পৌছাতে পারবে মা। আর একটা মজার কথা শোন!

—কি কথা প্রভু? জলা সাগ্রহে প্রশ্ন করলো।

—আমার যে জামাই হবে, সে তোমার দাদা, তার চিজ্জড় গ্রন্থির অর্দ্ধাংশ পৃথিবীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু সে কষ্ট শেষ হয়ে এল, ওখানে তার এক পুত্র জন্মেছেন, তিনি সপ্তম অর্থাৎ সত্যলোকের অধিবাসী। সন্ন্যাস যোগের দ্বারা তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব যতিত্ব প্রাপ্ত হবেন, ব্রহ্মলোকে বহুবর্ষ থেকে তিনি মহা প্রলয়ে ব্রহ্মার লয়ের সঙ্গে পরব্রহ্মে লীন হবেন। (১) * তাঁরই পুণ্যে তাঁর পৃথিবীর পিতা স্বদেশে ফিরবেন।

* (১) বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাস যোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।—মুণ্ডকশ্রুতি।

—আমার দাদা ? আশ্চর্য্য তো ! প্রভু, দয়া করে বলুন, আমার সমীর কোন লোকের অধিবাসী ?

—তাতো জানিনা মা ! এই বিশ্বের কতটুকুই বা জানি ! তবে মনে হয়, সেও কোন দূর লোকের অধিবাসী হবে, তুমি উজ্জ্বল নীলমণিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে মা, ওঁরা বলে দেবেন।

—যে আজ্ঞে, কিন্তু প্রভু, আপনি আমাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কিঞ্চিৎ দেখাবেন বলেছিলেন !

—হ্যাঁ মা, এখনতো তুমি আমার আত্মীয়া হয়ে উঠলে, আমার মেয়ের ননদ ; চলো, কিন্তু দীর্ঘ সময় লাগবে মা, তোমার পৃথিবীর বিদ্যুৎগতিতে গেলে আমার বাড়ী যেতে বহু বহু মানব বৎসর লাগবে ! তোমার গতি তো তার বেশি হবেনা মা এখন।

—কি গতি তাহলে দরকার ?

—আকাশ গতি। নানারকম গতি আছে, আকাশের পর মহাকাশ গতি—তারপর ইচ্ছাগতি, তারপর ঐশী গতি আছে। তারও পরে স্থিরা গতি. অর্থাৎ গতি নাই, যে গতি পরব্রহ্মের, তাঁর কোন ইচ্ছা নাই, তিনি সর্বত্র উপস্থিত ! গতির তিনি গতি. তিনি গতিরও উর্দ্ধে, তাই গতিহীন—তিনি সর্বত্র। এর আগে ধূমযান গতি আর আর দেবযান গতি রয়েছে, বেগ হিসাবে সে খুবই সামান্য। বিদ্যুৎ গতি দেবযান গতির অন্তর্ভুক্ত। আচ্ছা মা, এসো, তোমাকে তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের পারটা দেখিয়ে দিই। এসো, আমার কোলে ওঠো।—উনি জলাকে কোলে নিলেন, তারপর, উঃ—কি সে গতি ! জলা সে বেগ সইতে পারছেনা, শূন্য, মহাশূন্য, উর্দ্ধ নাই, অধঃ নাই, বিশ্বব্যাপী কোমল স্নিগ্ধ জ্যোতিরালোক, তারপর ছায়াময় জ্যোতি-তমসা, তারপর জ্যোতিহীন অন্ধ-তমসার দিব্যালোক। পৃথিবীর ভাষায় সে অন্ধকার-আলোকের বর্ণনা হয় না, কিন্তু এখনো শেষ হয়নি এই ব্রহ্মাণ্ড। ওঃ—কত দূর—কত দূর ! জলার চেতনা প্রায় লুপ্ত হয়ে আসছিল। সহসা তমসার তরঙ্গ পার হয়ে উনি এক জায়গায় এলেন। স্তব্ধতা, মহা-প্রকৃতিও নিষ্ক্রিয় ওখানে। কোন আলোড়ন নাই, কোন স্পন্দন নাই, সব

স্থির। যতিবর সস্নেহে বললেন—এই তোমার ব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্ত। ধ্রুবলোক, আর ঐ দূরে দেখা যায় অরুন্ধতী নক্ষত্র, আর ঐ যে বহু দূরে নীলশিখা বিস্তারিত সুন্দর নক্ষত্রটি, ঐ তোমার আদি নিবাস। * চিজ্জড় গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে ঐখানেই তুমি প্রথম জন্মাও। ওর নাম উজ্জ্বল নীলমণি। আর দেখ মা, এই তমসার পারে ঐ যে দেখছো কোটি কোটি শিশির বিন্দুবৎ উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি, ওরা প্রত্যেকটি এমনি, কেউবা এর চেয়েও বিশাল আকার ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত সূর্য্য, অসংখ্য নীহারিকা, অগণ্য ছায়াপথ নিয়ে পরম ব্রহ্মের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে। মধ্যের এই যে স্থান, এসবই কারণার্ণব, ক্ষীর সমুদ্র। মহাবিষ্ণু সর্বত্র ওতোপ্রোতঃ ভাবে অনুপ্রবিষ্ট; এই বিশ্বব্যাপী অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের অণুতে অণুতে তিনি—কত বিরাট দেখছো মা? (২)......

জলা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া গেল, বহুদূরে কয়েকটা নক্ষত্রের সঙ্ঘর্ষে প্রলয়ঙ্কর অগ্নি জ্বলে উঠলো কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, তারপর সব অন্ধকার।

—ঐ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয়ে গেল মা, বহু শত কোটি বৎসর পরে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণ শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আজ পরব্রহ্মে লীন হয়ে গেলেন। সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা স্বগুণ ব্রহ্ম, কিন্তু পরম-ব্রহ্ম গুণাতীত, তিনি এই সৃষ্টি বা লয়ের জন্য দায়ী নন; অথচ তিনি আছেন তাই তাঁর স্পন্দন দ্বারা জড় প্রকৃতি স্পন্দিত হয়ে সৃষ্টিরূপে ব্যক্ত হন।

জলার মনে প্রশ্ন জাগলো—অগণ্য কোটি এই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা কোথায়? কে এদের পরিচালনা করেন? জলার প্রশ্নটি উনি অনুভব করে বললেন—বুঝেছি মা, তোমার মনে শত প্রশ্ন উদয় হচ্ছে, একে বলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। শোনো মা, এই অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, এ ছিল এবং থাকবে। একটি মানুষ মরলে যেমন, অনন্ত মানব-স্রোতের কিছুই ক্ষতি হয় না; এক

* Occult System. (২) ঈশ্বরস্তু পর্জন্যবৎ দ্রষ্টব্য .... ঈশ্বর সাপেক্ষতান্ন বৈষম্য নির্ঘৃণ্যাভ্যাং ত্বয়তি—শঙ্করাচার্য্য কৃত শারীরকভাষ্য।

পাত্র জল তুলে নিলে যেমন গঙ্গাধারার কিছুই কমেনা, তেমনি এই বিচিত্র সৃষ্টি চিরদিন পরিপূর্ণ। ঐসব প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ; শক্তি কালী দুর্গা, লক্ষ্মী ; সূর্য্য চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, এমনকি প্রত্যেকটি গ্রাম, নগর, বাস্তু এবং দেহ রক্ষার জন্যও দৈবী পুরুষ নিযুক্ত আছেন। তাঁদের কর্মানুসারে তাঁরা উচ্চগতি লাভ করেন, উচ্চতর পদ পান। শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, স্বগুণ ঈশ্বর পদবাচ্য। প্রলয়কালে তাঁরা ঐশীগতি বেগে পূর্ণ ঈশ্বর পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যান। চলো মা, এবার তোমায় ফিরিয়ে দিইগে।

—আমি একবার উজ্জ্বল নীলমণি নক্ষত্রে যেতে চাই দেব। পথে অরুন্ধতীকে প্রণাম করে যাব।

—কিন্তু মা, এই অসীম কারণ সমুদ্রে অগণ্যকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথায় তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে, তার চেয়ে চলো, আমিই তোমায় পৌঁছে দিই। তাছাড়া তোমার গতি দেবযান গতি মাত্র, সে গতি আকাশ-গতির তুলনায় রেলগাড়ীর কাছে শামুকের চালার মতন। আমি তোমাকে আকাশ গতিতে না নিয়ে এলে শত কোটি বৎসরেও তুমি এখানে পৌছাতে পারতে না। মহাকাশ গতি আরো অনেক তীব্র, আর ঐশী বা ইচ্ছাগতি শুধু স্বগুণ ঈশ্বরের গতি। স্থিরাগতি পরব্রহ্মের। বলে উনি আবার জলাকে কোলে নিয়ে সেই আকাশ বেগে ফিরতে লাগলেন। জলা হঠাৎ দেখতে পেল, বিশাল ব্যোম উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে পরিপূর্ণ করে কি একটা বস্তু, শত শত যোজন তার বিস্তার, মহাবেগে চলে আসছে, জলাদের গায়ের উপর দিয়েই চলে যাবে! ভয়ে ভয়ে জলা বললো—ওটা কি গ্রহ প্রভু ? ভয় করছে আমার।

—ভয় কি ? ওটা ধূমকেতু। মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে ও একদিন হয়তো ছোট একটা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করবে, কিম্বা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ওতে এখনো তাই চিজ্জড় গ্রন্থীর স্পন্দন দেখা যাচ্ছেনা। বড় হতভাগ্য বস্তু মা, জীবের জীবন ওখানে স্পন্দিত হয় না।

—আর সব গ্রহে উপগ্রহে জীব আছে পিতঃ ?

—আছে বই কি মা, বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন উপাদানের উপযোগী চিজ্জড়

.ঝে বললেন,—.ব সৃষ্টি হয়েছে, আবার তারা চিজ্জড় গ্রন্থী মুক্ত হয়ে ঈশ্বরে
.াপসীমূর্ত্তি দে

করুণা ছাড়া, জ্জড় গ্রন্থী কাকে বলে পিতঃ? আপনি ঐ কথাটা বারবার বলছেন।
আজ .র অর্থ কি?

—ওটা বোঝা একটু কঠিন মা; কিন্তু ঐটি না বুঝলে জীব-সৃষ্টির মূল কথাই বোঝা হবেনা। শোনো, চিৎ অর্থাৎ চেতন, আর জড়ের গ্রন্থীকে 'জীব' বলা হয়, আর এই গ্রন্থীই চিজ্জড় গ্রন্থী। এর ছেদন হলেই মুক্তি। অনন্ত বিস্তারময়ী প্রকৃতি পরমাত্মার স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে সৃষ্টি বিস্তার করেন। এই সৃষ্টি-লীলার মধ্যে জড় আর চেতন দুরকম গতি রয়েছে; একটি জড় থেকে চেতনের দিকে, অন্যটি চেতন থাকে জড়ের দিকে। এখন ধর, একটি গাছ, যার মধ্যে চেতন অচেতন দুইই আছে, সেই গাছটি মারা গেলে তার চেতন সত্তা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রাণী হয়ে মানুষ পর্য্যন্ত বিবর্ত্তিত হবে (২) এবং উচ্চতর সত্ত্বগুণে পৌঁছে নির্গুণ অসীম চেতনে লয় হয়ে যাবে। কিন্তু জড় সত্ত্বার গতি নিচুর দিকে। তমোগুণের দিকে। কাজেই তার ডাল, পাতা, কাণ্ড সব মাটিতে মিশে যাবে। ঐ চেতন আর জড়ের যে সংযোগসূত্র সেইটিই চিজ্জড় গ্রন্থি (৩)।

জলা কিছুটা বুঝলো, কিছু বা বুঝলেনা, ইতিমধ্যে ওঁরা উজ্জ্বল নীলমণিতে এসে পৌঁছলেন!

জলার বাবা কত কোটি বৎসর পরে মেয়েকে পেয়ে দুহাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে বললেন—তোমায় কি বলে ধন্যবাদ দেব বেয়াই, মা'কে আমি কতকাল পরে ফিরে পেলাম!

জলার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছেনা এখানকার কথা। ও যেন পৃথিবীর

---

(২) এষ চেতরানি চাণ্ডজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজানি চ—ঐতরের উপনিষদ

(৩) দৈবী মীমাংসা দর্শন; উপাসনা মীমাংসা শাস্ত্র।

সেই গল্পের রাজকন্যা, রাক্ষসের ঘরে মানুষ হওয়ার পর রাজ্যে ই বিচিত্র সৃষ্টি এসেছে। বতিদেব বিদায় নিয়ে যাবার সময় বললেন,—তোমার দ শত ব্রহ্মা, বিয়ের আয়োজন করতে হবে মা, সময় খুব কম। আজকার মত আসি । এমনকি ন।

জলা প্রণাম করলো।

*   *   *   *

নীলালোক উদ্ভাসিত অপূর্ব এক মহাগ্রহে এসেছে জলা। এখানকার নদ নদী, কান্তার, গিরি-পর্ব্বত, বৃক্ষ-বল্লরী, জীবজন্তু সমস্তই অদেখা উপাদানে প্রস্তুত। সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ কণার মত তাদের আকার ; শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ সবই বৈদ্যুতিক এবং আকাশময়। জলা একেবারে ভুলে গেছে এ লোকের কথাবার্ত্তা, চালচলন। বাবাকে শুধুতে হবে, কিন্তু ভাষায় কিছুই তার বলবার দরকার হোলনা। এখানে কথা বলার পরিশ্রম করতে হয় না। জলা প্রশ্ন করতে চাইল, দাদার বিয়ের আর কত দিন আছে বাবা ?

—আড়াই ব্রাহ্ম মাসমাত্র মা। অথচ আয়োজন কিছুই প্রায় হয়নি।

—সে কি বাবা! দাদাতো এখনো পৃথিবীতে ? জলা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, কিন্তু এখানের সময় আলাদা মা। ব্রহ্মার অহোরাত্রিতে তোমাদের পৃথিবীর বহু কোটি বৎসর গত হয়। এখানে ব্রাহ্ম বৎসর গণনা হয় মা।

—দাদার ওখানকার বৌ কলা-লক্ষ্মীর কি হবে বাবা ? জলা প্রশ্ন করলো আবার।

—সেইতো তোর দাদার বৌ হবে। তুই যেমন এখান থেকে গিয়ে কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরে অরুন্ধতী দেখে এখানে এলি, তেমনি সেও যাবে অল্পদিন পরেই তার বাপের বাড়ী। ওখানে না গেলে তো বিয়ে হবেনা মা ; তোর দাদাও এর মধ্যে এসে পড়বে এখানে।

জলার কেমন যেন অবাক লাগছিল। এত রহস্য লুকানো ছিল কোথায় ? কোথায় তার সেই মর্ত লোকের মা বাবা ? কোথায় নীলিমা বৌদিদি, দিদিমা, সমীর ? এসব কি স্বপ্ন নাকি ? কিম্বা ঐগুলোই স্বপ্ন ? জলার মনের চিন্তা বাবা

দুঃখে বললেন,—তুই পৃথিবীর সতী সাধন-তীর্থ কন্যাকুমারীকায় বিশ্ব জননীর তাপসীমূর্ত্তি দেখে এসেছিস মা, তাই এত সহজে এখানে আসতে পারলি। মার করুণা ছাড়া এগতি লাভ হয়না। তোর আকাশগতি লাভ হয়েছে। তোর বৌদি আজ তোর দাদাকে নিয়ে, মানে, তোর দাদার আত্মিক দেহকে নিয়ে কৈলাসে উমা-মহেশ্বরকে দেখিয়ে আনবে, তারপর তোর দাদা—পৃথিবীতে পৃথিবীর সামান্য কয়েক বৎসর থেকে এখানে আসবে আর লক্ষ্মী চলে যাবে ওর বাপের বাড়ী সেই রূপব্রহ্মাণ্ডে। পৃথিবীর হিসাবে তোর দাদার আসতে আরো সাত বছর লাগবে। এখানকার সময় ভাগ অন্য রকম মা, পৃথিবীর দু'চার কোটি বছর এখানে দু'এক মাস মাত্র। তোর মা'র কাছে ভেতর বাড়ীতে যা এবার।

—যাই বাবা। সমীর কখন আসবে? জলা মাথা নুইয়েই প্রশ্ন করলো।

—সমীর? সেতো এখানে আসবেনা মা। আর তার সঙ্গে তোর বিয়ে এখনো হয়নি, কতদিনে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ সে দীর্ঘদিন তার জন্মভূমি চিরোজ্জ্বল নক্ষত্রলোক ছেড়ে সুদূর ব্রহ্মাণ্ডে শিক্ষালাভ করতে গেছে। অথচ স্থূল বৈষয়িক শিক্ষাই তার লাভ হোল। আধ্যাত্মিক শিক্ষা খুবই কম হয়েছে তার।

লজ্জিত হয়ে উঠলো জলা নিজের প্রগলভতার জন্য। কিন্তু বাবাই বললেন, —তোর চিজ্জড় গ্রন্থির অর্দ্ধাংশ চিরোজ্জ্বল নক্ষত্র লোকে পড়েছিল বহু বহু দূরের নক্ষত্র তিনি, এখান থেকে আকাশ গতিতে কোটি বর্ষ লাগে সেখানে যেতে। তবে সমীর যদি এখানে আসতে পারে তো আমি তার বাবাকে খবর পাঠাবো। নইলে উপায় কি!

জলার কান্না পাচ্ছে; তাহলে সমীর তার অজানিত এক ব্রহ্মাণ্ডের কোন দূর দূরান্তর গ্রহে হারিয়ে যাবে! বললো,—

—এখানে কি আসতে পারবে সে বাবা? কে তাকে পথ দেখিয়ে আনবে?

—তোর স্বামী-সাধনা তাকে এখানে আনতে পারবে মা। তবে তার পূর্ব্বে ওকে পৃথিবীতেই আর একবার জন্মাতে হবে। ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ও ভুলে গেছে,

কোথা থেকে কোথায় ওর যাত্রা ; কোন জ্যোতি থেকে জ্যোতির্ময় লোকে ওকে যেতে হবে, ওর মনে নাই।

—আমি মনে করিয়ে দেব বাবা। ওকে জ্যোতির্ময় পথে নিয়ে আসবো আমি।*

জলার মা এসে পড়লেন ভেতর থেকে। কত যুগ পরে কন্যাকে পেয়ে বললেন,—আয় মা আমার! ওকি! হোল কি তোর?—কিন্তু নিজেই জলার অন্তর জানতে পারলেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন, ভয় কি মা, সমীর যাতে আসতে পারে তাই করবো। আয়, তোর খেলার সাথীরা তোকে দেখতে এসেছে।

জলা মা'র সঙ্গে অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলো—তার বয়সী আট দশটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই আনন্দে নেচে উঠলো তারা—কেমন ছিলি ভাই অজপা?

ওর মনে পড়ে গেল, ওর এখানকার নাম অজপা, আর সবাই তাকে ওজপা বলে ডাকে। 'ও' ঈশ্বরের প্রতীক। পৃথিবীতে যেমন 'শ্রী' তেমনি এখানে 'ও'। জলার সব কথাই মনে পড়ে গেল এবার। এই সব খেলার সাথী, এরা তাকে ওজপা বলে ডাকছে। ওজপা ঠিক বলছেনা, বলছে 'অজপা'। জলার ভারী আনন্দ হোল ওদের দেখে। সবাই টানাটানি করে অন্দরের পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেল ওকে। জলা এতক্ষণে খানিকটা বুঝলো, তুচ্ছ পৃথিবীর তুচ্ছ একটি মানবাত্মার জীবন কত বিরাট, কত বিচিত্র, কত বিস্তৃত! কত অনন্ত সম্ভাবনার আবেগে স্পন্দিত! এই মহা রহস্যময় চিজ্জড় গ্রন্থীর স্রষ্টাকে নমস্কার!

—স্বপ্ন দেখছিনা তো রে প্রজ্ঞা? জলা একজন সখীকে শুধুলো।

—স্বপ্ন তো এখানে নাই ভাই অজপা। এ সত্যের দেশ, এখানে মিথ্যা স্বপ্ন জীবকে নীচে ফেলে দেয়। তুই আবার যেন নীচে পড়ে যাসনে।

জলা সাবধান হয়ে গেল। অন্য সখীর নাম বেদমতী, সে বললো—তুই অজপা, জীবের স্পন্দন শক্তি রয়েছে তোর স্পন্দনে, ভুলে যাচ্ছিস কেন?

---

* ব্যাল্যগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তদ্বদুদ্ধৃত্য সা নারী তেনৈব সহ মোদতে॥—গরুড় পুরাণম্

—তুই নিজেই পূর্ণসত্বা হতে পারবি ; তুই নিজেই ব্রহ্ম, দুভাগ হয়ে লীলা করছিস। তুই এই বিরাট বিশ্ব ব্যাপ্ত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছিস সমস্ত মহাপ্রকৃতির স্পন্দনের সঙ্গে। তোর এক ভাগ চিরোজ্জ্বল নক্ষত্রে রেখে অন্যভাগ এখানে এসেছিলি। দুভাগের আকর্ষণ শক্তি আবার তোদের এক করে দেবে। বলে বিশ্ববারা ওকে জলে নামালো, সুস্নিগ্ধ জল,—অমৃত নাকি এ? জলা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে স্নান করতে করতে বুঝতে পারলো, এতকাল সে স্বপ্ন দেখেছে, আজ সে জেগে দেখছে, সে এইখানেই চিজ্জড় গ্রন্থীতে আবদ্ধ হয়েছিল। এ আবদ্ধতা ঔপচরিক মাত্র। স্ফটিকের কাছে লালফুল রাখলে স্ফটিক যেমন লাল বোধ হয়, তেমনি। আত্মা কখনো বদ্ধ হয় না ; অন্তঃকরণ আত্মাকে বদ্ধ কল্পনা করে মাত্র। কি সাধনা সে করেছে, সে জানেনা, কিন্তু আজ যেন তার অন্তঃকরণের লয় হয়ে যাচ্ছে। এখন সে বুঝতে পারছে "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম। এখন সে আরও বুঝতে পারলো, প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম জড়াংশে জীবাত্মা প্রতিবিম্বিত হয়েছেন তাই সেই জড়টুকু কারণ শরীর (১)।

কিন্তু এখনো তার চিজ্জড় গ্রন্থী ভেদন হয়নি, কারণ সে তার অর্দ্ধাংশ অন্যত্র ফেলে এসেছে সমীরের মধ্যে। জলার অন্তঃকরণ আবার যেন হু হু করে কেঁদে উঠলো। নীচে নেবে যেতে হবে, যাবে সে। সমীরকে না পেলে তার চলবে কি করে! হেসে উঠলো প্রজ্ঞা, বিশ্ববারা, বেদমতী, বললো, যাবি লো যাবি, আজই তার ব্রহ্মলাভ হয়ে যাচ্ছেনা। বৈষ্ণবী মায়া কাটানো অত সহজ নয়।

জলা লজ্জিত হোল কিন্তু অস্বীকার করলো না ; আস্তে বললো,—ওকে কি করে ভাই আনা যায়ে এখানে?

—পৃথিবীতে ওর জন্মটা যাতে এবারও খুব ভাল ঘরে হয় তার ব্যবস্থা করে দে গিয়ে। এজন্মে যে-সব অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে দেহটাকে অশুদ্ধ করেছে, সেটা যার হতে দিসনে।. তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে আসবি।

(১) অনির্বাচ্যানাদ্য বিদ্যারূপঃ স্থূল-সূক্ষ্মশরীরকারণমাত্রং, স্ব স্বরূপ জ্ঞানং দস্তি তৎ কারণ শরীরম—বেদান্ত দর্শন

বলে ওরা জলাকে নিয়ে স্নান সেরে ফিরে এল। অনেকক্ষণ ওদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে জলা মা, বাবা, আর সবাইকে বললো,

—আমায় যেতে হবে।

—হ্যাঁ মা, যাবে, কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলোনা যেন। বলে, মা, বাবা ওকে আশীর্বাদ করলেন। সোজাপথ নির্দেশ করে দিলেন। জলা আবার মহাকাশে আকাশ-গতিতে নামতে লাগলো। দীর্ঘ কয়েকটা মূহুর্ত—জলা এসে পৌঁছালো তার স্বর্গের বাড়ীতে। দেখলো, লক্ষ্মীবৌদি ফিরে এসে একখানা চিঠি রেখে গেছে। চিঠিটা তুলে জলা পড়তে লাগলো :—

ভাই ঠাকুরঝি,

তোমার দাদাকে কেদার-বদরীনাথ, কৈলাস আর মানস সরোবর দেখিয়ে আজ তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। তারপর আমার বাবার কাছে শুনলাম, তুমি বহুদূরে তোমার বাপের বাড়ীতে বেড়াতে গেছ। শুনে খুবই আনন্দ হোল। তুমি যে এর মধ্যে এত শক্তি লাভ করেছ, এটা খুবই বিস্ময়ের কথা, আনন্দের কথা তো বটেই। জ্যোতিপথে তোমার ঐশী গতি লাভ হোক কামনা করি।

তোমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। কারণ আমার বাবা আমাকে শিক্ষালাভের জন্য তোমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন, মঙ্গল, শুক্র, শনি, বৃহস্পতিতে গিয়েও আমার শিক্ষা শেষ না হওয়ায় বাবা রাগ করে আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন, সেখানে আমার শিক্ষা শেষ হয়েছে, অর্থাৎ আমি তোমার দাদাটির যোগ্যা হয়েছি—বাবা তাই মনে করেন। এই জন্য উনি তাঁর কুমারী মেয়েকে ভাবী বরের কাছে আর রাখতে চান না। কারণ জান? পৃথিবীতে তোমার যে নীলিমা বৌদি, সে অপ্সরা-লোকের কুন্তলাদেবীর মেয়ে। আসলে সে অপ্সরী ; তার গর্ভে তোমার ভাইপোটি জন্মে' তাকে দেবী করে দিয়েছে, যদিও বর্তমানে সে প্রেত। অমন পুত্র অপ্সরাদের গর্ভেও কদাচিৎ জন্মায়। অনেক তপস্যার ফলে প্রণব জন্মেছে, কাজেই পৃথিবীতে তার মা যতই নষ্ট চরিত্রের হোক—অপ্সরার চরিত্রদোষ ঘটেনা, ওরা চিরশুদ্ধ, তাই পার্থিব প্রেতযোনি থেকে

মুক্তি পেলেই ওর সব কথা মনে পড়ে যাবে, কিন্তু তার পূর্বে আমাকে দেখলেই ওর অন্তরে হিংসা দ্বেষ জাগতে পারে, তাতে ওর নিদারুণ ক্ষতি হবে। তাই আমার বাবা বললেন যে কারো অন্তরে দ্বেষ জাগিয়ে তার আধ্যাত্মিক ক্ষতি করা মহাপাপ, তুই পৃথিবীতে আর থাকতে পারবিনা, চলে আয়। অবশ্য তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা বাবাকে আমি বলেছিলাম, তাতে তিনি বললেন যে তোমাকে শীঘ্র উনি আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবেন একদিন।

তোমার দাদাকে দেবযান গতির উপযোগী হবার কথা বলে এসেছি। এখানে এলে তুমি তাঁর আকাশ গতি লাভের ব্যবস্থা করে দিও। পুত্রের পুণ্যে তিনি অনায়াসে সে গতি লাভ করবেন। দুঃখ রইল ঠাকুরঝি, প্রণব আমার গর্ভে জন্মালো না। ও যেদিন সন্ন্যাস নেবে, আমার কথা ওকে মনে করিয়ে দিও ভাই। ভালবাসা নাও। ইতি —তোমার —লক্ষ্মী বৌদি।

পুনঃ—তোমার কাছে আমার বাপের বাড়ীর কথা আর আমার সাধনার কথা গোপন করেছি তার জন্য বার বার ক্ষমা চাইছি। গোপন করেছি, কারণ তুমি তখন অনধিকারী ছিলে।—বৌদি।

জলা চিঠিখানি পড়ে অবাক হয়ে গেল। লক্ষ্মী বৌদির পেটে পেটে এত গুণ! নিজের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেও সে কি-রকম নিরহঙ্কার আর নিরভিমানী হয়ে জলার কছে বাস করতো, যেন কিছু জানেনা। আচ্ছা, বিয়েটা হয়ে একবার ননদিনীর কাছে এলে হয়। ভাবতে ভাবতে জলার নিজের সাধনার কথা মনে পড়লো। সে কি করছে? কতটুকু কি সে করেছে নিজের জন্য? কোথায় সমীরন? কেমন করে তাকে উচ্চতর লোকে আনবে জলা? সমীরনের জন্য জলা তো কিছুই করছেনা। এমন করে সমীরনকে নিজের খেয়ালে চলতে দিলে জলা হাজার জন্মেও সমীরনকে পাবেনা। আর সমীরনকে না পেলে সে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারবেনা, কারণ সমীরনকে নিয়েই সে পূর্ণ।

জলার মনটা অকস্মাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লো। নিজে সে অনেকখানা উপরে উঠেছে, অনেকটা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছে কিন্তু তার অর্দ্ধাঙ্গ যে বন্দী এখনো পৃথিবীর পিঞ্জরে। তার জন্য জলা তো কোন চেষ্টাই করছেনা!

এতকাল এ জ্ঞান হয়নি কেন জলার! কেন জলা তার পৃথিবীর মা'কে দেখেই সেকথা বোঝেনি? মা তার বাবার মুক্তির জন্য কত দুঃখ সহ্য করছেন আজও! জলার যেন ভুল ভাঙলো। একদিন সে ভেবেছিল সে সোহং, সে নিজেই ঈশ্বর। তার কোনো সমীরনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ বুঝতে পারলো, সে নারী. প্রেম ভক্তির পথে মধুর লীলারস আস্বাদন করাই তার ধর্ম। পুরুষ অদ্বৈতবাদী হতে পারে, কিন্তু সে হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মে লীলারস আস্বাদন করে পূর্ণ হয়ে তবে সোহং কথাটা বলতে পারছে। জলা সেকথা কেমন করে উচ্চারণ করবে! জলা যে এখনো লীলার কিছুই আস্বাদ করেনি!

সমীরের জন্য অন্তরটা যেন আর্তনাদ করে উঠলো জলার। আর কারো জন্য তার ভাবনার কারণ নেই। দাদা বৌদি, ছোট দা ছোট বৌদির পরিণাম তার জানা হয়ে গেছে। ছোট বৌদি খুবই দুঃখ পাবে। কিন্তু উপায় কি? তার যেমন কর্মফল! আর ছোটদাও কম দুঃখ পাবেনা। নিরুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ হোল। কিন্তু এসব ভাববার আর দরকার নেই জলার। পৃথিবীতে দুজন মাত্র তার আত্মীয় আছে, সমীর আর বড়দা। জলা স্নান করে পূজা শেষ করেই পৃথিবীর পথে বেরুলো।

আজ তাঁর আকাশগতি, আকাশময় দেহ. আকাশময় ইন্দ্রিয়। নিজেই সে বুঝতে পারলো, সে দেবী পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে; তার শরীরটা পৃথিবীর বিদ্যুৎ অপেক্ষা আড়াই কোটি গুণ শক্তিশালী বিদ্যুতে তৈরী, কিন্তু সে এখনো কারণ শরীর পায়নি। পেলে তার মহাকাশগতি হবে, তারপর ইচ্ছাগতি. ঐশীগতি তবে স্থিরাগতি। উঃ—কত বাকি! তবু যতটুকু শক্তি পেয়েছে জলা তাই নিয়ে সাধনাই সে করে যাবে। জলা করযোড়ে উচ্চারণ করলো—"আসতো মা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মামমৃতং গময়! আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—হে আলোক অন্ধকারের অতীত মহা চৈতন্য স্বরূপ মহাজ্যোতি, তোমার জ্যোতিরালোকে আমায় অবগাহন করাও, আমার ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বাকে ব্যপ্ত করে তুমি অবির্ভূত হও!

দুটি মেয়ে আসছেন পথিবীর দিকে, অপূর্ব দর্শনা দেবী দুজন। জলা

এমন জ্যোতির্ময়ী দেবদেহ দেখেনি এর আগে। আজ দেখতে পাচ্ছে, কারণ তার দর্শন শক্তি হাজার হাজার গুণ বেড়ে গেছে। জলা নতজানু হয়ে দাঁড়ালো ওঁদের পথের পাশে।

—চল মা, অজপা, পৃথিবীতে যাবে তো? চলো। আমরাও যাচ্ছি সেখানে. গায়ত্রী-বন্দনা গাইব।

—দেবী,আপনারা কে? জলা প্রার্থনার সুরে প্রশ্ন করলো,—জানতে ইচ্ছে করছে।

—আমার নাম শ্রুতি আর এঁর নাম স্মৃতি। দেবী গায়ত্রীর উপাসনা হবে আজ. তাই যাচ্ছি শুনতে; বৈদিক ক্রিয়াকর্ম আর এখন শুদ্ধ ভাবে হয় না অজপা. এই দুঃখের কথা। যদি বা হয় তো ভুল হয়। পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না শুনলে ভারতবাসী এখন শ্রুতি স্মৃতির কথা বিশ্বাস করেনা। আর পশ্চিমের ভোগপরায়ণ মানুষ ভোগের মন দিয়ে প্রবৃত্তি মার্গে বেদের ব্যাখ্যা করে। আজ একটু বিশেষ আছে।

—আপনারাই তো বেদের উদ্গাতা দেবী, আজ কি বিশেষ আছে, জানতে পারি কি?

—হ্যাঁ, তোমার পৃথিবীর বৌদির দেহ রক্ষার চতুর্থ দিন আজ। তাঁর পুত্র পাঁচ বছরের বালক কুশের উপবীত নিয়ে দেবী গায়ত্রীর উপাসনা মন্ত্র উচ্চারণ করবে। চল দেখবে, সমগ্র ভারতের আকাশমণ্ডল জ্যোতিরালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আজ!

—প্রণব শ্রাদ্ধ করবে বৌদির? তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর।

—হ্যাঁ, কিন্তু প্রণব মুক্ত পুরুষ, তার বয়স নাই।

জলা ওঁদের পিছনে আসতে লাগলো। প্রথমেই এল চণ্ডীমণ্ডপে, দেখলো পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রণবকে কুশের উপবীত ধারণ করানো হয়েছে; মাতার পারলৌকিক কৃত্য করছে সে। জলা তার দৈবী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল, প্রণবের হাত থেকে সেই জলগণ্ডুষটুকু নেবার জন্য তার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু প্রণবের মা আসেনি। জলা শ্রুতি দেবীকে শুধুলো—বড় বৌদি কৈ? সে তো আসেনি এখনো!

—তার আত্মিক মন এখনও মূর্চ্ছিত। দশদিনের আগে ভাঙবেনা সে মূর্চ্ছা।

দিবা দ্বিপ্রহর—প্রণব গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করছে—ওঁ, ভূর্ভুবঃস্ব তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি .... স্বয়ং বেদমাতা গায়ত্রী উর্দ্ধলোকে অবস্থান করছেন। কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভূজা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হস্তা গরুড়ারূঢ়া দেবী ভগবতী গায়ত্রী সাবিতৃমণ্ডলে, নীচে প্রণব ধ্যান-তন্ময়, দুজনের মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসূত্র লক্ষ্য করলো জলা। প্রণবের জীবাত্মার সঙ্গে দেবীর পরমাত্মার যুক্ত একটি অত্যুজ্জ্বল আলোলেখা, সে আলোকের ছটায় সারা ভারতের মহাকাশ এক বিমল আলোকদ্যুতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। জলার মনে প্রশ্ন জাগলো. শ্রুতি-স্মৃতি দেবী ওর অন্তরে উত্তর দিচ্ছেন আলোক তরঙ্গে ঃ—

—কে ইনি ?

—ইনি মহাদেবী, ইনি সপ্তম ব্রহ্মের তেজ, ইনি বিদ্যারূপিনী তত্ত্বজ্ঞানময়ী একদিকে সীমাপূর্ণ পরম পদ্দ, অন্যদিকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। ইনি সেই দুইএর সন্ধিস্থান, যাঁর থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইনি তিনিই "তমসস্ত পরং জ্যোতি" তমোগুণাতীত পরম পুরুষ যাঁর সঙ্গে নিয়ত বিদ্যমান, ইনি তিনি।

—জলা আবার প্রশ্ন করলো মনে,—ইনি থাকেন কোথায় ?

—কোথায় না থাকেন! ইনি সগুণ ব্রহ্মশক্তি, ইনি সকলের উপাদান কারণবারি, ইনি অনন্ত অনন্ত প্রাণধারী জীবে জ্যোতির্ময়ী চেতনা। "উত্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।"

—ইনি দেখতে কেমন ? এঁর রূপ কি বর্ণনা করা যায় ?

—না, ইনি অরূপ। তাই সব রূপেই ইনি রূপবতী ; এঁর রূপেই সব রূপময় তবু ঋষি ঋকবেদ সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলেছেন" গৌরীর্মিমায় সানিলানি ত্যক্ষতেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী অষ্টপদী নবপদী বভূবুবী, সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্"

—ইনি কি করেন ?

—প্রলয়কালে ইনি পরমপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; আবার পুনঃসৃষ্টির আরম্ভে

ইনিই বর্ণ পদ ও বাক্য সৃষ্টি করে শব্দ করেন, তাই সমস্ত বর্ণ, পদ ও বাক্যের মধ্যে ইনি অন্তর্য্যামিনীরূপে অনুপ্রবিষ্টা। শব্দব্রহ্মাত্মিকা ইনিই বাগদেবী, ব্রহ্মার মুখ থেকে একপদীরূপে প্রণবাত্মাতে প্রথম ইনি আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা সেইজন্য প্রণব মন্ত্রের ঋষি হতে পেরেছেন। ব্যাহৃতি আর সাবিত্রীরূপে ইনি দ্বিপদী, বেদরূপে চতুষ্পদি, বেদাঙ্গে ষট্পদী, পুরাণধর্মশাস্ত্রে অষ্টপদা, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদে ইনি নবপদী এবং বাক্-সন্দর্ভ দ্বারা ইনি অনন্তপদী। ইনিই তুরীয়পদ ; শ্রুতিবলেন—অস্যা এতদেব তুরীয়ং পদং য এষ আদিত্যস্তপতি। সূর্য্যান্তর্গত যে জ্যোতির জ্যোতি উত্তম জ্যোতি তাতেই ইনি অবস্থান করে সবপ্রাণীহৃদয়ে জীবরূপে বিলসিত হচ্ছেন। ইনিই মহাপ্রকৃতির মহাশক্তি, সৃজয়িত্রী।

জলার অদ্ভুত এক অবস্থান্তর ঘটলো কথাগুলি শুনতে শুনতে। সে তৎক্ষণাৎ অনুভব করলো, তার অন্তরে কখন আপনাথেকেই প্রণবধ্বনি উত্থিত হতে আরম্ভ করেছে। আর সেই একপদী প্রণবজ্যোতিতে তার দৃষ্টি লোকলোকান্তর ছাড়িয়ে সূর্য্যমণ্ডলের উত্তমজ্যোতিতে মিলিত হচ্ছে। অভাবিতপূর্ব এক তুরীয় অবস্থা তার,—হয়তো এইই সমাধি।

—অজপা! স্মৃতিদেবী ডাকদিয়ে বললেন,—যাও মা, তোমার অনেক কাজ এখানে, যাও, আর তোমার কোন ভয় নাই। পৃথিবীর জীবাবর্ত্ত থেকে তুমি মুক্ত, তুমি অনন্তলোকচারিণী অজপা, প্রকৃতির স্পন্দন-তরঙ্গ—চিন্ময়ী।

জলা প্রণাম করে দেখলে, ওঁরা অন্তর্দ্ধান করেছেন। পৃথিবীর বাপের বাড়ীটা একবার ঘুরে দেখতে গেল জলা,—এখন ওর নাম অজপা।

নীচের ঘরেই প্রথম ঢুকলো জলা, ছোটদা একটা খাটে পড়ে চেঁচাচ্ছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় তার মুখখানা কুৎসিত, নাকটা খুব ফুলে উঠেছে, গালে দগদগে ঘা, আর চোখ দুটোতে ভীষণ জ্বালা করছে। নার্স রয়েছে একজন মেম সাহেব, জলা ওকে দেখেই চিনলো, ছোটদার সেই সেক্রেটারী। ছোটদাকে

ও যত্ন করে কি একটা খাওয়াবার চেষ্টা করছে, কথা বলছে মিষ্ট মিষ্টি করে। ছোটবৌদিও এলো, বললো,—এমন করে দিন কি করে কাটবে? মাছ মাংসতো খেতে পারো না, খাওয়াবো কি তোমায়?

—উনুনের ছাই। বলে ছোটদা মুখ ফিরিয়ে শুলো। যন্ত্রণায় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

—তাতো বলবেই, কিন্তু আমার উপর তম্বিটা কিসের, শুনি? আমি বলেছিলাম নাকি মেমসাহেব সেক্রেটারী রাখতে? কেমন মজা হচ্ছে এখন? বলে সেই 'যখন তখন করে পাপ, সময় হলেই ফলে।'—কথাগুলো বাংলাভাষায়, মেমসাহেব বোঝেনা, নইলে অনর্থ হোত।

জলা আর দাঁড়ালোনা সময় হলে পাপের ফল সবাই পায়। ছোটবৌদিও বাদ যাবেনা। ঘৃণা গেল ওর এই নষ্ট চরিত্র মেয়েটার কুৎসিৎ কথা শুনে। চলে গেল বড়দার ঘরে দোতালায়। বড়দা সেরে উঠেছে তবে বড্ড দুর্বল। স্নান করে মহিম্নস্তোত্র পাঠ করছে একখানা কুশাসনে বসে। আশ্চর্য্য অঙ্গ-জ্যোতি বড়দার। গৌরাঙ্গদেহ থেকে যেন একটা নীলাভ আলো ফুটে বেরুচ্ছে। বড়দা অনেক উন্নতি করে ফেলেছে। ওর প্রাক্তন কর্ম নিশ্চয় সঞ্চিত ছিল, আর লক্ষ্মীবৌদির পুণ্যবল। হ্যাঁ "পতির পুণ্যে যদি সতীর পুণ্য হয়, তবে সতীর পুণ্যে পতির কেন পুণ্য হবে না? জলা দেখতে চাইল কোথায় বড়বৌদি নীলিমা। সেদিনের দেখা তমালগাছটার কাছে গিয়ে দেখলো, না, নাই কেউ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, হঠাৎ তেতলার ঘরে দেখলো ছোট-বৌদির শোবার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বড়বৌদি কতকগুলা ন্যাকড়া চিবুচ্ছে। নিজেকে প্রেত-জগতের দর্শনীয় করে জলা ছুটে গিয়ে ডাকদিল, —বড়বৌদি, ও বড়বৌদি! ছি! ছি!! কি করছো তুমি?

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বড়বৌদির যেন রাক্ষুসে খিদে পেয়েছে। যা পাবে তাই যেন ও খেয়ে শেষ করবে। জলা ওকে তাড়া করে ধরতে গেল, কিন্তু ও ভয় পেয়ে ভীষণবেগে ছুট দিল। আকাশের কিছুটা উপর দিয়ে ছুটছে। যায় কোথায়? জলাও যাচ্ছে পেছনে, ইচ্ছে করলেই ওকে ধরতে

পারে জলা, কিন্তু ওর মুখে অশুদ্ধ দ্রব্য। জলার গা ঘিন ঘিন করছে ওকে ছুঁতে। নীলিমা শ্মশানের দিকে ছুটে যাচ্ছে। নদীর কিনারে গায়ের ময়লা টানা খালটা যেখানে মিশেছে, বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করছে, পচা জীর্ণ সব জীবপঙ্ক থেকে অন্নময়কোষ পৃথিবীর উপর উঠে যাচ্ছে। নরক একটা, উঃ! জলা এ গন্ধ সইতে পারছে না। কিন্তু বৌদি ঐখানে গিয়েই সেই নর্দমার জলে ডুবে গেল। লুকুলো। জলা কি করবে ভাবছে। হঠাৎ হিঃ হিঃ হিঃ হাসি! জলা চেয়ে দেখলো, নিরু। কঠোর স্বরে বললো—থাম্ মুখপুড়ি! অত হাসি কিসের? তোর প্রতিহিংসার ফলও তোকে একদিন পেতে হবে।

—হবে, হোলতো বয়েই গেল। জান, তোমার ছোটদার এই ঘা-গুলো রোজ চেটে দিয়ে আসি আমি। আর জ্বালা করে। মরুক মরুক, জ্বলে মরুক হারামজাদা! হিঃ হিঃ হিঃ!

—বড় বৌদিকে ডেকে দিবি একবার?

—কি আমার দায়? আমি তোমার ছোটদাকে ভাল করবো, ঐ রোগে মানুষ মরে না। কুষ্ঠ হয়, অন্ধ হয়। হাতপা গলে যায়, ওকে তেমনি হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, জান? আমাকে যেমন কষ্ট দিয়েছে, তেমনি ঐ নার্সটার পেটে ওর একটা মেয়ে জন্মাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই মেয়ে ওকে নরকে নিয়ে যাবে, কুম্ভিপাক নরকে।—হিঃ হিঃ হি! নিরু ছুটে পালালো। বড়-বৌদিও নর্দামায় ডুবে রয়েছে। যার যা কর্মফল ভোগ করুক, ভেবে জলা চলে এলো ওখান থেকে। পথের মাঝখানে দেখা ওনীলের সঙ্গে।

—খবর কি কবি? এখানে কি কাজ তোমার?

—আজ রাত্রে সেই শৈবালবাবুর বোএর পেটে জন্মাতে হবে। ভূত-জন্মের আজ ইতি। শোনো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। শৈবাল তোমার দাদা, তাতো বলনি! এখানে এসে শুনলাম সব। যাক্, তোমার দাদার ছেলেতো হচ্ছিনে আমি, তাঁর উপর আমার কোন কর্তব্য নাই—কি বলো?

—অকর্ত্তব্যও নাই। তাঁরই সম্পত্তিতে বড়লোক হয়ে তুমি তাঁকেই না খেতে দিয়ে মারবে বলেছ, এটা কি রকম ভদ্রতা হবে?

—বাঃ, তার আমি কি করবো ? সেতো চন্দ্রলোকের জাজ্‌মেণ্ট্। ওর ভাগ্যে ঐ রকম ঘটবে। অন্ধ হবে, কুষ্ঠগ্রস্থ হবে, ওর কর্মফল। ঐযে সেক্রেটারী মেয়েটা, ওর গর্ভে জন্মাবে হেলেন।

—হেলেন ? কোথায় সে ? সিলোনে রয়েছে ?

—আরে না মশাই, সে মরে ভূত হয়ে এখানে এসেছে। আছে কোথাও এদিকে সেদিকে। সমীরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি গেলাম, তো, কথাই কইলো না, আচ্ছা, দেখলেঙ্গে।

—সমীরকে দেখেছো তুমি ? হেলেন মরলো কিভাবে ? আর সমীরইবা মরলো কখন ?

—সমীর মরেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু বীরের মতন মরেনি। পালাতে গিয়ে মরেছে। তাই একদম গো-ভূতের মতন নির্বোধ হয়ে গেছে। হেলেনকে ধরতে এসেছিল সিলোনে, আমি তাড়িয়ে দিলাম, ওবুঝতেই চাইলনা যে ও মরেছে। এখানে এসে দেখি, ওর বাবা, ভাইবোন সব হাহাকার করে কাঁদছে। বেশ মজা কিন্তু !

জলার মনে বড় কষ্ট হতে লাগলো জ্যেঠামশাইয়ের জন্য কিন্তু সমীরের খবর জানতে হবে, শুধুলো—সমীর কোথায় জানো তুমি ওনীল ?

—না, তারপর আর দেখিনি তাকে। কোনো নরকে গিয়ে পড়েছে বোধ হয় কিম্বা হেলেন এসে এখানেও ওকে পাকড়াও করেছে। সমীরের মরা খবর পেয়ে হেলেন ছুঁড়িটা করলো কি জানো ? অবাক কাণ্ড ! আত্মহত্যা নয়গো, একটা আধমরা সৈনিককে ওর গায়ের সব রক্তটা দিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে দেহটাকে ফেলে দিয়ে ছুটলো। সমীরকে ও নিশ্চয় ধরেছে এর মধ্যে কিন্তু ধরে করবে কি ? তোমার দাদা আর ঐ সেক্রেটারীর মেয়ে হয়ে হেলেনকে জন্মাতেই হবে।

—তাহলে শেষটা হেলেন রক্ত দিয়ে একটা ভাল কাজ করেছে ? ওর আত্মা কিন্তু মূর্চ্ছিত হয়ে থাকবে।

—নিশ্চয়, তুমি কি মনে করো, হেলেন জাতিস্মর হবে? তবে রক্ত দেবার ফলটা ও পাবে। আমি দিনকতক ওকে রাণীর আদরে রাখবো। ওনীল হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো। জলা রাগের সুরে বললো—

—ছি, ওনীল। কবি তুমি, জগতের সৌন্দর্য্য নিয়ে তোমার কারবার, তুমি কিনা এই সব দ্বেষ হিংসার কদর্য্যতায় ডুবে থাকো! ধিক তোমায়! হাসি থামিয়ে ওনীল ছলছল চোখে চাইল জলার পানে, তারপর বললো—

—আমায় গাইড্ করবার মত কেউ নেই জলা দেবী। বড্ড উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছি, কিন্তু উপায়ও নেই। তুমি সমীরকে গাইড্ করছো, আর হেলেন আমায় জাহান্নামে ঠেলে দিল। সে তো তোমার মত দেবী নয় জলা। আমার ভালবাসা মিস্প্লেস্ড্ হয়েছে। ও যদি তোমার মত হোত! কিন্তু আমার দেশে তোমার মত মেয়ে জন্মায় না।

—ও নাহোক, তুমিই বা ভাল হবে না কেন? ও মঙ্গলের প্রজা, তুমি নেপচুনের, দু'জনে বিস্তর তফাৎ, কত লক্ষকোটি যোজন দূরত্ব। তুমি কেন ওর পেছনে ঘুরছো কবি? একে ভালবাসা বলেনা, বলে মোহ। এ প্রেম নয়, দৈহিক ক্ষুধা। প্রেম কখনো নীচে নামায় না, তার গতি সব সময় উর্দ্ধদিকে। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি ওনীল, হেলেনের মোহ ছাড়তে পারলে তোমার উন্নতি হবে।

—আমি পারছিনা ছাড়তে।

চেষ্টা কর! বলে জলা এগিয়ে চলে এল। সমীরের বাড়ীতে নিদারুণ ব্যথা বেদনায় বাতাস অশ্রুপঙ্কিল। জ্যেঠামশায় নীরবে বসে কাঁদছেন, ভাইবোন দুটির চোখ দিয়ে দর দর জল পড়ছে। সমীরের পাঠানো টাকাগুলোও এসে পৌঁছেছে, তাই শোক উথলে উঠেছে আরো। তবু ভাগ্য যে, সমীরের মা আগেই মারা গেছেন।

জলা দিদিমার বাড়ী গেল। বাস্তুপুরুষ ঐখানেই তার সঙ্গে দেখা করে বললেন,—বড় আনন্দের কথা মা জলা। তোমার বড়দা আবার মানুষ হয়েছে, আমি আবার তোমাদের বাটীতেই রয়েছি গিয়ে, আর সাত বছর থাক্বো।

জলা ওঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লো। সমীরের খোঁজ করা একান্ত দরকার। কোথায় গেল সমীর? এখানে এলে নিশ্চয় বাস্তুপুরুষ বা ওনীল

তাকে দেখতে পেতো। জলা চণ্ডীপুরের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করেও সমীরের সন্ধান পেল না। নিরুপায় হয়ে সে উর্দ্ধাকাশে উঠে নিজের আকাশ,-দেহ ধারণ করলো, চেয়ে দেখলো-সমগ্র ভারতভূমির পানে। ভারতের আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, সেইদিকে মুখ করে পরেশনাথ পাহাড়ের সেই সন্ন্যাসী স্তব পাঠ করছেন। জলার মনে পড়ে গেল ওঁর কথা। তখুনি গিয়ে উপস্থিত হোল তাঁর কাছে। স্তব পাঠ শেষ করে উনি জলাকে কুশল প্রশ্ন করে বললেন,—

—তুমিতো খুব শীঘ্রি উন্নতি করেছে মা! তোমার প্রাক্তন কর্ম খুবই ভাল ছিল, দেখাছি।

—হয়তো ছিল প্রভু! কিন্তু আমি সমীরকে খুঁজে পাচ্ছি না, তাকে যে আমার বড় দরকার।

—হ্যাঁ মা দরকার। পৃথিবীতেই সে আছে, যাও তার ধানবাদের বাসায়; গিয়ে দেখতে পাবে।

জলা তৎক্ষণাৎ ওঁকে প্রণাম করে ধানবাদের বাসায় এসে দেখলো, শূন্য সেই ঘরটায় একখানা ছেঁড়া মাদুরে বসে রয়েছে সমীর আর হেলেন, মুখোমুখী গল্প করছে ওরা। অশ্লীল অসভ্য সব কথা বলছে হেলেন, আর সমীর শুনছে, হাসছে, খাচ্ছে কতকগুলো অখাদ্য, ভাগাড় থেকে কুড়িয়ে এনেছে। আর শুঁটকি মাছের চাটনি।

জলার বড় কষ্ট হচ্ছে এখানে দাঁড়াতে; ঘেন্না ও করছে। কিন্তু সমীরকে বাঁচাতেই হবে হেলেনের হাত থেকে। কি উপায় করবে জলা? দুঃখে ওর কান্না পেতে লাগলো। নিজেকে ওদের দ্রষ্টব্য করতে বেশ কষ্ট বোধ হচ্ছে ওর। কি বিশ্রী দুর্গন্ধ। তবু জলা ওদের মত বায়ুতত্ত্বের শরীর গ্রহণ করে বললো,—সমী! কি করছো তুমি সমী! সমীর কিছু বলবার পূর্বেই হেলেন ওকে তাড়া করলো। সেই কদর্য্য দুর্গন্ধময় হাত দিয়ে জলাকে ছুঁয়ে দেবে। জলা সরে এল। সমীর বললো—যাও যাও, এখানে কি তোমার?

মাতাল স্বামী যেন বেশ্যাবাড়ীতে বসে তার ধর্মপত্নীকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। কান্নায় বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হতে লাগলো জলার, অসহ্য কষ্ট হচ্ছে। ওর

অজপা থেমে যাবে নাকি ! হ্যাঁ, থেমেই গেল, জলার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম রুদ্ধ হয়ে গেল। হেলেন ওকে হয়তো আর দেখতে পাচ্ছেনা, তাই তাড়া করছে না এখন আর, বসে বলছে—শূয়োরকা বাচ্চা, তুমি এখানে কি করতে আস ?—ওকে ভূতভাগা করে দিলাম, জান মীর ?

—বেশ করেছ ডার্লিং, বলে সমীর হেলেনের কোলে মাথা রেখে শুলো।

জলা এখন আর কি করবে বুঝতে না পেরে আকাশ-দেহ ধারণ করে স্বর্গলোকেই ফিরে এসে কাঁদতে লাগলো। সমীরকে রক্ষা করার কোন উপায়ই তার হাতে নেই। সমীর মূর্চ্ছাগ্রস্ত প্রেত। তার প্রেতযোনির মূর্চ্ছা ভাঙবার উপায় পুত্রের হাতে পিণ্ড লাভ; কিন্তু সমীরের পুত্র জন্মায় নি। এ মূর্চ্ছা ভাঙবার অন্য উপায় নৈসর্গিক, সে যে কত দিনে ঘটবে, কেউ জানেনা। যদি সমীরের বৃদ্ধ বাবা তার পিণ্ড দান করেন তাহলে উপায় হতে পারে।

সমীর বললো—এখানে ভালো লাগছেনা হেলেন, চলো আমাদের গ্রামে যাই। ওরা দুজনে বেরুলো চণ্ডীপুরের দিকে। কত বন জঙ্গল, ঝোপ ঝাড়, নদী, শ্মশান পার হয়ে আসছে। জ্যোস্না রাত, পথ চলতে কোন কষ্ট হচ্ছেনা ওদের। বেশ নাকিসুরে গান করছে হেলেন, সমীর মনের আনন্দে পেটের নাড়ীতে টান দিয়ে বাজাচ্ছে টুং টুং টুটু টং। তাল চিংড়ীর মাঠ এসে পড়লো ; এখান থেকে চণ্ডীপুর মাত্র দুকোশ, জায়গাটা ভারি সুন্দর। স্যাঁৎস্যেতে জমি, শেওড়া গাছ, শামুক-গুগ্‌লির পচা গন্ধ, তাছাড়া পড়ো ভিটে, মরা ছোট ছেলে পুঁতে ফেলবার জায়গা, খানিকটা দূরে মড়া পোড়াবার শ্মশান। বাঃ, ঘরতো এই খানেই বাঁধতে হয় ! হেলেন বললো,—আমি আর যাবনা, থাকবো এইখানে।

—সে কি ? আমার বাবার সঙ্গে দেখা করবেনা ?

—তোমার বাবা তোমারই বাবা, আমার কে ? তুমি দেখা করে এসো

গিয়ে। বলে গেলেন দুতিন দিনের মরা একটা ছেলের দেহ দেখতে পেয়েই ছুটলো খেতে।

সমীর বাড়ী এসে দেখলো ভাই বোন ঘুমুচ্ছে, কিন্তু বাবা জেগে। বললো, —বাবা?—বাবা তো শুনতে পাচ্ছেন না, হোল কি তাঁর? সমীর আরো চেঁচিয়ে বললো,—টাকা পেয়েছেন? না, বাবা শুনছেন না। বুড়ো বয়সে কালা হোলেন নাকি? কি একটা বই পড়ছেন 'পরলোকের কথা'! যাঃ! পরলোক কি আবার? যত সব গাঁজাখুরি বই কেন যে বাবা পড়েন? সমীর বিরক্ত হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুলো। এপাশ ওপাশ করলো খানিক, ঘরটায় বড্ড আবর্জনা পড়ে রয়েছে। ফুলের তোড়া সাজিয়ে দিয়েছে কে যেন, বিছনা পেতে সমীরের ফটোটাও সাজিয়ে দিয়েছে। দূর ছাই! সমীরতো মরেনি যে এসব করেছে এরা! সমীর খাট থেকে উঠে বাইরে গিয়ে কতকগুলো ছাই পাঁশ জঞ্জাল এনে ঘরময় ছড়িয়ে দিল, শব্দ হচ্ছে—ওর বাবা এসে দেখলেন আলো নিয়ে, আপন মনে বললেন, —হুঁ, প্রেত যোনি!

—বাবা, কি সব গাঁজাখুরি পড়ছেন আপনি? সমীর বললো, কিন্তু বাবা শুনলেন না, চলে গেলেন। কিন্তু শুনলো ওর মা, কাছে এসে বললো—তুই বেঁচে নেই সমীর।

—যাঃ! কি যে বলছো তুমি মা? মা হয়ে এমন কথা বলে কেউ?

—বলছি বাবা, সত্যি বলছি। আয় আমার কাছে আয়। তুই এখন প্রেত।

—বা রে! হোলেই হোলা! আমি বিয়ে করবো, মেম সাহেব বৌ হবে, চলো দেখবে।

—না, সে আমার কেউ নয়,—বলে মা ওকে টানছেন। সমীর অবাক হয়ে যাচ্ছে।

ওনীল হঠাৎ কোথা থেকে লাফিয়ে এসে বললো—জনার মতন লক্ষ্মী মেয়ে তোমাকে ভালবাসে, আর তুমি কিনা ঐ নষ্টা মেয়েটার পেছনে ঘুরছো? গাধারও বুদ্ধি থাকে, তোমার নেই!

—জলা ? উজ্জলা ? কোথায় সে ? বলে অকস্মাৎ সমীর যেন কি মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছেনা। কোথায় যেন সে ছিল বহুদূর দেশে, তারপর……

ওনীল বললো - আমার আর সময় নেই, নইলে তোমায় আক্কেল দিয়ে দিতাম। জলার মতন মেয়ে যাকে ভালবাসে সে আবার ভূত হয় কেন ? তুমি ভূত হয়েছ, বুঝলে ? জলাকে ডাক, সে দেবী। —ওনীল চলে গেল।

স্বর্গের জীবন সুখের ? মিথ্যা কথা। এই কয়েক মাস থেকে দেখছে জলা, সুখ এখানে শুধু ভোগে। কিন্তু জীব কতইবা ভোগ করতে পারে ? ইন্দ্রিয়-গত ভোগে ক্লান্তি আসে। বিরক্তি বোধ হয়। তাছাড়া ইন্দ্রিয়রা বিকল হয়, বিশৃঙ্খল হয়। রাগ দ্বেষ হিংসা পরশ্রীকাতরতা জেগে ওঠে। কারণ এখানেও সুখের তারতম্য আছে। অধিক পুণ্যবান অল্প পুণ্যবানের চেয়ে বেশী ভোগ পায়, বেশী খাতির পায়। তা হলে মানব লোকের সঙ্গে এর তফাৎটা কোথায় ? জলা ভাবতে থাকে, এই জন্য বুঝি সন্ন্যাস গ্রহণ কালে ভূর্লোক ভুবর্লোক আর স্বর্গলোকের কামনা পরিত্যাগ করতে হয়।

কিন্তু আরো উচ্চতর লোক আছে, মহ, জন, তপ, সত্য লোক। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন নিয়মশৃঙ্খলা, বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম, ঈশ্বর-বিশ্বাস। কত দেশ কাল পাত্র, কত মত কত পথ শুধু পৃথিবীতে নয়, এখানেও। ঐ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোথাকার ক্ষুদ্র এক উজ্জলা সে, কত লক্ষ কোটি জন্মে কত কোটি গ্রহ উপগ্রহে ঘুরে পৃথিবীতে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ পৃথিবীর কথাই তো বেশী করে মনে হয় ; মনে হয়, অত বেশী আপনার করে সে আর কাউকে পায় নি। কেন ? কারণ পৃথিবীতে সমীরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পৃথিবীর কোন গহ্বরে সমীর তার হারিয়ে গেছে। সমীর যেন কারো অভিশাপে নির্বাসিত আর উজ্জলা যক্ষবধূর মত অলকায় বসে অশ্রু বিসর্জ্জ করছে।

না ; এমন করে কেঁদে দিন কাটালে চলবেনা , সমীরকে খুঁজে বের করতে হবে। দরকার হয়, আবার সে পৃথিবীতে জন্ম নেবে তার সমীরের জন্য। উজ্জ্বল নীলমণির আদিম অধিবাসী সে, কিন্তু প্রেমের সাধনার জন্য সে যেকোন নরকে যেতেও প্রস্তুত। মনে পড়লো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী কন্যাকুমারীর তপোসাধনা ; হিমাচলে তপস্যারত শিব আর ভারতের অপর প্রান্তে দেবী কন্যাকুমারী তাঁর পত্নিত্ব প্রাপ্তির জন্য তপোরতা। প্রেমের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। নির্গুণ ব্রহ্ম, গুণাতীত পরমাত্মা ইত্যাদি খুব বড় বড় কথা। কিন্তু তাতে তো তেমন সুখ পাচ্ছেনা জলা ! সোহং বললেই তিনি হওয়া যায় না। তার চেয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভের পথ এই প্রেমের পথ—এই ভালো।

কয়েক মাস যাবৎ জলা পৃথিবীতে আসেনি। পূজা করেছে, জপ করেছে, প্রার্থনা করেছে সমীরের জন্য। আর তার আকাশ গতিতে বহু দূর দূর ব্রহ্মাণ্ডের কিছু অংশ দেখেও এসেছে এর মধ্যে। লক্ষ্মী-বৌদির বাবার বাড়ী একবার যাবার ইচ্ছে করেছিল কিন্তু মাঝপথে বৃহস্পতি গ্রহ পর্য্যন্ত গিয়ে জলার মনে হোল অতদূর একলা সে যেতে পারবে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ গ্রহ অবধি গিয়েছিল জলা একদিন, সেখান থেকে পৃথিবীকে প্রায় দেখাই যায় না। ঐ খান থেকে জলা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি অত্যুজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড দেখতে পেয়েছিল, ভারী সুন্দর। যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় ত্রিশূলধারী ত্রিনয়ন একজন জটাজুট সমন্বিত সন্ন্যাসী এসে বললেন—ঐ বিশ্বটির নাম রূপোজ্জল বিশ্ব (১) পৃথিবী থেকে ওর দূরত্ব দশ লক্ষ আলোক বৎসর (২) মানে ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল দূরে।

—ওরে বাপ্ তাহলে তো যেতে পারবো না প্রভু !

—পারবে মা, যেতে হবে তোমায় ! ওখানেই তোমার শ্বশুরবাড়ী যে।

(১) অ্যাণ্ড্রোমিডা।

(২) এক আলোক বর্ষ = ১৮৬০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ মাইল, ইহাকে দশ লক্ষ দ্বারা গুণ করিলে অ্যাণ্ড্রোমিডার দূরত্ব পাওয়া যায়।

সমীরের জন্ম ওখানেই, কিন্তু মহাকাশ গতি লাভ না করলে যাওয়া সম্ভব নয়। আলোকের গতিতে যেতে দশ লক্ষ বছর লাগবে আর তোমার আকাশ গতিতেও লক্ষ বছর লেগে যাবে। এখন থাক মা, তুমি তো ছেলে মানুষ এখনো, যথা সময়ে যাবে। যাও, এখন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াও গিয়ে।

—আপনি কে প্রভু?

—আমি রুদ্র, এই গ্রহের অধিদেবতা। আমাদের বিশ্ব নিতান্তই ক্ষুদ্র মা, চোখে যতদূর দেখছো ওকে বলে "দিকচক্র" (৩) এতে অন্তত দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে আর এই দিক্‌চক্র প্রতি মুহূর্তে দুইশত মাইল করে সরে যাচ্ছে; অনন্তকাল ধরে চলছে তবু যাওয়া শেষ হোলনা, শেষ হবেনা। বুঝেছো তো, এই তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডই কত বিরাট! সব দেখতে গেলে অনন্ত কালেও দেখা শেষ হবেনা।

—রূপোজ্জ্বল বিশ্বে যেন আমি যেতে পারি দেব, আশীর্বাদ করুন।

—হ্যাঁ মা, যেতে পারবে তুমি। তোমার প্রেমের সাধনা তোমায় ঐশীগতি দান করবে। তুমি ইচ্ছাগতি প্রাপ্ত হবে।

জলা ওঁকে প্রণাম করে ফিরে এসেছিল সেদিন। অত বিরাট বিপুল বিশ্বের অরণ্য-পথে যাবার তার এখনো ক্ষমতা হয়নি। কিন্তু সমীর অতদূরের অধিবাসী, জানতোনা জলা। কোথায় কে চিজ্জড় গ্রন্থিতে বদ্ধ হয়েছে, জীবের তা জানা থাকেনা। কোথায় কোন জীবের পুরুষ অংশ বিভক্ত হয়ে আছে, তাও জানবার উপায় সহজ নয়। তবু জীব মিলিত হয়; কি এক শক্তি যেন উভয়কে মিলিয়ে দেয়। জলা বুঝতে পারলো, একটি আত্মা-পরমাণু ঋণশক্তি আর ধনশক্তি দুই অংশে বিভক্ত হয়ে দুই বিশ্বে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যে দুই বিশ্বের ব্যবধান কোটি কোটি আলোক-বৎসর দিয়েও গোণা যায়না। কিন্তু এই দুই শক্তি একত্র হয়ে এক আত্মায় পরিণত হবে, হবেই হবে একদিন একত্র—এইটুকু আশার কথা।

---

(৩) গ্যালাক্সি।

কিন্তু অকস্মাৎ জলার মনে হোল, একত্রই তো আছে তারা, যেমন বহুদূরে থেকেও পৃথিবী সূর্য্যের সঙ্গে একত্র, যেমন পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম তড়িৎকণার মধ্যে অসীম শূন্যতা দেখা গেলেও প্রোটনকে কেন্দ্র করেই ইলেকট্রণ অবিশ্রান্ত ঘুরে চলে, আকর্ষণ-বিকর্ষণে যতই দূর হোক তাদের ব্যবধান, তারা তবু একত্র, একটিই। মহাশূন্যে বিশাল বিশ্বের মতই ক্ষুদ্র পরমাণুও একটি বিশ্ব, জলা আর সমীরও একটি বিশ্ব,—তবে আর ভাবনার কি আছে? ধনাত্মক তড়িৎ যদি জলা উৎপন্ন করতে পারে তাহলে সমীরের মধ্যে আপনি ঋণাত্মক তড়িৎ জন্মাবে এবং তারা মিলিত হ'তে পারবে। পৃথিবীর আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের এই নব আবিষ্কারের কথা পড়েছিল জলা পৃথিবীতে। 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য'' জলার খুব আনন্দ হোয়ে গেল ভাবতে ভাবতে। বিশ্বনিয়ন্তার মিলন-মন্ত্রটিতে সে যেন সিদ্ধিলাভ করেছে। দূর নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই—মিলন! মিলন! মিলন! অসীম ব্যোম, মহাশূন্য ব্যবধান, তবু মিলনসূত্র ছিন্ন হয়না।

জলার মনে হোল, পৃথিবীতে একবার যাওয়া দরকার। এখন ওর কাছে পৃথিবীতে আসা খুবই সহজ, কয়েক মুহূর্ত্ত লাগে মাত্র। জলা নেমে এল, দেখলো, বাঙলাদেশ জুড়ে হাহাকার চলছে, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, হাজারে হাজারে লোক মরছে। উঃ—দেখা যায়না এ দৃশ্য! হতভাগ্য মৃতের দল প্রেতযোনি লাভ করছে, খিদেতে নাড়ীভূড়ি চিবুচ্ছে নিজের, পিপাসায় নিজের রক্ত খাচ্ছে। সে দৃশ্য এতো করুণ যে জলা সহ্য করতে পারছেনা; কিন্তু তার বাপের বাড়ী চণ্ডীপুরটা দেখতে ইচ্ছে হোল। এসে দেখলো, সব শ্মশান হতে বসেছে। অমন সোনার চণ্ডীপুর শ্রীভ্রষ্ট একটা পড়ো বাড়ীর মত দেখাচ্ছে। অর্দ্ধেক লোক প্রায় এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে, বাকি যারা আছে তারা মরণের পথে। জীর্ণ কঙ্কালের মত সব হাঁটছে রাস্তায়। জলা প্রথমটা ওদের দেখে প্রেতাত্মা মনে করেছিল, পরে বুঝলো, না, ওরা এখনো মরেনি। কী ভয়ানক! কি করুণ অবস্থা! তাড়াতাড়ি নিজেদের বাড়ীতে এলো জলা, দেখলো, বড়দা প্রবাল দানছত্র খুলেছে; দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীদের বাঁচানোর জন্য সর্বস্ব পণ করেছে। ওকে সাহায্য করছে বৈকুণ্ঠ আর সমীরের বাবা; ভেতরে দিদিমা রান্নাবাড়া তদারক

করছেন। তিনজনেই যেন জীবন পণ করেছেন মৃত্যুর হাত থেকে এই নিরন্নদের বাঁচাবেন। নির্মম, নিস্পৃহ হয়ে দান করছে প্রবাল। কোন কামনা নাই, কোন বাসনা নাই, নাই কোনো পুণ্য বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা ওর মনে। জলা অবাক হয়ে গেল। এ কার প্রেরণা! কোথায় পেল প্রবাল এত শক্তি! এ যে কর্মযোগী! সর্বকর্ম-ফলত্যাগী সন্ন্যাসী! আনন্দে জলার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়লো। এমন না হলে প্রণবের বাবা হোতে পারে! কি আশ্চর্য পুরুষকার প্রবালের! স্বাধীন ইচ্ছার সবটুকু সে পরার্থে, জীবহিতার্থে নিয়োজিত করে নিজকে উর্দ্ধ উর্দ্ধতর লোকের যোগ্য করে নিল। সব পাপ তাপ কোথায় লুকিয়ে গেছে তার অন্তর থেকে, হয়তো লয় হয়ে গেছে। প্রবাল এখন নিষ্কাম কর্মযোগী।

বৈকুণ্ঠের অবস্থা অত্যন্ত উচ্চ। আর তাকে পৃথিবীতে আসতে হবেনা। সে এবার মহাসত্যের অনুভূতি লাভ করবে, জলা তাকে দেখেই বুঝলো। আর দিদিমা মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নিস্পৃহ মন জীবের দুঃখেই কাঁদে। নিজের সংসারের শত অসুবিধার কথা তাঁর মনেও থাকেনা। ওঁর প্রাক্তন কর্ম এবার ক্রিয়মান কর্মে যুক্ত হয়ে ওঁকে বহু উর্দ্ধে নিয়ে যাবে। সমীরের বাবার অবস্থা একটা অদ্ভুত ধরণের; শোকে আচ্ছন্ন অথচ কর্তব্যে কঠোর! নিজের মৃত্যুকেও যেন উনি কর্তব্যের জন্য ঠেকিয়ে রেখে মানব-সেবা করছেন; যেন কুরুক্ষেত্র রণস্থলে বীরশ্রেষ্ঠ সত্যব্রত ভীষ্ম—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও যাঁর মহত্ত্বের সম্মান রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়েছিল। চণ্ডীপুর ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু আত্মিক জগতে এই পবিত্র আত্মাগুলিকে রাখা হবে কোন্ উর্দ্ধলোকে, তার জন্য আয়োজন চলেছে হয়তো। হয়তো সেখানে উৎসব চলছে!

চলছেই তো, জলা জানে। তার দাদা উজ্জ্বলনীলমণির অধিবাসী। সেখানে ফিরে গেলেই দাদার বিয়ে হবে লক্ষ্মী-বৌদির সঙ্গে। জলা অকস্মাৎ উর্দ্ধদিকে চাইল; দেখতে পেল, সন্ধ্যার আকাশে অরুন্ধতীর পদপ্রান্তে বসে কে ঐ মেয়েটি? লক্ষ্মী বৌদি না? মিটি মিটি হাসছে! তাহলে দাদার এই আশ্চর্য্য উন্নতির মূলে রয়েছে লক্ষ্মী বৌদি! সেই যোগাচ্ছে প্রেরণা। হ্যাঁ, তাইতো! নারীর প্রেরণায়

নর কী না করতে পারে ! কত উন্নতিই না সে করতে পারে শক্তিরূপিণী নারীর প্রেরণায় !

তাহলে জলা কেন পারবেনা সমীরের উন্নতি করতে ! সমীরকে কেন সে, উর্দ্ধলোকের উপযুক্ত করে তুলতে পারবেনা ? পারবে—লক্ষ্মী বৌদির কাছেই জেনে নেবে জলা, কোন মন্ত্রে লক্ষ্মী দাদাকে এত উঁচুতে তুলে সন্ন্যাসীর নিষ্কাম জীবন দিতে পারলো !

জলা প্রকাণ্ড বাড়ীটার দিকে চেয়ে দেখলো, ছোট বৌদির একটা বাচ্চা হয়েছে ; ভীষণ চীৎকার করছে ছেলেটা, কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে। জলা বুঝতে পারলো দেখেই, ওনিল, ঠিক তারই মত হয়েছে। কাছে যেতেই কান্না থামিয়ে ওনীল জলার পানে চাইতে লাগলো। ছোট বৌদি মাইদুধ দিতে এল ওকে। জলা চলে এল ছোটদার ঘরে—দেখলো, ছোটদা অন্ধ হয়ে গেছে, তার হাত-পাগুলো অবশ। শুয়েই থাকে ; সেবা করে তার আগের সেই ঝির মেয়ে উষা। মেম সাহেব সেক্রেটারিটি পালিয়ে গিয়ে নালিশ করেছে তার খোরপোষের জন্য !

ছোটদার পরিণাম জানা আছে জলার, চলে এল। বাস্তুপুরুষ শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখানে চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে অসংখ্য লোককে দিদিমা খাবার দিচ্ছেন। মুখে কি সুমিষ্ট হাসি তাঁর ! জলাকে দেখে বললেন,

—এস মা, তোমার পিতৃবংশের উপর বিশ্ববিধাতার আশীর্ব্বাদ রয়েছে, তাই আজ প্রবাল এমন করে ফিরে এল ! ওর সর্ব্বস্বই ও দিয়ে দিল মা, কোন বাসনাই রাখলোনা। ওর পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ওর জন্মজন্মের সংস্কার ছাড়তে পেরেছে (১)।

—দেখলাম প্রভু ! আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু পৃথিবীতে আমার পিতৃবংশের ধারা লোপ পেয়ে যাবে, বড় দুঃখ হচ্ছে দেব !

—নিয়তি মা, বর্ণ-সাঙ্কর্য্য কলিযুগে ঘটবেই। ও-নিয়ে দুঃখ করো না।

(১) সংস্কার সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্—বিভূতিপাদ.১৮ সূত্র।

তোমরা এখন আর পৃথিবীর কেউ নও। তোমার বড়দার মৃত্যুদিনের আর দেরী নাই।

—সে কি গুরুদেব, প্রণবকে কে দেখবে তাহলে ?

—দেখবে বৈকুণ্ঠ আর দিদিমা। প্রণবকে কাশী নিয়ে যাবেন গুরুদেব। সেইদিন আমিও চলে যাব মা। প্রণব দ্বাদশ বৎসরে সন্ন্যাস নেবে, তারপর বেদান্ত প্রচার করবে।

বাস্তুপুরুষের কথাগুলি আনন্দের দ্যোতনা করছে, কিন্তু জলার ঠিক আনন্দ হচ্ছেনা। এখনো পার্থিব মায়া-মমতা ওকে আবিষ্ট করে রেখেছে যথেষ্ট পরিমাণে। নিজেকে সম্বরণ করে জলা ওঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লো, কিন্তু কোথায় সে যাবে ? কোথায় গিয়ে সমীরনকে সে খুঁজে পাবে ? ভাবতে ভাবতে জলা নিজের সূক্ষ্মতম দেহটাকে ঊর্দ্ধ আকাশে এনে আকাশ-দৃষ্টিতে তাকালো। সারা-পৃথিবীটাই নজরে পড়ছে; যেন বিরাট একটা জ্যোতিগোলক, কিন্তু এই জ্যোতির মধ্যে কোথায় তার সমীর ? সমস্তটাই একাকার মনে হচ্ছে এখন। দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করে জলা ভারতের সীমায় নিবদ্ধ করলো, নিবিষ্ট করলো বাংলা-দেশের শ্যামলীমায়।

গঙ্গার কূলে প্রাচীন একটা সহর, বাঁকা চোরা গলি, ভাঙাচোরা ইমারৎ, হাটবাজার, লোকের ভিড়, কিন্তু ঐখানে একটা ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের উপর নজর পড়লো জলার। দেখতে পেল, একটা টিয়া পাখীর লেজ ধরে টানছে একটি ছেলে। পাখীটা কথা বলছে—কি কর খোকা......! অ খোকা !

সমীর ? হ্যাঁ, সমীরইতো ! তাহলে এই প্রাচীন পরিবারে সমীর এবার জন্মেছে ! বেশ তো দেখতে হয়েছে ও ! ছোট্ট এতটুকু একটা বাচ্চা ! কি দুষ্টুই না হয়েছে ! পাখীটাকে নাকাল করে ছাড়ছে। পাখীটা চীৎকার করে উঠলো......ও মা... !

অল্পবয়সী একটি বৌ বেরিয়ে এল, সমীরের এ জন্মের মা বোধ হয়। এসেই দিল সমীরে পিঠে একটা চড়,—এই শয়তান ! কি করছিস ! কিন্তু সমীর কাঁদলোনা, হাসছে, মা'র হাত কামড়ে দিতে আসছে,—ইস !

জলার বড্ড হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ঐ মাটির মা'র দিকে নজর পড়তেই

হাসিটা দুঃখে রূপান্তরিত হয়ে গেল ওর। রোগা, টিলটিলে সেই মা, কি কত দুঃখে স্নেহে সমীরকে পৃথিবীর রূপ দিয়েছে—কত কষ্টে লালন করেছে—কী গভীর স্নেহে তাকিয়ে আছে ছেলের হাসি-হাসি মুখের পানে! আর জলা এসেছে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাবার জন্য! সমীরের কত জন্মের অর্দ্ধাঙ্গ জলা, কিন্তু এই এক জন্মের মা'র স্নেহইবা কম কোথায়?

জলা বুঝতে পারলো, ওর মা'র মুখে সন্তানের বিয়োগব্যথা এরই মধ্যে জেগে উঠেছে, অথচ মেয়েটি সে কথা জানে না! সমীরের পৃথিবীর পরমায়ু আর পূর্ণ তিনটে দিনও নাই। পৃথিবীর ঐ মায়ের জন্য জলার চোখদুটো জলে ভরে গেল।

ভাঙা বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে এসে দাঁড়ালো জলা, একজন দেব-পিণ্ডধারী ব্রহ্মচারী পায়চারী করছেন। জলা তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি বললেন,

—এসো মা, শ্রীশ্রীগঙ্গা গর্ভে দেহত্যাগ হলে তুমি সমীরকে উচ্চলোকে নিয়ে যেতে পারবে বলে আমি ওকে এখানে এনেছি; তিন দিনের মধ্যে ও দেহ মুক্ত হবে।

—আশীর্বাদ করুন প্রভু, ওকে যেন উচ্চতর লোকে নিয়ে যেতে পারি।

—বিশ্বমাতা সেই আশীর্বাদ তোমায় দান করুন মা জলা!

জলা অপেক্ষা করছে ঐ চণ্ডীমণ্ডপে বসেই। সমীরের কাছে গিয়ে তাকে আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওর। কিন্তু সমীর তার বাবার কোলে বসে চকোলেট খাচ্ছে! কোথাকার বিলিতি খাদ্য! হঠাৎ সমীর বাবার কোলের উপরেই অসুস্থ হয়ে পড়লো,—ভেদবমি। জলার আনন্দ হচ্ছে, পৃথিবীর ক্লেদাক্ত কদর্য্যতা থেকে অনতিবিলম্বে সমীর মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ সকলে ব্যতিব্যস্ত। সমীরকে শোয়ান হোল। ডাক্তার এল, ওষুধ আসতে লাগলো সমীরের সেই রোগা মা অসুস্থ শরীর নিয়ে ছেলের মাথা কোলে বসে আছে জলার সত্যি দুঃখ হচ্ছে এই পৃথিবীর মা-বাবার জন্য, কিন্তু নিয়তি, জলা নিমিত্ত মাত্র। তৃতীয় দিনে সমীরের পার্থিব দেহমুক্ত আত্মাটি বুকে নিয়ে জলা—ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করে চলে এল।

ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধতর আকাশ, মহাকাশ পরিব্যপ্ত করে যে অতীন্দ্রিয়-গোচরীভূত জ্যোতিরালোক প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি স্পন্দনে প্রণব-বিলসিত হচ্ছে, তার উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করলো অসতো মা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময় .... আবিরাবীর্ম এধি—হে জ্যোতির্ময়! আঁধার পারে তোমার আলোকে লও, যে আলোক সৎ সুন্দর আনন্দময়।

আকাশগতিতে জলা উর্দ্ধে উঠে [illegible] অরুন্ধতীর পদপ্রান্তে লক্ষ্মী বৌদির হাসি হাসছে, দেখতে পেল। মহাকাশের নীলিম মাধুরীতে বৌদির হাসিখানি অমৃতধারা, যেন আশ্বাসের অ[illegible]ঃ মন্ত্র! জলা আর একবার চেয়ে দেখলো ভূমি ভারতবর্ষের পানে,—উত্তরে বিরাট বিপুল হিমাচল, শীর্ষে ধ্যানমৌন [illegible]টি অনাদ্যনন্তকাল ধ্যান মগ্ন, আর দক্ষিণে পদপ্রান্তে ভারতের শেষ মৃৎবিন্দু কন্যাকুমারীকায় তপস্বিনী গৌরী যুগযুগান্তর তপোরতা। মহাকাশ থেকে মনে হয়, হিমাচলের পাদমূলেই যেন কন্যাকুমারী। দূরত্বের ব্যবধান অনুভূত হলো না। যেন ধ্যানস্থ মহেশ্বরের চরণ-মূলেই চিরজাগ্রতা মহাসতী! সমগ্র ভারত-তপোবন উন্মথিত করে এক পঞ্চাশৎ মহাপীঠের স্তবগুঞ্জন আর্যাঋষির বেদধ্বনিবৎ শোনা যায়। প্রতি মহাপীঠেই তপস্বিনী উমা আর ধ্যানমগ্ন মহেশ্বর; মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন, আর মহাপ্রকৃতি সজাগ সক্রিয়। বিশ্বের এই মহারহস্য যেন জ্বলন্ত জাগ্রত হয়ে উঠলো আজ জলার অন্তরে। জলা করযোড়ে প্রার্থনা করলো—

হে বিশ্ব-চেতনাচেতনময়ী মহামায়া, মহাতপস্বিনী, তোমার অনন্ত শক্তিতে আমায় স্পন্দিত কর, তপস্বিনী কর, যে তপের প্রভাবে অনন্ত ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরের তপস্যা পূর্ণ হয়, সাবিত্রীর স্বামী জীবন লাভ করে, বেহুলার লখিন্দর বেঁচে

ওঠে। আমিও নারী, তোমার ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াশক্তি—আমায় জাগ্রত রাখ, তো কাজের যোগ্য করে লও, তোমার সাধনার সিদ্ধি আমায় দান কর মা!

*

অকস্মাৎ জলার অন্তরলোকে এক মহাসত্যের দিব্যজ্যোতি আবির্ভূত হ এই বিরাট দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বের অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যেন এক অখণ্ড চিন্ময় তিনি অনাদ্যন্তকাল ধ্যানমৌন, আর বিশ্বচরাচর-ব্যাপিনী [illegible] তপস্বিনী উমা—ক্ষীণ চন্দ্রোদয়ে সীমাহীন বারিধির ঈষৎ চাঞ্চল্যের মত [illegible] পুরুষের ধ্যানশান্ত [illegible] সেথায় স্পন্দময়ী মহাপ্রকৃতি অবিশ্রান্ত [illegible] [illegible], যে স্পন্দনে বিশ্বের কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অধিদেবতা থেকে তেজোদাপি তুচ্ছ জলা, নীলিমা, লক্ষ্মী; বড়দা, প্রণব, সমীর; নিরু, হে [illegible]রাণ; লোচন, ওনিল, স্থাবর জঙ্গম, চরাচর স্পন্দমান। সবই এক [illegible] রাগিনীর বিভিন্ন যন্ত্রালাপ—বিচিত্র সুর-ঝঙ্কার।

জলা সেই মহাতপস্বিনীর আনন্দ-স্পন্দনে অবলুপ্ত হয়ে গেল।